নবহুগের বাংলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পুস্তকাঞ্জী)
প্রকাশক
নারায়ণ পাল 'এম. এ
যুগ্মাত্রী প্রকাশক লিমিটেড
৪১এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি
কমল বন্ধু

লক্ষ
মডার্ন প্রেস এনগ্রেভারস

বাঁধিয়েছেন
ইউনিভার্সাল বুক বাইগ্রাফস

মুদ্রাকর
নিউ ইংলিঙ্গ প্রিন্টিং এস্কো পাবলিশিং কোম্পানী লিঙ
জানাঙ্গণ পাল
৪১এ, বলদেওপাড়া রোড,
কলিকাতা-৬

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬২

মূল্য-ছয় টাকা
প্রকাশকের নিবেদন

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল ১৩২৮—৩১ সালে “বঙ্গরাগীতি” “বাংলার নবযুগের কথা” নামে দিয়া ধারাবাহিকভাবে ১৬টি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাই সংকলন করিয়া “নবযুগের বাংলা” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

“বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র” প্রবন্ধটি তাহার পরলোক গমনের অল্প পূর্বে লেখা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র সমক্ষে দুইটি বক্তৃতা দিতে তাহাকে আহ্রম করেন। সেই সূত্রেই এই প্রবন্ধটি তিনি আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই; বক্তৃতাও দেওয়া হয় নাই। ১৯৩২ সালের ২০শে মে সন্ন্যাস রোগে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৈশাখ, ১৩৬২
দেশচর্চ্যায় দীক্ষা

“শিবনাথ শাক্তী আমাদের স্বাধীনতার সাধনায় ও স্বদেশ-চর্চ্যায় প্রথম দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। তাহার নায়কত্বে আমরা ক্ষস্মিন মিলিয়া একটা ছোট দল গভীরার চেষ্টা করি।

“আমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—‘স্বায়ত্ত-শাসন নয় আমার একমাত্র বিধাতা-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া বীর্যকার করি।’ অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ত্ত-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্মঃ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। ‘তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের আইন-কাজময় মানিয়া চলিব—কিন্তু দূঃখ, দারিদ্র্য, হুমকি দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্নমেন্টের অধীনে দাসত্ব বীর্যকার করিব না।’

“এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—‘আমরা জটিলবেদ মানিব না; পুরুষের একুশ বৎসর পূর্বে এবং রমণীর পক্ষে যোগ বৎসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।’

“তৃতীয় কথা ছিল—‘লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণে যত্ন করিব।’

“চতুর্থ কথা ছিল—‘অগ্রাহণ, বন্ধুক ছোড়া (তখনও অক্র-আইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিজেরা অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।’

“পঞ্চম কথা ছিল—‘আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে বাহ। অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার ধারিবে, এবং সেই সাধারণ ভাঙ্গার হইতে প্রতোকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ এর্ষণ করিয়া। স্বদেশের হিতকর কর্ষে জীবন উৎসর্গ করিব।’

“নবযুগের বাংলা”—পৃঃ ১২২-২৩
সূচীপত্র

বিষয়

প্রথম কল্প—
বাংলার বৈশিষ্ট্য

পৃষ্ঠা ১

বিতৃত্য কল্প—
যুগ-পর্যায়ক রূপকাঠি

পৃষ্ঠা ১৯

তৃতীয় কল্প—
ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ফল—
যুক্তিরাশি ও বাণিজ্যচর্চা

পৃষ্ঠা ৪৩

চতুর্থ কল্প—
রাঙ্গসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ

পৃষ্ঠা ৬৪

পঞ্চম কল্প—
রাঙ্গসমাজ ও রঙ্গানন্দ

পৃষ্ঠা ৭৮

ষষ্ঠ কল্প—
রাঙ্গসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

(প্রথম অধ্যায়)

পৃষ্ঠা ৯২

সপ্তম কল্প—
রাঙ্গসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

পৃষ্ঠা ১১০

অষ্ঠম কল্প—
রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উন্মেষ

পৃষ্ঠা ১২৫

নবম কল্প—
হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

পৃষ্ঠা ১৩৮
ধর্ম কথা—
সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গ-দর্শন ও বঙ্গচন্দ্র ১৫১
একাদশ কথা—
বঙ্গম সাহিত্য ১৬৭
ধ্বংস কথা—
বঙ্গচন্দ্রের দর্শন-ব্যাখ্যা ১৮১
ত্রয়োদশ কথা—
বঙ্গম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি ১৯৮
চতুর্দশ কথা—
নাট্যকলায় ও রঙ্গালয়ে নবযুগ ২৪৩
পঞ্চদশ কথা—
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সুরেন্দ্রনাথ ২৫৬
ষষ্ঠশ কথা—
সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ২৬৮
পরিশিষ্ট—
বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ২৯২
নবমুখের বাঙ্গলা

প্রথম কথা
বাঙ্গার বৈশিষ্ট্য

বাঙ্গালী বাঙ্গালের কথা তুলিরালী গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যাপ্ত বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতম মনোনিত বাঙ্গালীর যে চিন্তা ও ভাবে তিনি তিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, আজিকক বাঙ্গালী যুক্তির কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধির পর্যন্ত সে বাঙ্গালকে চেনে না। বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্য আজ নিয়ন্ত্রণ, ভাবের প্রাপ্ত বন্ধ, বাঙ্গালী যে একটা বৈশিষ্ট্য চিরকাল ছিল, এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের মর্মভিত্তি চিন্তা, ভাব ও কর্মান্তরে বাঙ্গালীর আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা। আজিকক বাঙ্গালী কেবল তুলিরালীছে তাহ নহে, তাহার উল্লেখমাত্র তাহাদিগকে অধীন করিয়া তুলে।

তাঁরা বলেন, আমরা কি প্রাদেশিকতাকে আবার বাড়াইয়া। তুলিরালী ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনের ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দিব? বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীর অভিযোগে ফাঁসিতে। উঠে, মারাঠা। ও পাঞ্জাবী যদি আপন আপন প্রাদেশিক ইতিহাসের গৌরবে মুখ হইয়া ভারতে আবার নিজেকে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, রাজপুত যদি পাঠান হইয়ে, তামিল যদি তৈলঙ্গী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তবে ভারতে আমার যে বিরাট জাতীয় জীবনের স্পর্শ দেখিতেছি, তাহার সফলতার সম্ভাবনা কেই? প্রাদেশিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে,
জাতীয়তার যুগ আসিয়াছে, এ যুগে আবার বাংলার কথা লইয়া অত বড়াবড়ি কেন?

ঠাঁচায় এভাবে ভারতের নূতন জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহেন, ঠাঁচায় যেমন বাংলায় চিনেন না সেইসব ভারতবর্ষের নানা পড়িয়া আছেন। যুরোপ যে পথে তার আধুনিক জাতীয়তা বা Nationalism গড়িয়া তুলিয়াছে, ইংরাজ সেই ভাবেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও নানা জাতিকে ভালিয়া চূরিয়া এক ছাঁচে চালিয়া। একটা নূতন ভারতীয় জাতি বা Indian Nation গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

ইংরাজ ভাবিয়া দেখেন না যে ঠাঁচার এই ভাবের মধ্যে ইংরাজের ভাবই অস্বীকার্য হইতেছে। ইংরাজ কহেন ভারতবর্ষ একটা দেশ নহে, কিন্তু একটা মহাদেশ, ভারতবর্ষের এক পৰ্য্যায় আমরা ইতালী বা ফরাসী, ইংল্যাণ্ড বা জার্মানীকে বসাইতে পারি না। ভারতবর্ষের এক পঞ্জিকে বসাইতে হইলে গোটা যুরোপকেই বসাইতে হয়। যুরোপের মধ্যে যেমন ইংল্যাণ্ড আছে, ফ্রান্স আছে, ইতালী আছে, অস্ট্রিয়া আছে, জার্মানী আছে, রুশ আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষের বাংলা আছে, গুজরান্ত আছে, পাঞ্জাব আছে, অদ্য আছে, রাজপুতানা আছে, কুর্মায় আছে, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাস আছে। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যতটা পার্থক্য ও প্রভেদ আছে, যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রেও প্রায় সেইরূপই প্রভেদ আছে। এদের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, প্রকৃতি এমন কি সমাজ-গঠন পর্য্যায় পরস্পর হইতে যেলা বিভিন্ন বিভিন্ন। গোটা ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটি ধর্মের একটা ঐক্য আছে বটে; এরূপ ঐক্যে যুরোপেও আছে। তুরস্ককে বাদ দিলে যুরোপের সর্বত্র একই ধর্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। আর প্রাচীনের কাছে বাংলা চার্চ বা রাশিয়ান চার্চ—এ সকলের মধ্যে যে
পার্থক্য আছে, মাজাজের স্মার্ত্তি ও বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের শৈব ও গাণপত্য, বাংলার শাসন ও বৈষ্ণব, এ ছাড়া নামকরতা, কয়েকক্ষুদ্র প্রস্তুতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহ। কথা নেহ—এ সকলের উল্লেখ করিয়া ইংরেজ কেহন যাহাকে জাতি বা নামন কহে, তার উপাদান ভারতে এখন বিষ্ণুমণ নাই। ইংরেজ ভারতের একচূড়া রাষ্ট্রপতি হইয়া এক শাসন শৃঙ্খলে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বাঁধিয়া, একত্রে ভারতের অধুনিক ঐতিহাসিক বিবর্ধনের প্রবাহকে চালাইয়া, ভারতে এই সর্বপ্রথম একটা জাতীয় জীবনের সুন্ধর করিয়া দিয়াছেন। এই পথেই যদি সত্ত্ব হয় ভবিষ্যতে একদিন যুগের মত ভারতবর্ষেও একটা বিজ্ঞতি জাতির স্থিতি হইতে পারে। হইবেই যে এমনও বলা যায় না। এই অভিপ্রেতেই ইংরেজ এ পর্যায় আমাদের অধুনিক জাতীয়তার সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার শাসন শৃঙ্খলাকে সর্বদাই নাম্নমায়ে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ইংরেজ কহেন, আমরা চিরকাল জন্য তোমাদের শাসনবর্ত্ত বহন করিতে আর্ব নাই। আমাদের দেশ যেন এক হইয়াছে, এক শাসনে শাসিত, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক ভাবের ও ঐতিহাসিক গৌরবের বহনে আবদ্ধ, তোমরা যেখানে সেইসাথে হইবে অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে যেমন এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ একঘাসা প্রচলিত, এক ধর্ম প্রস্তুত হইবে, এক ভাষা প্রতিষ্ঠিত, একগুলি উপর একই আচার-প্রবীণ, একই রীতিনীতি, একই আদর্শের প্রচার। গড়িয়া উঠিয়া, সেইদিন ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেইদিন তোমাদের নেশনের দারী মাঝা হইতে করিয়া, মানিয়া লইতেই হইবে; সেদিন আমরা অমনবদনে তোমাদের দেশ ও তোমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভার তোমাদের হাতে অর্থহয় করিয়া নিঃশাস ফেলিয়া। বাংচিব। কিছু উদাহরণ না তোমরা একটা জাতি হইয়াছ ততদিন
নবযুগের বাংলা

আমরা যদি না থাকি—তোমাদের ছাড়িয়া যাই, তোমরা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া। দেড়শত বৎসরে দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খল। প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহ। তুমিসাত করিয়া। ফলিবে এবং আমাদের পরিত্যক্ত রাজদিগকে অন্য কোন প্রবলতর প্রতিবেশী আসিয়া নিজের হাতে তুলিয়া। লইয়া আবার তোমাদিগকে নূতন পরদেশী শাসনের অধীন করিবে।

ঠাঁরা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক জীবনকে পঙ্খু করিয়া। ভারতের একতার নামে প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করিয়া। যুরোপের ছাচে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিয়া করল। করেন, ঠাঁরা ইংরেজের এ আপত্তিকে একবার অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ঠাঁরা জাতিসারেই হউক আর অজাতসারেই হউক ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনে, যুরোপে যে আদর্শ আধুনিক জাতীয়তা বা Nationality'র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সেই আদর্শেই অনুসরণ করিতেছেন। ঠাঁরাদের যুরোপ-বিশ্বে যতটা প্রবল হউক না কেন, এই বিষয়ের ভিতর দিয়াই ঠাঁরা সর্বদা—“শক্তিবাহ” যুরোপকেই সাধন করিয়া। যুরোপকেই পাইতেছেন। ঠাঁরা বলেন বটে, ভারতের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই ভারতের নূতন জাতীয়তার লক্ষ্য, কিন্তু ভারতের এই বৈশিষ্ট্য কি,—এ প্রশ্ন সম্প্রতি অনুমাীবাদ করিয়া দেখেন না।

(২)

কি, ধর্মে কি সমাজে, কি রাষ্ট্রীয় গঠনে, যখন ভারতের হিন্দুরাষ্ট্র ছিল—ভারতবর্ধমান প্রকৃতি ও সাধনা, জীবনের সকল বিভাগে সর্বদাই সমষ্টির একের ভিতরে ব্যাপির সাত্ত্বিক ও বৈশিষ্ট্যকে, রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও কোন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা
রিতে যাইয়া সেই সম্বন্ধের অস্ত্র ব্যক্তি বা বিষয়ের স্বাধীনতা বা স্বাধীনতাকে বিনাশ করে নাই। ভারতের দেবতা এক নহেন বহু নহেন, কিন্তু তিনি সেই এক বারাহির মধ্যে একের সঙ্গে বহু ও বহুর সঙ্গে একের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম রুথীয়ান বা মুসলমান ধর্মের মতন ঠিক একটি ধর্ম নহে; এ ধর্মে কোনও এক অন্যপথ, কোনও একটা সাধন, কোনও একটা মাত্র প্রাচার শাস্ত্র, কোনও একজন মাত্র ঈশ্বরের বা গুরুর প্রতিষ্ঠা হয় না। এ ধর্মের বহু শ্রদ্ধা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে প্রাচার বলিয়া পরিগণিত; বহু পথ, কিন্তু নদী পড়ে, সেই সকল বিভিন্ন পথ, যিনি “নৃগাম একো গন্তব্য” সেই পদে গিয়া মিশিয়াছে। এ ধর্মের বহু অবতার, নিজ নিজ যুগে সকলেই অনন্য-প্রাচার রক্ষা করিয়া সেই একচে মহিমা প্রচার করিয়াছেন। এ অবতার-ধারা স্থাপির অনাদি আদি হইতে আত্মঃ হইয়া আজ পর্যন্ত নিঃস্বত্বভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এ ধর্মে অসংখ্য গুরু, নিজ নিজ জীবনের প্রাচার ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধির পথে মূম্ভূ মানবকে লইয়া যাইতেছেন। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন অপূর্ব একত্র, এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এত রেবতি উদার সমতা, ভিক্ষুকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াও সমস্তে নিরবিচ্ছিন্ন একে এমন ভাবে রক্ষিত আর কাহারও দেখিতে পাই না। আর সর্বত্রই প্রায় মানুষকে এক িছে চালিয়া একাকারের উপরে ঐক্যের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। সে চেষ্টা সফল হয় নাই; মানুষের প্রকৃতিতে এত বিপুলে সহজ হয় না। এই জন্য স্বর্গবাহার মানুষ ধর্মের এই কঠোর শাসনকে ভাবিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের মনীষি মনুরুণতাতে কাল হইতে মানব-প্রকৃতির মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্মের শাসনে
নবযুগের বাংলা

ও সমাজের বস্তু বাঁধিয়াও, রীতমূলক নধোই সাধ্য, স্বাতন্ত্র্য মধুরই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

যেমন ধর্মে সেইরূপ সমাজে। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে আধুনিক মনুষ্যব্যাপী আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে অনেক কথা কহিতে পারা যায়। আমাদের প্রাচীনেরাও যে এই বর্ণাশ্রমকে ধর্মের বা সমাজের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি বলিয়া গঠণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। 
বৈদিক যুগ হইতে জ্ঞানের পথ ও কর্মের পথ—এই দুইটি প্রশস্ত পদ্ধতি বিভাগ হইয়া, কেহ বা জ্ঞানকারী, কেহ বা কর্মকারীর আশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন। আর জ্ঞানের পথে যাঁহারা চালিতেন তাঁহারা যজ্ঞদি কর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম—
উভয়কেই অপ্রায় করিতেন। গীতাতে প্রথমে বর্ণাশ্রমের কর্তব্য—
বিধান করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম, ইহাই শেষ কথা নহে, প্রকৃত জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা সর্বভূতে আইনিত লাভ করিয়া। গরু, হাতি, কুকুর, ক্রান্ত ও চূম্বকে একই চক্ষে দর্শন করেন। বর্ণাশ্রমের উপরেও কথা আছে; সে কথা
সর্বদর্শান্ত পরিত্যজ্য মায়েকৎ শরণং ব্রজ
অহং স্বং সর্বধোপেভঃ মোক্ষসিদ্ধি মা সুচ।

বর্ণাশ্রমাদি সকল প্রাক্কালের লোকধর্ম উপেক্ষা বা বর্জন করিয়া,
কেবলমাত্র সর্বাক্ষরবান ভগবান যে আমি, তাহারই শরণাপন্ন হও।
আমিই তোমাকে এই বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম পরিত্যাগজনিত যে পাপ
তাহা হইতে রক্ষা করিব।

সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের মধ্যে কত
ভঙ্গোপভাজ্য হইয়াছে, কত নতুন মতের প্রতিষ্ঠা, কত নতুন প্রাচীন
প্রচার, কত নতুন সাধনের আবিষ্কার হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে
সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া একই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া।
রহিয়াছে। এই ভাবে সমাজের হত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাহিরের বর্ণান্তর রক্ষ। করিয়াও ভিতরে ভিতরে তাহাকে ভাবিয়া চরিয়া দিয়াছে। অথচ হিন্দুসমাজ বলিয়া যে বিরাট বস্তু তাহার অঙ্গহয়ানি কেহ করে নাই, করিতে পারে নাই, কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় নাই। হিন্দুসমাজ কাহাকেও একাংশ বর্জন করে নাই, সকলকেই আপনার বিশাল অংশ তাহাদের নিজ নিজ কোটে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রক্ষ। করিয়াছে। যেমন হিন্দুধর্মে, সেইরূপ হিন্দু সমাজজীবনেও এই ভাবে স্বাধীনতার কাল হইয়া বাধিতে বৈষ্ণব বৈষ্ণব, ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা ও স্বত্ত্ব পরিপূর্ণ মাত্রায় রক্ষ। রাধিকা সমাজের সাধারণ একতা রক্ষ। করিয়া আসিয়াছে।

যখন হিন্দুর নিজের অধিকারে রাষ্ট্রশক্তির ছিল তখন রাষ্ট্রীয় একু বন্ধনেও হিন্দু নীতিদের এবং রাষ্ট্রপতিগণ এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দু মহারাজ-চক্রবর্তীরা রোমান বা আধুনিক যুগের জাতিদের মত এক একটা বৃহদায়তন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই, কিন্তু প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাধ্যবাহিক সঙ্গম হইয়া। সকলের অভিমতানুযায়ী তাহাদের অধিনতার গ্রহণ করিয়াছে। কাহারও সঙ্গে বিরোধ হইলে তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পরাজিত রাষ্ট্র আত্মসাত করিতেন না, কিন্তু পরাজিত রাষ্ট্রপতির কোনও উপযুক্ত দায়িত্বার্থক শুন্য সিংহসনে বসাইয়া। তাহারই হহং রাজাভার অর্পণ করিতেন, এবং তাহাকে আপনার সন্ত। বা সামর্থ্যরূপে গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে কি ধর্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে—সর্বত্র হিন্দু বৈষ্ণবাকে রক্ষ। করিয়াই সামর্থ্যবশতাকে কর্জ রাধিয়াই ঐক্যের, বাধ্যতার ও ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও আত্মচরিতাত্তরের পথ অবাধ রাধিয়া সমষ্টির ঘননিবিস্তাত রক্ষ। করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানের। যখন
নবযুগের বাংলা

এদেশে আসিলেন তখনও ভারতীয় সাধনার এই বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। মতঘোর বিরোধ সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান সাধনার সার্বজনীন সভাকে আপনার করিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমে, বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে, এমনও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে হিন্দুরা। অকুশ্লতাভে মুসলমান দরগায় সিন্ধি দিতেন এবং মুসলমানরাও সরল ভক্তিভাবে হিন্দু সেব দেবীর নিকট বলি আনিয়া দিতেন। মুসলমান যুগে এইরূপে হিন্দুমুসলমানের একটা সমস্যা সাধনের বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমানকে হিন্দু করিতে চাহে নাই, নিজেও মুসলমান হয় নাই, কিন্তু নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই পরম্পরার মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সার্বজনীন সাধন এবং মানবতার উদার ভূমিতে হিন্দুমুসলমানের একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর সে চেষ্টা যে নিখোঁজ হয়, এমনও বল। যায় না। আধুনিক যুরোপীয় চিন্তা এই আদর্শকেই Federalism নামে অভিহিত করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা এবং সাধনাও এই আদর্শের অধেয়নেই চলিয়াছে। এই আদর্শে স্বাধীনতার সঙ্গে বন্ধতার, স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ঐক্যের, বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমতার সমস্যা সাধন হইয়াছে। এই আদর্শের সম্ভাবনা যুরোপ সবে মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ পথ ভারতের চির-পরিচিত পথ।

ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব জাতীয়তার সাধনকে তাহাদের সাধনার এই সমানতা প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা বাঙালিরা বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাহার সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই, আজ
বাঙ্গালি প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কলিত বস্ত, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।

(৩)

ভারতের সমাজ ও চরিত্রের এবং সাধারণ ভারতীয় সাধনার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক সাধনা, ও সভ্যতার তুলনায় বাংলারও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জগতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যে একটা বিশেষ আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনার সেই একটা বিশেষ আছে। এই বিশেষতাই বাঙ্গালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; ইহাই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। বাংলার ইতিহাস, বাংলার ধর্ম, বাংলার সাহিত্য ও শিল্প-কলাতে, বাংলার সাধ-জীবনে—সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এই বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্ব আধুনিক নহে—অতি পুরাতন। যতদিন বাঙ্গালী স্থিত হইয়াছে ততদিন হইতে এই বিশেষত্ব তিলে তিলে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া, এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহাই সার্বভৌমত্ব তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া। তুলিয়া, তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য। বাংলা, পাঞ্জাব বা মাজার, গুজরাট বা অস্থু নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থানভেদে হইলে ভারতবর্ষকে বাঙ্গালা কিছু দিবার ধাক্কিতে না, আর যাহার বিশ্বকে কিছু দেবার ধারে না, সে প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্ন রূপে পড়িয়া ধাকিতে পারে, কিন্তু কাহার বাঁচিবার অধিকার ধারে না। বাঙ্গালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে তাহারও আর
জীবনের উপর কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ঈহাতে কি ভারতের, কি জগতের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এই কথাটাই আঞ্চল সাগরাল্যকে সকলের আগে ভাল করিয়া রুঁজিতে হইবে।

(৪)

বাংলা সমস্তে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে। আধুনিক বাংলাকে ইংরাজী গর্ভে তুলিয়াছে ইংরাজের ত এ অভিমান আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এরূপ একটা সংক্ষেপ জমিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যে এ সংক্ষেপ নাই, এমন নহে। এ সকল বাঙ্গালী সহসা প্রচুরের প্রতি অভ্যাস অসম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের পরে রাজা রামমোহনের সময় হইতে বাংলার যে নূতন সাহিত্য ও সাহিত্যের দিকে হইয়াছে ভাগ করিতে হইয়াছে ইংরাজের অনুচিতকারী কণ্ঠ। ভারতের অতীত হেয় মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঈহার কথাই করেন যে এই আধুনিক বাংলা সত্যকার বাংলা নহে। সে বাংলা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আঞ্চলিক হইয়া আঞ্চলিক হইয়াছে। সুতরাং এ বাংলার কথা লইয়া আর অত বাঙ্গালী কেন?

কিন্তু বাংলা কি সত্যই ইংরাজী শিক্ষিত আঞ্চলিক হইয়াছে? এই ইংরাজী শিক্ষার ভারতবর্ষের অঙ্কাঙ্ক প্রদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাংলা না হয় সকলের আগে ইংরাজী সাহিত্য ও যুগোমূর্ত্য সাহিত্যের অমূল প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু, মেঝে সে সাহিত্য ও সাহিত্যের সমস্ত ভারতবাসীর চিত্তে অধিকার জিত করিয়াছে। অথচ, একই ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যে ভাবে ফুটিয়া, উঠিয়াছে অন্য প্রদেশে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী সে ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই—এমনটা কেন হইল? এ সমস্ত ত সমাধান করা চাই।
এ প্রশ্নটা তুলিলেই আমরা দেখিতে পাই, আধুনিক বাংলার এই বিশেষত কেবল ইংরেজী শিক্ষার ফলে নহে, কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে আধুনিক যুগোপযোগী সত্যতা ও শিক্ষার জ্যোতিঃপড়ী। সেই প্রাচীন প্রাণের অভিনব ভাবে তুলিয়া হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা বাংলায় একটা নূতন যুগ আনিয়াছে, একথা মানিতেই হইবে। কিন্তু বাংলার চিত্রী ও ইতিহাসের অমূলদ্বাদ্ধ করিলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যায় যে এই নূতন যুগেও সেই পুরাতন বাঙালী চিত্রী ও সাধনাই অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র। কেবল রূপের পরিবর্তন হইয়াছে, মূল বস্তু নষ্ট হয় নাই; তাহা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

সে মূল বস্তু আদিবন্ধনত। বাংলা চিত্রনা—কি সামাজের কি ধর্মের—সকল প্রকারের বস্তুকে ছিঃশ করিয়া মূকভাবে আপনার সার্থকতার অভিষেক করিয়াছে, প্রাচীন শাস্ত্র-মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা। করিয়া, সেই শাস্ত্র বক্তনকে সরবরদ। শিখিল করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অমূলের প্রদেশের হিন্দুগুণ যেকালে পুরাতন যুগির শৃঙ্গের বাধা পড়িয়াছিল, তখনও মার্কশিংরমণি রয়েন্দন নূতন যুগির চরণ করিয়া। বাংলার হিন্দু-সমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দু-সমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এত বড় একটা বিপর্য ঘটিয়াছে বলিয়া গুণি নাই। ব্যবহার-শাস্ত্র এবং অনন্ততি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার একটা নিজের পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজী একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমের ভাগে, আমাদের দশশৃঙ্গততম শক্তিকে ভূতাত্ত্বিকের বলের ব্যবহারিক ও মার্কশিংরমণি জীবনবাহন বাঙালী হিন্দুর দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ করিয়া দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। এই দায়ভাগ কেবল বাংলার হিন্দু-সমাজেই।
প্রচলিত, ভারতের অস্ত্রায় প্রদেশের হিন্দূগণ মিত্রভুক্তায় অধিক।
মিত্রভুক্তায় ধনীর নিজের ধনের উপরে সম্পূর্ণ স্বাধীন অধিকার নাই।
দায়ভাগে ধনী তাহার মূহূর্ত পরে বা পূর্বে স্বেচ্ছামত নিজের
ধন সম্পর্কে বা অসম্পর্কে যাহাকে ইচ্ছা দান করিবার অধিকার
দিয়াছে। এ বিষয়ে কোন প্রকার বাধাবাধি নাই। জীমূতাবাহনের
যে ইচ্ছা নিজে স্থাপ করিলেন, এরূপ করা হয় না। সমাজে
যাহা প্রচলিত ছিল, সমাজের গতি ও প্রকৃতি যেদিকে চলিতেছিল,
তাহার উপরেই তিনি আপনার নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। জীমূত-
বাহনের চারিশতাধিক বৎসর পরে স্বাধীনতা লাভ করিতে দায়ভাগ
চার করিয়া। জীমূত বাহনের দায়ভাগে কোনও কোনও বিষয়ে নূতন
ব্যাখ্যাত হইল; আরও উদার করিয়া তুলিলেন। মিত্রভুক্ত অস্ত্রায়
সম্পদ্ধ, সমগ্র পরিবারের সমঝাবালে আবশ্যক থাকে; পরিবারের ভিন্ন
লোকজ্ঞ পরিবারের নিজের নিজের অংশ পরিবারের অংশ;
অংশীদারের অস্ত্রায় ব্যাপী সমাজের পরিবর্তন করিতে পারেন না।
দায়ভাগের অস্ত্রায় বাঙালী হিন্দু এ অধিকার আছে।
ইহাতে বাঙালী হিন্দু-
সমাজে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে এমন একটি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হয়,
যাহা মিত্রভুক্তার অধীন হিন্দু-সমাজে হই। মেইন সাহেব
কহেন যে, বাঙালী অতি প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্য-প্রধান দেশ ছিল
বলিয়াই মিত্রভূক্তায় বাধাবাধি নিয়ম তাহার সহ হয় নাই।
জীমূত-বাহন কহিয়াছেন যে, শত শতাব্দিকের দরাজও ব্যক্তির পরিবর্তন সম্ভব
নহে। ইহাতেই বাঙালী মনীষায় সনাতন স্বাধীনত। প্রবন্ধির প্রমাণ
পাওয়া যায়।

মুসলমান সভ্যতা ও সাধনার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে
অনেক নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। নানার, কবীর প্রভৃতি যে সাধনা
প্রবর্তিত করেন, তাহা হিন্দু সাধনার অস্ত্রায় হইলেও ঠিক সে,
সাধনার ধারাকে অক্ষুন্ন রাখে নাই। শিখেরা’র সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হইয়া পড়েন। কিন্তু এই যুগেই মহাপ্রভু বাংলা দেশে যে যুগের প্রচার করেন তাহাতে হিন্দু সাধনার অক্ষুন্ন রাখিয়াই এক নূতন প্রাণতার সংক্রান্তি করিয়া। তাহাকে সে যুগের উপযোগী এক নূতন আকার প্রদান করেন। ফলতঃ বাংলার বৌদ্ধধর্মের অবসান হইতে বাঙালী ধর্ম-সাধনে, সিদ্ধান্তে, নতুন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহা ভারতের অন্যান্য কোনও হিন্দুসমাজে দেখা যায় না। সাধক এবং সিদ্ধ-পুরুষের নূতন নূতন সপ্তদশায় স্থাপিত করিয়াছেন। এ সকল সাধনার লোকেরা সমাজের মধ্যে ধারিয়াই আপনাদের অন্তর্ণ ধর্মজীবনে প্রাচীন শাস্ত্র কিন্তু আচার-বিচারের বন্ধন মানিয়া চলেন নাই। সমাজের ইহাদিগকে এই স্বাধীনতা দিয়া আসিয়াছে।

কুলগৃহের সঙ্গে সঙ্গে সদ্গৃহের আশ্রয় লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার কথা আর কোথাও শুনি নাই। “লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্গৃহীত কাছে সদাচার” ইহার অমূর্ত কথা অনুভূত নাই। আপনাদের কথাটা কেমন কেমন শোনায় বটে—অনেকে ইহাকে মিথ্যাচারও বলিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভিতরে যে স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, ইহাতে সমাজের বন্ধনের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে একটা সঙ্গতির চেষ্টা রহিয়াছে, একথাও অনুক্ষেপ করা যায় না। বামচারী তাত্ত্বিকদিগের চক্রে কোনও প্রাকারের জাতিভেদ মানা হয় না। “প্রবর্তে বৈবর্তী চক্রে সংবর্তনেই হিজোনাম”—বৈবর্তী চক্রে বসিলে চূলের শ্রেষ্ঠতম ভাষণের সমান হইতে। তখন চূলের মুখের অন্ত ব্রাহ্মণ নিঃসংক্রান্তে গৃহে রূপে পারেন।

ইহার মধ্যে কোনও লুকোচুরি ছিল না। অন্যান্য সপ্তদশায় সাধন-মগলীতে জাতিভেদ বিচার হয় নাই। ইহার বাংলার বিশেষত
নবযুগের বাংলা

এ সকলের দ্বারা স্বাধীনতা-স্পৃহা বাংলার প্রস্তুতির ভিত্তির কতটা যে বলবতী, ইহাঙ্ক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলায় দক্ষিণের শ্রীমুনিবারচার্যের মত সমগ্র হিন্দুসমাজের কোনও অধিনায়ক ছিলেন না এবং নাই। বাংলায় কুলগুরু আছেন, সদৃশ আছেন, কিন্তু সর্বসাধারণী শ্রীভগবান ব্যতীত "জগৎগুরু" বলিয়া কোনও মানুষ বা মহান নাই। বাংলায় ভাস্ক্রণ আদি বর্ণ আছেন। কিন্তু মাদ্রাজ বা দক্ষিণাত্যের মত গৃহীত প্রভাব নাই। বাংলায় চণ্ডীলালের মাদ্রাজ বা মহারাষ্ট্রের "পারিয়া"-দিগের মত একান্তভাবে কখনও "অপূর্ব" বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পারিয়ার হিন্দুর দেবমন্দিরের ছায়ার নিকটও যাইতে পারেন না যেসব স্থানের জলাশয় স্পর্শ করিতে পারেন না, মন্দির-পার্শ্ববর্তী পথে বিচরণ করিবার তাহাদের অধিকার নাই। বাঙ্গালীর চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে বাংলার চণ্ডীলালের পূজা সময় দেবতার ভোগ-আরাধনায় দোল বাঙালি থাকেন। মাদ্রাজে "দৃষ্টিদোষ" মানা হয়, অর্থাৎ রাবণের খাতের উপর অ-রাবণের চক্ষু পড়িলে তাহা অশুচি হইয়া যায়, বাংলায় "দৃষ্টিদোষ" বলিয়া কোনও বস্তু নাই। এইরূপ কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্মসাধনে বাঙালি সাধনার মধ্যে বৌদ্ধ হইতেই একটা অপূর্ব স্থানীয়তার প্রেরণা জাগিয়া আছে। ইহাই বাঙালির প্রধান বিশেষত।

বাংলার সন্তান সাধনার আর একটা বিশেষত—ইহার মানবতা—ইহাঙ্ক আর কি বলিব, সহসা ভাবিয়া পাই না। বাংলায় দেব-বাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যেসকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদৃশ্ব মানবতা যুটায় উঠিয়াছে। কালী, দূর্গা, সরস্বতী, ইহাঙ্কের কাহারও বা দশ, কাহারও চারি হাত আছে বটে, কিন্তু ইহা সেগুলো এসকল যে অপূর্ব মানুষ-মুন্তি।
ইহা আশচর্যরূপে প্রভুত হয়। এই অতি-প্রাকৃত হাতগুলি বাদ দিলে ঈহাদিগকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। দূর্গা ও সরস্বতীর মুখের অনুভূতি অনুভূতি আমন্ত্রণ যে মাতৃভাবে লালিত পালিত, সেই সাবর্জনীন মানবীয় মাতৃভাব যেন ফাটিয়া পড়ে। দক্ষিণের হিন্দুরা হলমানের ও গণপতির পুজো করেন। পশ্চিমেতে মহাবীরের আরাধনা বহুলাকাক্ষী প্রচলিত। কিন্তু বাংলার মুর্তিপূজাতে কেবলমাত্র দূর্গাপ্রতিমার সঙ্গে গণেশের মূর্তি থাকে। জনসাধারণের উপাশ্রুপে আর কোথাও গণপতির পুজো বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে, কেবল বাংলার বিশ্বস্ত প্রাচীন ও স্থাপত্যের মূর্তি থাকে। এছাড়া বাংলার মুর্তিপূজায় বা প্রচলিত দেবোপাসনায় অতি-প্রাকৃতের বা অতি-মানবতার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কম।

তারপর বাংলার অবতারবাদকে আশ্রয়। করিয়া পৃথিবীর সর্ববর্ত দর্শনের গোড়ার অতি-প্রাকৃতের ও অতি-মানবতার প্রভাব বিলুপ্ত করিয়া প্রচুর হইয়া মানুষের আরাধ্য দেবতাকে মানবতার ভূমিতে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক ধর্মের ও অবতারবাদের আশ্রয়ের পরম দেবতা মানবের দেহ ধারণ করিয়া মানবতার ভূমিতে আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমে এবং দক্ষিণাত্যে এইরূপে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসন দর্শনকে মানবতার ভূমিতে আনিয়াছে। কিন্তু বাংলায় গোড়ার বৈশ্বিক-সিদ্ধান্ত এই অবতার-বাদ যে অনুত্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে সেরূপ আর ভারতের অন্য কোথাও হয় নাই। ভারতের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা আছে। কিন্তু এ সকল কৃষ্ণের উপাসনা। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাবনের অবতার বলিয়াই জানেন। কেবল বাঙালী বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণকে অবতার রূপে নহে, কিন্তু
“অবতারী” রূপে—অর্থাৎ যাহা হইতে সকল অবতার-প্রবাহ প্রকাশিত হয় সেই পরম পুরুষ শ্রীভগবানরূপে—প্রাপ্তিত করিয়াছেন। “কৃষ্ণপূর্ণ ভগবান স্বয়ং”—আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করি, তিনি—স্বয়ং ভগবান। শ্রীজীবগোস্থানী ‘লব্ধ-ভাগবতভাষ্য’ স্পষ্ট করিয়াই কহিয়াছেন যে, যদু-সন্ধুত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। আমরা যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কুহ, তিনি এই যদু-সন্ধুত শ্রীকৃষ্ণ নহেন। যদু-সন্ধুত শ্রীকৃষ্ণ ধারকর রাজা ছিলেন, ভারতযুদ্ধে পাণ্ডবদের সহায় ছিলেন, কৃষ্ণক্ষেত্রে অজ্ঞানের রথের সারথি হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের যে শ্রীকৃষ্ণ—

বৃন্দাবন পরিতাজ্জ স কশিৎ নৈব গচ্ছতি।

—বৃন্দাবন পরিতাজ্জ করিয়া। কদাপি তিনি অচ্ছন্ন গমন করেন না।

eই বৃন্দাবন তাহার চিদানন্দনয় নিত্য-থাম। এই শ্রীকৃষ্ণ চূড়াহঁজ বা ষড়ভূজ নহেন—তিনি সর্বদাই বিভূজ। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলার বৈশ্য মহাজনের স্বয়ং ভগবানের পরিপূর্ণ মানবহ প্রাপ্তিত করিয়াছেন। ভগবান নিরাকার নহেন, জড়তাকার নহেন, কিন্তু চিদাকার। তিনি বিদেহী নহেন, অপচয়-উপচয়শীল জড়তেজখার নহেন, কিন্তু চিদেজখার, নিকটি রসামৃত-মূর্তি। তিনি অতীতিয় বটেন অর্থাৎ প্রাগুক্ত মানবীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাকে গ্রাহণ করিতে পার। যায় না, তাই বলিয়া তিনি নিরীক্ষিত্ত নহেন, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়-সম্পন্ন। তিনি নিঃসংগৃহ নহেন, কিন্তু তাহার নিতালীল। পরিজ্ঞাত ও পরিকার সঙ্গে নির্ভরকাল বিশ্বাস।

এইরূপে বাংলার বৈশ্য সিদ্ধান্ত ভগবানের পরিপূর্ণ মানবত। স্বপ্রাপ্তিত করিয়া সাধারণ মনুষ্যদের ভূমিতে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে এক নিত্য মাধুর্য্য-সর্বকাল প্রাপ্তিত করিতে চেষ্টা।

করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অন্তর্লীলা, অনন্ত কোটি ব্রক্ষাঙ্গে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি অনস্তভাবে লীলা করিয়েছেন।
বাংলার বৈশিষ্ট্য

কিন্তু

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বনাম্ন নরলীলা।

নরবপু তাহার সহায়।

এমন কথা ভারতের অভ্যন্তর কেন, জগতের আর কোথাও কেহ কহিয়াছেন বলিয়া জানি না। এই লিখিত ও সাধনার বলেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস টুরিয়ার মানুষকে তাকিয়া কহিয়াছেন—

শুন হে মানুষে ভাই
সবার উপরে মানুষে সত্য, তাহার উপরে নাই।

আধুনিক যুগের কর্তৃভঙ্গা সম্প্রদায়ের কবি ইহাই যেন প্রতিধবনি করিয়া গাহিয়াছেন,—

“কি আর বলিব রে, কে করিবে প্রত্যয়।
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দন্য।”

অতি সংক্ষেপে এবং সামাজিক ভাবেও বাঙালীর চিন্তার ও সাধনার ইতিহাস লক্ষা করিয়া দেখিলে এক দুর্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনের স্বারা দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধরা এবং মানুষের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যাশ করা, ইহাই বাঙালীর পুরাতন সাধনার মূল লক্ষ্য বলিয়া দেখিতে পাই। এই স্বাধীনতার ভাব ও মানবতার আদর্শ আমাদের অক্ষতাস্ফারে আমাদের হাড়ে হাড়ে দুঃখিতচিত বলিয়াই ইংরাজ যখন যুরোপের এই যুগের নূতন স্বাধীনতার ও নূতন মানবতার সংবাদ লইয়া আমাদের নিকট আসিল, আমাদের সেই লুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়াই তাহার এই নূতন শিক্ষা আমাদিগকে এমনভাবে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি এই নূতন শিক্ষা আমাদের পুরাতন প্রাণের স্মৃতিকে না জাগাইত, তাহা হইলে কখনও আমরা ইহাকে এমন করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না। একই ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ধের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া বাংলায় সেভাবে
ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর যে সেভাবে হয় নাই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল বাঙালির পুরাতন সাধনার বৈশিষ্ট্য। বাহিরে নতুন হইলেও এই শিক্ষার মূলমন্ত্র আমাদের নিকট নূতন ছিল না।
বাংলার প্রাক্তনজগৎ বিচারের মত ইহা আমাদের মধ্যে এমন অপূর্বতন পূর্বতন উঠিয়াছিল।

এই গোড়ার কথা না জানিলে ও ভাল করিয়া ধরিতে না পারিলে বাঙালির নবযুগের কথা বলাও বুঝা, শোনাও নিস্ফল।
দ্বিতীয় কথা
যুগ-প্রবর্তক রামমোহন

রাজা রামমোহন হইতেই বাংলার নবযুগের সূচনা, অনেকে একথা কহিয়া থাকেন। কথাটা সত্য বলিয়া মনে হয়। রাজাই প্রথমে বাংলার সনাতন স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি ও মানবতাকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন। জীব যেমন জাগে ও যুমায়, সামাজিক ও সেবার এক একবার জাগিয়া উঠিয়া। আপনার লক্ষ্য সাধনে প্রুত হয়, আবার তাই লক্ষ্য তুলিয়া গিয়া যেন যুমায়া পড়ে। নিন্দাটা তমাগুনের প্রায়শী হেতু আমাদিগকে আসিয়া আচ্ছন্ন করে। কোন জাতি যখন মুহাইয়া পড়ে তখন এই তমাগুনের দ্বারাই সে একান্ত অভিযুক্ত হয়। আলসা, অজ্ঞানতা, এ সকলই তাদের লক্ষ্য। তম-অভিযুক্ত হইলে সমাজ যাহা চলিয়া। আসিয়াছে তাহাতেই গাঁ’ চালিয়া দেয়। ধর্ম এবং কর্ম উভয়ই তখন প্রাচীন নেমি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া। একান্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রাদির প্রামাণ্য তখন বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেখানে জিজ্ঞাসাই জাগে না সেখানে বিচারের অবসর কৈ? আমাদের সমাজ ও রাজা রামমোহনের সময়ে এই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোক ধর্মরুপে অমর্নয়ের অমূল্যের উপরে গড়িয়া। না তুলিয়া বাহিরের আচর বিচার দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্র যে বেদ, পুরাণেরা এবং জনসাধারণ মুখে ঈশ্বর মানিতেন, কিন্তু বেদের অধ্যয়ন দেশে লোপ পাইয়া। গিয়াছিল; মূর্তি এবং পুরাণই ধর্মের প্রামাণ্য-শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই সকল মূর্তি
নবমৃগের বাংলা

ও পূরাণের মধ্যে অনেক পুরুষের বিরোধী কথা আছে। এই সকল বিরোধীর নিষ্পাদিত করিয়া পূরাণের ও শ্রুতির মর্যাদা উদ্যান ও মর্যাদা! রক্ষা করার চেষ্টা কেহ করিতেন না, নিজেদের স্বত্বধামত শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেন মাত্র। রাজা রামমোহনের সঙ্গে যে সকল রাজ্যের পঞ্চিতের বিচার হয় তাহ। পঞ্চিতে পঞ্চিতে দেশের সেকালের লোক-চিন্তায় ও লোক-প্রবৃত্তির এই দুইটাই চক্ষের উপর পরিকার হইয়া দুটিয়া উঠে।

এই অবস্থায় রাজা রামমোহন বাংলার সেই চির-প্রাচীন এবং চিরপরিচিত, কিন্তু সম্প্রতি বিন্দুত, স্বাধীনতা ও মানবতার মর্যাদা জুড়ে জুড়ে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজার এই চৈতন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রেরণায় জগত নাই। রাজ্যের পঞ্চিতের সঙ্গে বিচারে, কিন্তু তিনি যে বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার করেন তাহার ভূমিকায়, অথবা অভ্যন্তর ধর্ম পুনর্ভূত কম কি তাহার সামাজিক আলোচনাতেও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসকল কেনে রাজা সর্বত্রই গ্রাম-ঝাঁপের পুরোহিত শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উপরই আপনার সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়া দেয় নাই।

যে ইংরেজী শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহার উপরে অতীতের শত্রুকার শেষের ভাগের ফরাস্য যুক্তিবাদের ছাপ পড়িয়াছিল। এই শিক্ষা যুক্তিকেই বস্তু জ্ঞানের ও সত্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ বলিয়া। আমাদের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। আমাদের প্রথম যুগের ইংরেজী-নবীনের। প্রায় সকলেই এই যুক্তিবাদের ধারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা একে যুক্তিবাদ অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু যুক্তি এবং শাস্ত্রের পরস্পরের বিরোধ মিডিয়া যুক্তি ধারা শাস্ত্রার্থে নিকাশিত ও শাস্ত্র ধারা যুক্তিকে সমৃদ্ধ করিয়া, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়ের।
যুগ-প্রবর্তক রামমোহন

সম্বন্ধের উপরে আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

শাস্ত্র ত কথা; কথা ত বস্তুর অর্থ যাহা আছে বা হইয়াছে তাহার সংকেতিক চিহ্ন মাত্র; যাহা আছে বা হইয়াছে তাহা আছে কি না, হইয়াছিল কি না, ইহার প্রমাণ মানুষের প্রতাপ অনুভব। সুতরাং শাস্ত্রীয় কথার প্রামাণ্য প্রকৃতপক্ষে সে নিজে নয়, কিন্তু সাধকের অনুভূতি। তত্ত্বনা শাস্ত্রোপদেশ সাধকের অনুভূতিতে প্রাতাপ হইয়া ফুটিয়া। উঠে তত্ত্বনা তাহার সত্য এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না, তত্ত্বনা শাস্ত্র অন্যা-অন্য ধর্মের মত পাড়িয়া থাকে। যাজ্ঞিকেরা কন্ধ কাণ্ডে শাস্ত্রের প্রামাণ্য এইরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে জ্ঞান- সাধনার মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তত্ত্বনা না বস্তুর অনুভব হয় তত্ত্বনা তাহা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। কারণ “অনুভূতি পর্যায় জ্ঞানম্ জ্ঞানম্”—অনুভূতিতে যাহা শেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানই জ্ঞানকাণ্ডের পথ—শ্রবণ, মনন ও নিদিষ্যান। কেবল শ্রবণ নহে, শাস্ত্রের শব্দ শুনিলেই জ্ঞান জন্মে না। শ্রবণের পরে মনন চাই। মনন অর্থ, বিচারপূর্বক শ্রুতি শাস্ত্রের বা উপদেশের অর্থের ধারণা লাভ করা। এখানেই জ্ঞান-সাধনে বিচারের প্রতিষ্ঠা হইল। বিচারের বাহন যুক্তি। সুতরাং জ্ঞানের পথে যে চলিবে সে যুক্তি ছাড়িয়া। এক পা’ও অগ্রসর হইতে পারে না। এই বিচারের লক্ষ্য, শাস্ত্রে যাহা শোনা গেল, অনুভবেতে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করা।

রাজা এই প্রাচীন পথ ধরিয়াই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া। বাঙালী হিন্দুর ধর্মকে তাহার অনুভবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজার যুক্তিবাদ অর্থাদেশ শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের অনুকরণে গড়িয়া উঠে নাই। রাজা আমাদের প্রাচীন মৌমাসার পথ ধরিয়া যুরোপের অর্থাদেশ শতাব্দীর এই যুক্তিবাদের অপূর্বতা ও
অসম্ভব দৃষ্টি নষ্ট করিতেই চাহিয়াছিলেন। রাজ্যার বিচার-পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তদি একটি লক্ষ্য করিয়া। দেখিলেই, আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা যে তাহাকে সংক্ষ-ক্রিয়া উদ্ভূক্ত করে নাই, ইহার স্বম্পত্তি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ, ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিবার পূর্বেই রামমোহন আপনার জীবন-ব্রহ্ম গ্রহণ করেন।

তাহার জীবনের প্রথম প্রোম্য আসে মুসলমান যুক্তিবাদী মোতাজীল। সম্প্রদায়ের একটি পড়িয়া। রামমোহন তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মাত্র। বলিলেও হয়। পাটনায় পারসী ও আরবী পড়িতে যাইয়া। মুসলমান সাধনার সংস্পর্শে তাহার অন্তরে দেশের প্রচলিত দেব-বাদ ও প্রতিমা-পূজার বিরোধী ভাবের সংগ্রাম হয়।

‘তুফাতুলমহাবিদ্যা’ নামক পুস্তিকায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাটনার হইতে রাজা সংস্থাত পড়িবার জন্য কাশীতে যান। এই ধানেই উপনিষদ ও মৌমাসা। শাস্ত্রের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ইহার বহুদিন পরে রাজা ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। রাজার বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার একজন আদি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তখনও যুরোপীয় সাধনার পূর্বের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে ফুটিতে আরম্ভ করে নাই। রাজার অলোকসামান্য মনোযোগ তাহার কথকটা আত্মায় পাইয়াছিল সত্য। লর্ড আমাহার্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার বহু পূর্বে হইতেই রাজা নূতন করিয়া বাংলাদেশে আমাদিগের পূর্বতন ব্যাধীনতা ও মানবতার হুমকি বিনাদ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল তলাইয়া দেখিলে রামমোহন যে বুদ্ধির প্রবর্তন করেন, তাহাকে কিছুতেই ইংরেজ যুগে বা ফেরাঙ্গ যুগে বলা যায় না। যে সূত্র অবলম্বন রাজার প্রচলিত হিন্দুধর্মের জন্য কালিতে আরম্ভ করেন সেই সূত্র অবলম্বনেই শ্রীরামপুরের পাদদীরের সঙ্গে বিভক্ত। উপন্যিত হইলে তাহার ‘Three Appeals’
to the Christian Public’ এর প্রচলিত খুষ্টিয়ান ধর্মেরও জন্মাল কাটিয়ে চেষ্টা করেন। এদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ব্রাহ্মণপশ্চিম এবং অন্যদিকে প্রচলিত খুষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাদরী—এই উভয় দলের সম্মে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা। সত্য প্রতিষ্ঠাব ও শাস্ত্রাধ্যয়নের যে সকল মূল সূত্র স্থাপন করেন তাহাতে কেবলই যে তাহার অলৌকিক মৌলিকতাই প্রমাণিত হয় তাহা নহে, কিন্তু রাজা ভারতের সচিন সাধনা ও অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়া যে এই সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বীর্য এ সকল তলাইয়া দেখিয়াছেন তাহার। কিছুতেই রাজা রামমোহনকে পরবর্তী ইংরাজী-নবীশ বাঙালিদিগের মতন বিদেশীয়ের অনুকরণশীল, বিদেশী প্রভাবের দ্বার। অভিভূত, আপনার স্বদেশের সনাতন প্রকৃতি ও বৈষম্যের আজ্ঞাশূন্ত, মায়ুলী ধর্ম বা সমাজ সংস্কারক বলিতে পারেন না। রাজা বর্তমান যুগের যুগগতিশীলে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং একাধিকে প্রাচীনের সূত্র দৃঢ়মুদ্ধিতে ধারণ করিয়া, অন্যদিকে নিজের স্বজনগতির সাধনার সনাতন কষ্টিপালকে যুগের অগ্রস্থ সাধনাকে করিয়া, উভয়ের সমিলন ও সমষ্টির উপরে এখনে বর্তমান নূতন যুগের, নূতন সাধনার গোড়াপত্তন করিয়া যান। এই জন্যই রাজা রামমোহনকে বাঙালি নবযুগের প্রবর্তক বলিতেছি।

(২)

যে বেদ শাস্ত্রের উপরে হিন্দু আপনার ধর্মের প্রাপ্তাণ্যা প্রতিষ্ঠিত করে সেই বেদেই যে জগতের সন্নাতন সত্যকে মানবের অমূল্য-সাপেক্ষ করিয়াছে, ইহা দেখাইবার জন্যই, মনে হয়, রাজা রামমোহন উপনিষদে ও বেদাংশ-সূত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ্ব,
কেন, কঠ, মণ্ডুক, ও মাণুকা—এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও বাংলা অনুবাদ প্রচার করেন। আর এই কথানি উপনিষদের মোটের উপরে বিশেষ পরম্পর ব্রহ্মবস্তুকে সাধারণ মানবের সাধারণ অনুভূবের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; শাস্ত্র প্রমাণের উপরে করে নাই। অন্য পক্ষে 'কেন' উপনিষদ সুপ্রস্ত ভাষায় বেদান্ত ভাষায় নিকৃষ্ট বিষয় এবং যাহা স্বাভাবিক ব্রহ্মকে জান। যাহা তাহাকে শ্রেষ্ঠ বিষয় বলিয়া চুরি। স্বতরাং তত্ত্বস্তুত্তরা প্রামাণ্য বেদ নহে, কিন্তু তাহা, যাহা অতি ব্রহ্মকে জানা যায়। ব্রহ্মকে জানা যায় ছাড়া উপায়ে—এক, সমাধিযোগে। অপর, ব্রহ্মকে জ্ঞাত করিয়া অপর ব্রহ্মকে জ্ঞাত করিয়া কৰ্মের কর্তার রূপে। সাধারণের পক্ষে ইহাই ব্রহ্মকের প্রশ্ন পথ। বেদান্ত এই পথই প্রথমে নির্দেশ করিয়াছেন। "জনাধান যজ্ঞ" জগতের জন্ম, বিভিন্ন ব্রহ্ম এবং যাহাই অতি ব্রহ্মকে জানা অতর্কতা হইয়াছে। উপনিষদের কহিয়াছেন যে সাধকের ইন্দ্রিয়গ্রাম মন এবং মুদ্রহাই ব্রহ্ম-সাধকের পথ। ভূতু-বারুণী তাহাদের এই পথই নির্দেশ করা হইয়াছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলের মাধ্যমে আপন সব দিক ইহ। দেখি যে যাঃ ছিল না, তাহাতে স্বল ইহা হইল, যাঃ স্বল তাহা হইল, আর যাঃ স্বল তাহাও ক্রমে অন্ধ হইয়া গেল। এই তিন অবশ্যই বেদান্ত জ্ঞান কহিয়াছেন। এই যে সার্বজনীন অভিজ্ঞতা, মন এবং বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়া ইহার বিশেষণ করিয়৷ করিতেই বর্ণপূর্ত ভূতু ক্রমে তত্ত্ব-তত্ত্বে উপনীত হন।

একটু অভাববেই দেখিতে পাওয়া। যায় যে ভূতু-বারুণী সংবাদে উপনিষদের ব্রহ্ম-সাধন লাভের যে প্রশস্ত পথ নির্দেশ করিয়াছেন সে পথে, ভারতের প্রাচীন ব্রহ্ম-তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক মূর্তিগুলো সাধনার জড়-
বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের আশীর্বাদে মিল হইয়াছে। বরুণ-পুত্র ভূমি ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সে বস্তু কি, যাহা হইতে জগতের জন্ম আর্দ্র হইতেছে, তত্ত্ব দ্বারা তাহার সন্ধান করিতে যাইতেন সত্ত্বা প্রথমে অম্বই ব্রহ্ম। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই অন্যের সত্য অর্থাৎ অনুভবপ্রতিষ্ঠিত অর্থ কেবল প্রাকৃত অন্ত বা খাঁচা নহে, কিন্তু এই বিশ্বের প্রতাপ জগত উপাদানসমূহ। সূক্ষ্ম জড় হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই জড়ের দ্বারাই বিশ্বের স্থিতি, এই সূক্ষ্ম জড়েতেই বিশ্বের পরিণতি বা লয়, অন্ত:ব্রহ্ম সিদ্ধান্তের উৎপত্তি নিগুঢ় মন্থন। এই সিদ্ধান্ত জড়:বিজ্ঞানের সীমান্ত। আমাদিগকে বর্তমানে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্য প্রথমে বরুণ-পুত্র ভূমির নায় এই জড়:বিজ্ঞানের পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগের উদ্বোধন জড় কে গ্রহণ করা, জড়েতেই সংকল্প করা, জড়কে পাইয়া আনন্দ উপভোগ করা। এই জড় জঙ্গতেই আমার ব্রহ্মকে বিশ্বের অঙ্গ-আঙ্গ করনঃপূর্ণ, আচ্ছাদন অরূপ, জ্ঞানবৃত্ত অরূপ, কারণজ্ঞে ভাসমান ব্রহ্মাণ্ডের মূল অরূপ, প্রতাপ করি। এই কারণ প্রায়ই ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম বিন্যাস। অন্ত:ব্রহ্মকে প্রথমে ন। জানিয়া প্রকৃতপক্ষে একেবারে বিজ্ঞান-ব্রহ্মকে জানা যায় ন।

কিন্তু ভূমি যেমন এই সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা প্রতাপ করিয়া পুনরায় তপস্যা প্রায় হইয়া অন্য অপূর্ণ শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ, যাহার দ্বারাই অন্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, সেই প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ জড়:বিজ্ঞানের ভূমি হইতে উঠিয়া জীববিজ্ঞানের ভূমিতে ব্রহ্মকের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভূমি প্রাণ-ব্রহ্মের অপূর্ণতা প্রতাপ করিয়া, ক্রমে যে মনেতে প্রাণের প্রামাণ্য, সেই মনকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরেন। এ পথ মনোবিজ্ঞানের পথ। কিন্তু মন এবং তাহার ইধীন ভানেদ্রিয়সমূহ প্রকৃতপক্ষে
বস্ত্র থেকে জ্ঞান লাভ করে, সমগ্র বস্তুকে স্বীকৃতি প্রাপ্ত করিয়া তাহার একমাত্র ধারণা করিয়া সমর্থ হয় না। এই একমাত্র অনুভব করা মনের অধিকারের বাহিরে। যে বৃত্ত-দ্বারা আমরা মন এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৃষ্টি থেকে জ্ঞানে অথবা বস্তু রূপে পাওয়া তুলি, তাহার নাম বিজ্ঞান। ভূগোল মনে বক্ষ, এই সিদ্ধান্তের অপূর্বতা। উপলব্ধি করিয়া, ক্রমে বিজ্ঞানই বক্ষ, ইহা জানিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেই বিশ্ব-সমস্তার শেষ মীমাংসা হইল না। এই বিজ্ঞানের দ্বারা আমাদিগের অভিজ্ঞতার সকল প্রকৃতি খুলিতে পারি, কেবল একটি মাত্র প্রকৃতি বিজ্ঞানের চাবি দিয়া খোলা যায় না। সেই প্রকৃতি আনন্দের প্রকৃতি। এই রূপে পরিণামে জড় হইতে আরস্ত করিয়া ধাপে ধাপে ভূগোল বক্ষান্তরে যে অভিজ্ঞতা, তাহাতে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

ভূগোল-বারুণী সংবাদের বক্ষ-সাধনের সকলের ভাল করিয়া ধরিতে পারিলে এখানে আধুনিক যুগের সাধনের সঙ্গে ভারতের সনাতন বক্ষ-সাধনের অংশে সম্মিলন ও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূগোল অন্ত-বক্ষ আধুনিক যুগের physico-chemical group of the sciences-এর চরম সিদ্ধান্ত মাত্র। এই সংবাদের প্রাণ-বক্ষ যুগের biological group of the sciences-এর চরম সিদ্ধান্তের নামাংকন মাত্র। সেই রূপে ভূগোল মনে-বক্ষ আধুনিক psychological group of the sciences-এর শেষ সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল বিষয়-বক্ষ এবং আনন্দ-বক্ষ আধুনিক সাধনার philosophy এবং art-এর চরম সিদ্ধাস্থতেরই নামাংকন মাত্র। রাজা একক চোখ কোথাও খুলিয়া বলিয়াছেন বলিয়া জান নাই। কিন্তু একদিকে তাঁর বেদান্ত-শাস্ত্র প্রচার এবং অন্যদিকে এদেশে আধুনিক পাণ্ডাত্ত বিজ্ঞানের শিক্ষা-বিজ্ঞানের চেষ্টা এ দুইয়ের মধ্যে সাঙ্গতি ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, এই সূত্রের।
যুগ-প্রবর্তক রামমোহন

অগ্নিয় মাত্র করিতে হয়। তিনি বারংবার কহিয়াছেন, “ভাষাতে জগতের কথা-রূপে ভজনা কর, কার্য্য দেখিয়া কর্তা মান।” তলাইয়া দেখিলে ইহাই ভূত-বাক্রুণ সংবাদের প্রথম শিক্ষা। বিশেষে প্রকৃতি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়াই জগৎ-কার্য্যের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। আর বিখ্যাতকর্তির অনুসন্ধান করিতে গেলেই জ্ঞ kd-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানাদির পরীক্ষিত পণের অগ্নিয় গতিতে হয়। এই পথে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক যুগের সাধারণ মিলন সহজ ও অবশ্য করা। রাজার জীবনের সমগ্র চেষ্টা এই লক্ষ্যে ধরিয়াই চলিয়াছিল। ভারতের মধ্যযুগের একাধিক অন্তর্মুখী জ্ঞান-সাধনকে মানুষের দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত রাজা সত্যোপত্তি ও বস্তু-তত্ত্ব করিতে চাহিয়াছিলেন।

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বে কে ও অতিপ্রাকৃতির কথা নাই, কেনও অলৌকিক ব্যাপার নাই, কেনও প্রকারের অনুভূতির অনুভূতি শাস্ত্র-প্রামাণ্যের উল্লেখ নাই। যাহা হইতে এই সকল ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া। যাহা নাই। এই সকল ভূতগ্রাম জীবিত ধারিতেছে, যাহার প্রতি এই সকল ভূতগ্রাম গমন করিতেছে ও অন্ততঃ যাহাতে প্রবেশ করিতেছে--তাহাই ব্রহ্ম, বেদান্তের “জ্ঞানাঞ্জগ” সূত্র এই শাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। রাজার উপনিষদ ও বেদান্ত-প্রাচারের মূল লক্ষ্যটি এখানেই ধরা পড়ে। এই ব্রহ্মই হিন্দুর সাধারণ জীবের একমাত্র সাধা। এই ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে জীব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না, দেবতারা পর্যন্ত এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের জ্ঞান লাভার কথা নিখুঁত দেবারাও মুক্তিকামী হইয়া ব্রহ্মের ভজন করেন। শাস্ত্র-প্রামাণে এ সকল কথা দেখিয়া রাজা বাংলার ব্রাহ্মণ-চগ্গালের নিবিষ্কেষণে সকল হিন্দুকে আত্মিজন এই ব্রাহ্মণের পথ নির্দেশ পূর্বকরিলেন। ইতুতরেই বেদান্ত প্রাচীন হিন্দুসাহায্য সন্তুষ্টতেই অবশ্য
ছিল। স্তরাং অভিষয় প্রোত্সাহ ব্যাঘীচর আর কেইহই,—কি ব্রাহ্মণ কি অন্য জাতি—এই শাস্ত্রের সংহার্থ জ্ঞানলভ করিতে পারিতেন না। কিন্তু মুক্ত তে কেবল পরিত্যাগেরই সাধা নহে, জীবনমুদ্রারই সাধা। মুক্তি-সাধনের অধিকার যেমন ব্রাহ্মণের সেইরূপ চণ্ডীলাই, যেমন বিদ্রোহের সেইরূপ অঙ্গ জনের। মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রগুলিকে অভিষয় কঠিন যে সংস্কৃত ভাষা তাহার আবরণ দিয়া বাঁধিয়া ছাঁদিয়া। রাখিলে চলিবে কেন? সকল শাস্ত্র যাহাতে সকল লোকে পড়িতে ও রুদ্রণ পারে, তাহার জন্যই রাজ এসকলের বাংলা। অমুবাদ প্রচার করিতে আরস্ত করেন। এই ভাবে বাংলার হিন্দু সাধারণের স্বাধীন চিন্তা জগাইয়া যাহাতে তাহার বুঝিয়া শুনিয়া বিচারপূর্বক শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করিয়া ধর্ম্মসাধনে সমর্থ হয়, তিনি তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

ইহা কেবল ধর্মসংস্কার নহে। কিন্তু উপনিষদাদির বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়া। রাজ বাংলাদেশে বাঙালী হিন্দু-সমাজে এক অভিনব চিন্তাধারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আবার নূতন করিয়া ভগীরথের মতন বাঙালীর মুক্তি-কামনায় এক অভিনব গঙ্গা ডাকিয়া আমিলেন। আমরা আজ বাংলার হিন্দু সমাজ চিন্তা। ও সাধারণে যে এক নূতন প্রাণত্ব ও সমগ্র চেষ্টা দেখিতেছি তাহার মূল নিকার রাজ রামমোহনের শাস্ত্র-প্রচারে।

(৩)

রাজের কেবল সর্দীয়ার চিন্তা ও চিন্তাকে অঙ্গ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষমতা হয় নাই। যেখানে বন্ধন সেখানেই তাহার শারীরিক খড়ক গিয়া পড়িয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দাঁড়াইতে হইলে সকলের আগে তাহার মন্ত্রে স্বাধীন করিতে হয়। ধর্মের এই স্বাধীনতা এক্ষণে এদেশে
চিরিদিনই ছিল। অর্থাৎ বাক্তিগত মহব্দ বা সিদ্ধান্ত বা সাধারণ উপরে সমাজ কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই, কিন্তু ধর্মীয়বিধান ও ধর্মীয়—
সাধনে মানুষ যে পরিমাণে স্থানান্তর পাইয়াছিল সেই পরিমাণেই 
সমাজ আচারের ও কর্মের বদলে তাহাকে শক্তি করিয়া। বাঁধিয়া 
রাখিয়াছিল।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ সমুদ্রলজ্জনকমঃ।

তথাপি লৌকিকচারাঙ্গ মনসাপি ন লঞ্জয়ৎ।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং যোগবলে সমুদ্রলজ্জনকমও হয়ন তথা পি 
চিন্তাতেও তিনি লৌকিকচারাঙ্গ লঞ্জন করিবেন না। এই লৌকিকচারাঙ 
চারাঙ্গ ধর্মের অস্তন—দণ্ড হাতে লইয়া। মনুষ্যহৃদয়কে পঙ্ক করিয়া। রাখিয়া 
ছিল। শাঁক ও উচ্চতর সাধনের কথা কেই বা জানিত। যদি 
কাঁচা কেহ জানিতেন, তাহা জনমণ্ডলকে জানাইবার চেষ্টা করিতেন 
না। সমাজের এই অবস্থায় রাজ। এক দিকে যেমন ব্রহ্মান্ত ও মূর্তি 
সাধনাকে জনসাধারণের অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন সেইরূপ অন্যদিকে তাহাদের আচার বাবহারকেও প্রচলিত 
সংস্কারের ও রীতিনীতির বদন হইতে অনেকট। মুক্ত করিয়া দেন; 
এবং যেমন ব্রহ্মান্ত প্রচারে সেইরূপ একসকল ব্যক্তিগত এবং 
সার্বজনিক জীবনের বাহিরের কার্যেও তিনি একান্তভাবে যুরোপীয় 
দিগের মত কেবলমাত্র যুক্তির পথ ধরিয়া চলেন নাই, কিন্তু শাঁক ও 
যুক্তি উভয়কে মিলাইয়া সমাজ—সংস্কার ব্যতি ব্যতি হয়ন।

রাজা দেশ—প্রচলিত “ছোটমারের” পশ্চাপাটী ছিলেন না, ইহাকে 
নষ্ট করিবার জয়ই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রোটীণ শাস্ত্রানুমোদিত পশ্চ 
পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা কহিয়াছেন—ব্রহ্মান্ত যে সাধনা 
করিবে তাহার আবার শুচি অশুচি কি? যে সববতৃতে আত্মাদৃষ্টি 
সাধন করিবে সে বাহিরের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করিবে
কেন? মহানিবাণ তত্ত্বের পক্ষে উল্লাসের ব্যাঘাতের বিধানে এই ছোটমাগের নামগ্রহণও নাই। হত হউক বা অল্পতই হউক, শুচিই বা অশুচিই হউক, সকল অবস্থাতেই পরবর্তনের উপাসন।

প্রশ্ন। এইপ্রয়ে তিনি দেশবাসীর আচারের প্রচার সংস্কারের বদন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন।

(৪)

তারপর আরও খোলাখুলিভাবে রাজা মানুষের মানুষ বলিয়া যে একটি অধিকার আছে, ধর্ম-সাধনের বা সমাজ-শাসনের অসু- হাতে কিছুতেই যে এই অধিকারকে নষ্ট করিতে পারা যায় না, এই মহা সত্য নানাভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের প্রেরণাতেই রাজা সত্তাদাহ নিবারণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়িত্বরতন সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহাতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিলাতে গিয়া পার্লামেন্টের ভারত শাসন সম্মুখীন কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষাৎ প্রদান করেন তাহার ভিতরেও তাঁর এই মানবতার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা ভারতের প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ যাহাতে তাহার নিজের চাষের জমির উপরে সম্পূর্ণ সমাধিকার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পার্লামেন্টকে অনুরোধ করেন। রাজার বিলাত প্রবাসকালে আরনল্ড নামে একজন ইংরাজ তাহার সেক্রেটারি ছিলেন। আর- নন্দের কথায় জানা যায় যে রাজা চরিত্র বৎসর পর্যন্ত ভারতে বুটিশের আধিপত্য খাটিবে, এইরূপ মনে করিতেন। এই চরিত্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের জান বিজ্ঞান ও শিল্পের দিকে শিক্ষা করিয়া দেশের শাসন নিজের হাতে প্রচেষ্টা করিতে, পারিবে। ভারতবর্ষের লোকেরা চিরস্নিত্ত বা স্নাত অনিদিষ্টকাল
পৃথিবীর দুর্বল তীর্থঙ্কর প্রাচীন বাস করিবে, এ চিন্তা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অনেকদিন তিনি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকুশলাদি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে না পারিলে বর্তমান সময়ে কোনও জাতি তুলিয়া মাত্রায় মাথা দিয়া দিয়া থাকিতে পারিবে না। এই জন্য ইংরেজ শাসনের সামরিক প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তিনি স্বীকার করিতেন।

এই জন্যই ইংরেজ চালিশ বৎসর পর্যন্ত ভারতের রাজদুর্গ ধারণ করিয়া থাকুক, ইহাতে রাজার অপত্তি ছিল না। কিন্তু এতবড় একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সামরিক ও উদার সভাও সাধনার অভিকার হইয়া জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাভর্তেও স্বাতন্ত্র্য পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনরায় মোহনচরণ রাজার আমদানির প্রবর্তনক্রমে প্রত্যক্ষ করি। ফলতঃ যে সকল শাসনসংক্রান্ত কথা বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা কহিয়া আসিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলির বিষয় মাত্রা রাজা রামমোহন প্রায় শতবর্ষ পুরের করিয়া গিয়াছেন।

(৫)

যেমন ধর্মে ও সমাজ-সংস্কারে সেইরূপ রাষ্ট্রীয়তার ক্ষেত্রেও রাজা কেবল ভেদ বিরোধকেই জাগাইয়া তুলেন নাই, কিন্তু পরস্পরবিরোধী মতের, শক্তির বা শারীরের একটা সময়ের পথ আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনের সামরিক প্রয়োজন ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে যে স্থানের জাল পাতিয়া-ছিল, বিশ্বমনবের কল্যাণের মূখী চাহিয়া। তাহাকে একদিন সেই
জাল গুটিয়ে হইবে এবং সেই বৃহত্তর স্বার্থের ভূমিতে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডের কুস্তির স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইবে, ইহা বুঝি। ছিলেন বলিয়াই রাজা প্রদেশের এবং জগতের কলাণ কানন এই শাসনের ভাম, একটি অভাব এবং অভিযোগ বাহাতে দূর হইতে পারে পালামোনের কমিটিকে সেই পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজা সংগ্রামে পরামুখ ছিলেন না। হিন্দু রাজ্য পশ্চিমের সঙ্গে এবং লুঘ্নিয়ান পাদরীদের সঙ্গে একক তিনি কি অদ্যা উৎসাহ ও অন্তর্জাতিক পরিশ্রম সহকারে কর্তদিন ধরিয়া। যে আকান্ত প্রতিষ্ঠর জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার শ্রেষ্ঠাবলীতে ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতার আকাঙ্খা যার প্রাণে বলবতী সে সংগ্রাম বিচ্ছ হইতে পারে না; মানুষের উপর মানুষ অষ্ঠা অথবা স্বভাবিত কর্ক, রাজা ইহা সহিতে পারিতেন না। ইংরাজ পালামোনে যখন ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে রিফর্ম (Reform) পিলের আলোচনা হয়, রাজা তখন বিলাতে। সে সময় তিনি তাহার ইংরাজ বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে পালামোনে যদি এই পাঙ্গুলিপি অগ্রাহ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইংল্যাণ্ডে রাস করা অসাধ্য হইবে।

(৬)

রাজার এই মানবতা তাহার রক্তের মধ্যে ছিল। সকল বাঙ্গালীর রক্তের মধ্যেই ইহা আছে। ভাবাবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে, এমন এই দিবেন্দার্ভ বস্তুকে অজ্ঞাতসারে নিজের প্রকৃতির ভিতরে লুকাইলে রাখে। রাজার অন্তঃহিত এই উদার মানবতার আদর্শ উপনিষদের শিক্ষা ও ব্রহ্মাঞ্জন সাধনার দ্বারা আশ্চর্যবৃন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যে আমাদের সকলকে দেখে ও সকলের মধ্যে আত্মাকে দেখে সে কি জাতি ধর্মের বিচার করিয়া মানুষে মানুষে
যুগ-প্রবর্তক রামমোহন

কোনও রুটিম ভেতর প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। রাজা তাহার
গৌরব রক্ষার সংস্কারনের একটা অপূর্ব শ্লোক তুলিয়া জীবের
শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। সংক্ষেপ সময়ে প্রত্যেক রাজ্য

করেন:—

অহং দেবঞ্চ ন চায়োহাস্যি ব্রহ্মায়ি ন চ শোকভাক।
সচিদানন্দরপোহস্যি নিত্যমুক্তস্থাব্যাং
আমি দেবতা, অহং কেহ নহি; আমি ব্রহ্ম, শোকের ভোক্তা নহি;
আমি সচিদানন্দস্বরূপ, নিত্যমুক্ত স্বাভাবসম্পন্ন।

ইহাই মানবের মূল প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ভূমিতেই জীব ও শিব
এক। সেখানে মানুষ—তার জাতি, বর্ণ, ধর্ম, দেশ, যাই হউক না
কেন—সেই যে শিক্ষারূপ, কিন্তু অজ্ঞতাবিশিষ্ট: আপনাকে আপনি জানেনা
বলিয়া! এই সচিদানন্দস্বরূপ মানুষ ছাড়া ত্রিভুবন, শোকে মূহূর্মান,
পাপে ভাপে নিয়ত জ্ঞাত্রিত এবং আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়া। কল্পিত ঙ্গনে
পাফিয়া হাসিয়া করে। এই জীবের শিক্ষারূপের সাক্ষাৎকার যে
সাধক ঈশ্বর পরিমালে লাভ করিয়াছেন, তিনি যেখানে মানুষের মধ্যে
অনন্দ ধার। প্রবাহিত সেখানেই অকুটেভয়ে আপনাকে ডুবাইয়া
দেন, যেখানে মানুষের জন্ম চেষ্টা। প্রকাশিত সেখানেই উৎফুল্ল
হইয়া। উর্জ্জ, যেখানেই মানুষ আপনার জীবনের বহির্ব্যে নিজের
নিজস্ব মুক্তভাব বা অধীনতার প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই তিনি
নিজের আরাধ্য দেবতার প্রকাশ দেখিযা। কৃতুকাতর্থ হয়েন।

রাজা রামমোহনের মধ্যে ইহাই অনেকটা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।
ইংরাজের ভোগবিলাস তাহাকে বিরক্ত করে না, কিন্তু সেই ভোগ-
বিলাসের মধ্যে তিনি সচিদানন্দস্বরূপ বে আজ্ঞা তাহার অনন্দ
উপলব্ধির বিরহচেষ্টা দেখিযা। সম্পূর্ণভাবে এ সকল ভোগ বিলাসে
যোগদান করিতেন। আর, ঠিক সেই হেতুতেই রাজা বিলাস যাইবার
সমুদ্রপথে ফরাসী জাহাজের দেখা। পাইয়া। ফরাসী গণভূক্তের পতাকাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন।

রাজার এই মানবতার আদর্শকে ঠিক ফরাসী বিপ্লবের 'Humanity'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ফরাসী চিন্তার Humanity বা মানবতা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ বৈষম্য আছে তাহাকে উপকা করিয়া একটা কৃতিম সামর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। সকল মানুষই শক্তিতে বা সাধনায় সমান, একথা সত্য নহে। আর মানুষের মধ্যে শক্তির ও সাধনার তারতম্য যখন আছে তখন সকলের সমান অধিকার, এমন কথাও বলা যায় না। কারণ, যার যে কার্য করিবার শক্তি বা শিক্ষা নাই সে অধিকারও তাহার হয় না। হিন্দু চিন্তানির্মাণ শক্তি সাধনের দ্বারা তাহার অধিকার নির্ণয় করিয়া আসিয়াছে। এই অধিকার-ভেদ হিন্দু সাধনার একটা প্রধান কথা। এই অধিকার-ভেদের উপরেই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর এই বিভিন্ন পন্থার প্রতিষ্ঠা করিয়াই হিন্দু আপনার ধর্মের অপূর্ব উদারতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। রাজা এই অধিকার-ভেদ মানিতেন এবং অধিকার-ভেদ মানিয়াই তিনি বৈষম্যের মধ্য দিয়া সাম্য এবং স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়াই একটা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রামমোহনের পক্ষে যুরোপের নিরাকার বা একাকার মানবতার আদর্শের অনুসরণ করা সম্ভব ছিলন। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে উন্নতনায় যুরোপ যে মানুষকে তার জন্ম, ধন, পদ বা অন্য কোনও উপাধির বিচার না করিয়া কেবল মানুষ বলিয়াই বড়া করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল ইহাতেই রাজার চিন্তকে আকর্ষণ করে। ইহার অন্তরালে তিনি আপনার স্বদেশের সনাতন আদর্শের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হ'ন। আমাদের দেশে বক্ষঃ-সাধনের ভিতর দিয়া যে ভাবটা ফুটিয়া। উঠিয়াছিল
সেই ভাবে যুরোপের এই সামাজিক মধ্যে কিছুত্তম পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা যুরোপের সাম্য, মেত্তা এবং বিশ্বমানবতা বা Humanityকে আপনার পরিচিত বিদ্যমান সাধনের ভিত্তির দিয়াই দেখিয়াছিলেন। তার এই জন্তই তার মানবতার আদর্শ সুতুগত এবং বস্তুতাত্মহীন ছিল না। তিনি প্রত্যক্ষ বৈষম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সকল মানুষকে একাকার করিতে চাহিয়া নাই।

মানুষ নিরাকার চৈতন্যমূল্য নহে, সে সাকার। তার চিন্তা সাকার, ভাবায় এবং জীবনের কর্মে প্রকাশিত। তার ধর্ম সাকার অথবা বিশিষ্ট মতবাদ, বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত এবং বিশিষ্ট সাধনার পূজা পদ্ধতিতে গঠিত। তার সামাজিক সম্বন্ধগুলিও সাকার, বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানদিগের ভিতর দিয়া চরিতার্থতা লাভ করে। এসকল বৈষম্য বা দিলে, মানুষ বলিয়া একটা ভাববাচক শক্তিতে প্রাপ্ত হইয়া, কিন্তু মানুষ বস্তুটিকে ধরিতে ছুইতে পাইনা। অথচ অন্যতম, উন্নত শতাব্দীর যুরোপীয় মানবতার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভির ভিন্ন সমাজের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সাধনার ভেদ বৈষম্যকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া। একটা নির্বিশেষ মানুষের এবং ধর্মের সদস্যে ছুটিয়াছিল। রাজা যুরোপের এই বস্তুতাত্মহীন আদর্শ গ্রহণ করেন নাই।

(৭)

করেন নাই বলিয়াই রাজা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রকৃতিগত বৈষম্যকে রক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে একটা সম্মিলন এবং জীবন সমষ্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহার ‘ব্রাহ্ম-সভার’ আদর্শের মধ্যেই ইহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজার সে আদর্শটি বর্তমান গ্রাম-সমাজের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।
এই জন্ম ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করিতে রাজ। ভারতবর্ষের আধুনিক ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যে পথ দেখাইল। গিয়াছিলেন আমরা তাহ। ভাল করিয়া গরিতে পারি নাই। রাজ। দেশিয়াছিলেন যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা ধর্ম সম্প্রদায়কে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নৃতন করিয়া। এক ছাঁচে চালিয়া যুরোপে যেভাবে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে ভাবে একটা ঘননিবিস্ত ভারতীয় Nation বা জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সম্ভব হইলেও সমীচীন হইত না। এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ও সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইলে কেবল যে ভাবাদেরই ক্ষতি হইবে এমন নহে, ইহাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী বা বিশ্বমানব, ইংরাজীতে যাহাকে Universal Humanity কহে তাহারও সমৃদ্ধ ক্ষতি হইবে। এই বিশ্বমানব বিশ্ব-প্রচ্ছদ্গতি ব্যাপের মতন বিভিন্ন আধারের মধ্যে দিয়া। অমনপ্রকাশ করিতেছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিশ্বমানবের প্রকৃত সত্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রাকাশিত। বিশ্বমানব অঙ্গীকার, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিই এই বিরাট পুরুষের অঙ্গীকার। বিশ্বমানব কিংবা Universal Humanity এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা Nation, এতদুভয়ের মধ্যে একটা জীবন্ত অঙ্গীকার সম্ভব প্রতিষ্ঠিত। জীবের সকল অঙ্গ যদি নষ্ট হইয়া। একমাত্র অঙ্গে পরিণত হয়, তাহাতে যেমন সে পঙ্খু হইয়া। পড়ে, সেই রূপ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসকল যদি একাকার হইয়া। যায়, তাহ। হইলে বিশ্বমানবও পঙ্খু হইয়া। পড়িবে। রাজ। এই সত্য প্রত্যাখ্যাত করিয়াই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ধর্ম এবং সাধারণকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া। এক ছাঁচে চালিয়া নৃতন করিয়া। গড়িয়ার চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুকে তিনি হিন্দু রাখিয়া। বড় করিতে চাহিয়াছেন, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াই বিশ্বমানবের অভিমুখীন করিতে চাহিয়াছেন, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন
মহামিলন ক্ষেত্রের পথ গড়িয়া। তুলিবার আশাতেই রাজা ‘ব্রহ্ম-সভার প্রতিষ্ঠা’ করেন। রাজা দেখিলেন, ভারতবর্ধ আপনার বৈচিত্র্যে একটা কৃত্তি বিশেষ মতন। এই ভারতে যাহা নাই জগতেও তাহা নাই বলিলে চলে। এখানে বহু ভাষা, বহু ধর্ম, বহুবিধ সামাজিক রীতিনীতি, বহু আচার পদ্ধতি, বহু সাধনা এবং সভাতা আসিয়া মিলিয়াছে। এই ভারত যদি এক মহাজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহ। হইলে এই সকল বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যকে যথাযথ-ভাবে বজায় রাখিতেই হইবে। ভারতের লোক পুরাতন হইতেই ধর্মপ্রাণ, তাহার ধর্ম ছাড়িয়া যে কখনও একাকীত্বে আধুনিক যুগোপের Secularistদিগের মত নিজেদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক
নবযুগের বাংলা‌

কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, ইহ। সম্ভব নহে। আধুনিক জগতে ভারতবর্ষকে সৃষ্টিতে করিতে হইলে তাহার এই প্রক্রিয়া-সূচনারকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ধর্ম যেখানে সংস্কারবন্ধ হইয়া নিজের প্রাণত হারাইয়াছে, সেখানে তাহাকে সংস্কারমূলক করিয়া সজ্জাভর করিতে হইবে; যেখানে সম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে সেখানে উহাকে উদার হইতে হইবে, কিন্তু ভারতের ধর্ম প্রাণতাকে নষ্ট করা তা দূরের কথা, উপেক্ষা করিয়া একটা ভারতীয় জাতি গঠন করা সম্ভব নহে। আর অন্যদিকে হিন্দুকে মুসলমান কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু অথবা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে খুঁড়িতের দৌড়িত করিয়া এবং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সিদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত সংঘটিত করিয়া ভারতে একটা ধর্মের প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নহে। যে উচ্চতর সাধনার ভূমিতে ভঙ্গ সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষের। সকল ধর্মের সমধিয় প্রত্যাক্ষ করেন সেই ভূমিতেও জনসাধারণকে লইয়া যাওয়া সাধ্যায় নহে। অন্য পক্ষে এ সকল ধর্মের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে তাহার তীব্রতা যদি না হয়, তাহা হইলেও হিন্দু, মুসলমান, হর্ষিয়ান প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবে নির্জন নিজ সমাজের এবং সমস্ত ভারতীয় জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ এবং সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়ে যে বিরোধ আছে তাহ দূর না হইলে ভারতে আধুনিক আদর্শর একটা নূতন জাতির পদ্ধতি কিছুতেই হইতে পারে না। রাজ্য ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এবং ভারতের জাতীয়তার মূল অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশ্যেই, যেন হয়, তিনি তাহার 'ব্যাপ্তিত'লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজ্য ব্যাপ্তিত নামে কোনও নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ব্যাপ্তিত নামে কোনও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন নাই।
Raja Rammohun is one of the Fathers of the great Hindu Church. He is not the founder of a new religion.
নিজেই শীঘ্র করিয়াছেন যে ব্র্হ্মসভায় যে ব্যজন-প্রণালী প্রবন্ধিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে জগৎকর্তাকে কেবল তত্ত্বল লক্ষণের দ্বারাই ধরিবার চেষ্টা হইয়াছে, স্বরূপ লক্ষণের সাক্ষ্যকারের কেন প্রকারের প্রয়াস হয় নাই। স্বরূপ উপাসনা নিষ্ঠীর্ম অধিকারীর জন্য নহে। যাহাদের সমাধির অধিকার জন্মিয়াছে, তাহারাই কেবল স্বরূপ উপাসনা করিতে পারেন। কেবল তত্ত্বল লক্ষণের দ্বারাই যে ভজন হয় তাহাতে সাধকের চিন্তাশুদ্ধি হইতে পারে, ভক্তিবর্গ সাধনায় উন্মেষ সম্প্রদায়, কিন্তু মুক্তিলাভ বা ভক্তিমাগের উচ্চতর শিখরে আরোহণ কখনই সম্ভব হয় না। ব্র্হ্মসভায় আমূলতাতে ব্যাপীত জীবের মুক্তিলাভ হইতেই পারে না, আর এই ব্র্হ্মসভায় আমূলতাতে স্বরূপ উপাসনার অধিকারের কথা। তত্ত্বল লক্ষণের দ্বারা যে উপাসনা হয় তাহাতে এই ব্র্হ্মসভায় আদেশ সম্ভব নহে। ইহাই রাজার সিদ্ধান্ত ছিল। শুরুর্তাং 'ব্র্হ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া তিনি যে একটা উচ্চতর সম্প্রদায় কেন্দ্র গড়িতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা সঞ্জ্ঞ নহে।

ব্র্হ্মসভার মূল লক্ষ্য ছিল—উচ্চতর দর্শনসাধন নহে। কিন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি মঞ্জ্যাদাস্তীল করিয়া ভারতের জাতীয় একতার প্রধান অন্তরায় দূর করাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা জানিতেন যে তাহার এই 'ব্র্হ্মসভাম'তে কখনই জন-সাধারণে আসিয়া যোগদান করিবে না। তিনি জানিতেন হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গাইয়া। কিন্তু পরিমাণে নিজে নিজ সম্প্রদায়ের সন্তান গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন, গাইয়া প্রকৃত জানী এবং যে সম্প্রদায় সাধারণ অলঙ্কার অগ্রসর হইয়াছে, তাহারাই কেবল এই মহামিলন-মন্দিরে আসিয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জানী সাধকেরা যদি এভায় সম্মিলিত হইয়া নিজ
নিজ সিকান্ট ও সাধনার কথা বাক্য করেন তাহ। হইলে এ সকল ধর্মের মধ্যে যে সনাতন ও সার্বজনীন সত্য আছে তাহার সচ্চান পাওয়া যাইবে। এভাবে হিন্দু দেখিবেন যে মুসলমানের মধ্যেও ইহার নিজের শাস্ত্র ও সাধনার অনেক সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানও দেখিবেন যে হিন্দুর সঙ্গে ইহার শাস্ত্র ও সাধনার অনেক দিল আছে। সেইন্তু খুলিয়ান, বোধ প্রকৃতিও অপরাপর ধর্মে ও সাধনে নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠতম অভাস পাইয়া সে সকল ধর্মের প্রতি মর্যাদাভূক্ত হইয়া উঠিতেন। ধর্মে ধর্মে যে ভেদ-বিরোধ তাহা বইরঙ্গের, আচার-বিচারের, সাধনের অতি নিম্প্রেক্ষ। ধর্মে-বিদ্বেষ ও অভ্যেস প্রতি লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং সাধনের কথা মাঝে মাঝে সোপানে আরোপ করেন তখন এ সকল সাধন এবং বিরোধ ইহার দৃষ্টি হইতে আপনি ঝরিয়া পড়ে। হিন্দু মুসলমান চিন্তাভাবনা ধর্মের চিন্তাভাবনা এবং উৎসাহ সাধকের। পরস্পরের সঙ্গে মিলিতা হইয়া যাহাতে একে অপেক্ষা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের ও কল্যাণের সচ্চান পাইতে পারেন এবং এই সচ্চান পাইয়া একে অপেক্ষার ধর্মের ও ইহাই রাজ্য 'ব্রাহ্মণবাস' প্রতিষ্ঠার নিগৃহু উদ্দেশ্য বলিয়াই মনে হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য কোনও সমীচীন ব্যাখ্যা হয় না। আর এক্ষেত্রে এই রাজ্যসম্পত্তি যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের চিন্তাভাবনা এবং সাধকগণের একটা মিলনকের প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই সকল ধর্মের জন-সাধারণের মধ্যে একে অপেক্ষার প্রতি একটা শক্তি জন্মিত। এইরূপে ভারতের জন-সমূহের ধর্ম ও আচারগত ভেদ ও বিরোধের অক্ষায়কে ক্রমে ৬।
ক্ষেত্রে দূর করিয়া, এ সকল ভেদের ভিতর দিয়াই ভারতবর্ধে একটা বিরাট জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠা করিবার আশাতেই মনে হয় রাজা রামমোহন রায়ের ‘বঙ্গ-সভার’ প্রতিষ্ঠা করেন।

এইরূপে রাজা ভারতের নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার এই নবযুগে আমরা যে পূর্বতন মনুম্য সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি এবং যে মনুম্য লাভের জন্য আমরা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পন নানা দিক দিয়া নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা রামমোহনের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই জন্যই ভারতে বাংলার এই নবযুগের যুগ-প্রবর্তক বলিয়া অভিবাদন করি।
জুনীয় কথা
ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফল—মুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগতত্ব

(১)

রাজা রামমোহন বাঙালি এই নব-যুগের প্রবক্তক হইলেও তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা অনন্তর হইতে অনেকদিন লাগে। এমন কি তাহার এক্ষণেই পর্দায় লোক পাইতে বসিয়াছিল। বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বসু মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার কতকগুলি উদ্দার হইয়াছে বেটে; কিন্তু রাজার সকল পুন্তক পাওয়া গিয়াছে বলিতে মনে হয় না। রাজার আদর্শই বহুদিন পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর। ধরিতে পারেন নাই। এখনও পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রাজা সমসাময়িক সমাজের জড়তা নক করিবার জন্য একটা বিরোধের প্রত্য করেন ইহা সত্য। এরূপ বিরোধের ভিতর দিয়াই লোক-চিন্তা ও লোক-চিন্তাকে অমন-প্রধান অবস্থা হইতে রঞ্জপ্রধান অবস্থায় ঠিলিয়া তুলিতে হয়। যাহা বর্তমান তাহাকেই সনাতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া, ইহা তামসিকতার একটা প্রধান লক্ষণ। তামসিক অবস্থায় ধর্ম ও কর্ম কিছুই লোকের অনুভবে বা জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। এই তাম-সিকতাকে দূর করিবার জন্যই রাজা দেশের ধর্মকর্মকে লোকের অনুভবের উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আর এটি করিতে যাইতে তিনি অনুভব-প্রতিষ্ঠা যে বেদান্ত-বিদ্যা তাহার সঙ্গে প্রচলিত গতানুগতিক ধর্ম-কর্মের বিরোধে দেখাইয়া সমাজে একটা সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। এই সংগ্রামে রাজা দুইটি অস্ত্র ব্যবহার করিয়া-
ছিলেন, এক শাস্ত্র, অপর যুক্তি; কিন্তু যুক্তি ছাড়িয়া শাস্ত্র, কিন্তু শাস্ত্র ছাড়িয়া যুক্তি অবলম্বন করেন নাই। ঈহার ফলে রাজা যে আদর্শটি প্রচার করেন, তাহাতে দেশে কেবল বিরোধ আগতেই চাহে নাই, কিন্তু বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিরোধকে নিশ্চেষ্ট নিরস্ত করিয়া। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম উভয়কেই একটি উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইয়া উভয়ের মধ্যে একটি সমায়া সময় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দেশের জন-সাধারণেরত কথাই নাই, যাহারা জ্ঞান-ভাঙারের দায়াধিকারের দাবী করিয়া। দেশের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহারা পর্যায় রাজার এই আদর্শটিকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিলেন না। ধরিবার তখন সময়ও আসে নাই। রাজা আপনার অসাধারণ মনীষা প্রভাবে অন্ধকার ভিত্তিতের জটিল সম্ভাব্য প্রত্যক্ষ করিয়া। আগে হইতেই তাহার মীমাংসার পথ দেখাইয়া গিয়া-ছিলেন। সে ভিত্তিতে চুক্তিত দেশের লোকের ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত যতদিন পর্যন্ত সে সকল সমস্তা জীবনের ও প্রত্যক্ষ হইয়া না। উঠিখাছে, ততদিন পর্যন্ত তাহার মীমাংসার পথও লোকে খুঁজিতে যায় নাই। ঈহা কিছু আশ্চর্যের কথা নহে।

(২)

রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি এযুগে সত্যভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে নিজেদের সনস্তন সভ্যতা ও সাধনা লইয়া আধুনিক সভ্য সমাজের মাঝখানে যাইয়া মাথা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে; আর কুপমঞ্চুক হইয়া ধাকিলে চলিবে না। ভারতবর্ষ যখন বড় ছিল, তখনও সে কুপমঞ্চুক ছিল না। বিশেষ সঙ্গে তাহার তখন জীবন স্বষ্ট ছিল। অন্যান্য জাতিকে তখন সে আপনার যাহ। ভাল তাহা দিয়াছে; আর অপর জাতির
নিকট হইতেও যাহা তাহাদের ভাল এবং নিজের প্রায়োজনীয়
নিঃসন্দেহে তাহা লইয়াছে। বিশেষের জীবন-ধারা ও জ্ঞান-ধারা হইতে
তখন ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। যেদিন হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া
পড়িল, সেদিন হইতে ভারতের সভ্যতা এবং সাধন। সক্রান্ত হাতে
আবশ্যক হইয়া। আপনার শক্তি ও সত্য হারাইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের যদি বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে সকলের আগে
তাহাকে এই বন্ধ কূপ হইতে বাহির করা আবশ্বক। এই কারণেই
রাজা ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য এতটা আগ্রহাধিক হইয়া-
ছিলেন। রাজা দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ইচ্ছা। করিলেও আর
তৃতীয়ে নিজের দৃষ্টির বাহিরে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। যেদিন
ইংরাজ মোগলের হস্তাক্ষা রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে,
সেদিন হইতেই ভারতীয় সভ্যতা এবং সাধনার মধ্যের বংশ্যজালের
বাধ ভঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক,
ভারতবর্ষের এখন আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার মূল্যের মাঝখানে
বাইয়া। পড়িতেই হইবে। এই বাচানার মুখে ভারতের সর্বোচ্চ
যাহাতে ন। ভাসিয়া যায়, সর্বাঙ্গে তাহাই দেখিতে হইবে। জলপাড়া
বা ধূলাপাড়া দিয়া এই বাচাকে আটকাইয়া: রাখা সম্ভব হইবে না।
যে শক্তি ইহাকে ঠিলিয়া তুলিয়াছে, সেই শক্তিকে হস্তাক্ষরকৎ
আপনার আয়তনাধীন করিতে হইবে। যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিকে
ঠিলিয়া রাখা যায় না। ঐতিহ্যর ধারা যুক্তিকে কখনই কেহ ঠেকাইয়া
রাখিতে পারে না। মন্ত্রের একটা স্থান ও অধিকার ধারিতে পারে।
সে স্থান মায়ুরের মনে। সে অধিকার নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে
আধুনিক মনোবিজ্ঞান। যদিও একটা স্থান এবং অধিকার আছে।
তাহা বাছিরে—মনের ভিতরে নহে। সে স্থান ও অধিকার নির্দেশ করুক জ্ঞান-বিজ্ঞান। মনোরীতির ধারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৃত্রিম হইবে।
না। জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা মনো-বিজ্ঞানের কাজ হইতে পারে না। ইহার যখন পরপরের সত্য অধিকারটী ব্য্বকার করিয়া লয়, তখনই উভয়ের মধ্যে সম্পত্তি ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সংশোধন হয়। এটি ব্য্বকার বা করিয়া। মনো যদি যত্নে উত্তম দিতে যায়, পরিণামে সে আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া। যত্নেই বাড়াইয়া। তুলে, নষ্ট করিতে পারে না। সেইরূপ সত্যি দ্বারা যুক্তির কিছুতেই ঠেকাইয়া। রাখা যায় না। সত্যি বা শায়র যদি যুক্তির অধিকার অস্বীকার করিয়া। তাহাকে পিষিয়া। মারিতে বা চাপিয়া। রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার ফলে শায়রে মূল্যের দাশুমূল্য হইয়া পরিণামে যুক্তির হাতে মারা পড়ে। হুতনিষ্ঠার ইতিহাস বারে বারে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে। রাজা এ সকল প্রভাব করিয়াই ভারতের মধ্যায়ের মতসমূহ ও শায়রব্য সাধনী ও শিক্ষাকে নিজের প্রাকৃতিক দুর্বললতা দেখাইয়া। আধুনিক যুগের যত্রিকের এবং যুক্তিরপ্রাপ্ত সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে একটা সমৃদ্ধ সময়ের পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু তখনও যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবটি দেশের লোকে প্রভাব করিতে আরম্ভ করে নাই। সে শক্তি তাহাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখনও তাহার। তাহার দুর্বলতা উপলব্ধি করে নাই। শ্রুতরাগ তাহার সঙ্গে যে একটা সদ্যি করা অবশ্যই, ইহাও লোকে বুঝিল না। বুঝিল। বলিয়াই তাহার। রাজার সম্বন্ধে নতুন প্রতি শ্রুতরাগে হইয়া। তাহার পথ ধরিবার জন্য অত্র্যযুক্ত। হইল না। বিশ্বাস তখনও পাকিয়। উঠে নাই বলিয়াই দুর্বৃত্তিহীন সমাজ রাজার শিক্ষা-দীক্ষাকে উপেক্ষা। করিয়া। চলিয়া লাগিল। কিন্তু রাজা। যাহ। সমুদ্রে না। দেখিয়াও ত অস্বীকার। ইহ। বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা-প্রভাবে তাহ। তখন উঞ্জত হইয়া। চন্দনগোচর হইল, তখন লোকে রাজাকে একুশুপ বুঝিয়াই গিয়াছিল। শ্রুতরাগ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরা অদেশকে
টুলিয়া একবারেই নতুন বিদেশী শিক্ষা ও সাধনার হাতে আস্থা-সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

(৩)

ইংরাজ বণিক-কোম্পানী এদেশের টাকা লুটিয়েই আসিয়াছিল, রাজ্য-শাসনের দুর্বল ভার গ্রহণ করিতে আসে নাই। যখন বিভিন্ন মোগলের মাধ্যমে মুক্তির খবর পড়িল এবং ইংরাজ তাহা হাতের নিকটে পাইয়া মাধ্যমে তুলিয়া লাইল, তখনও তাহার বণিক-বৃত্তি নষ্ট হয় নাই।

প্রাজ কলামের জন্য কি করা প্রয়োজন এ প্রথম তাহার মনে জাগে নাই। তবে "চাচা আপন বাংলা"—আজি পর্যন্ত ইহাই রাষ্ট্রীয় সাবেক মূলসূত্র হইয়া রহিয়াছে। ভারতে ইংরাজ বণিকের রাজ্যে এই সুত্র অবলম্বনেই চালিতে লাগিল। তখনও তাহার রাজ্যসভায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। এই বিশাল জনসমূহের মাঝে কি করিয়া সে আপনার পদ ও প্রাণ বাংলা চেম্বে, এ ভাবনা তাহার অন্তরে দিবানিশি জাগিরা ছিল।

রাজবিদ্রোহের বিভীষিকা তাহাকে সতত সতত রাখিত। অতএব কি জানি প্রাজ অসম্ভব হইয়া উঠে, এই ভয়ে ইংরাজ প্রথমে কিছু তেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে চাহে নাই।

পাপ্রী করী যখন কলিকাতায় আসিয়া দর্শনের ভূমি বাহালী বালকদিগের জন্য একটা ইংরাজী স্কুল খোলেন, তখন ইংরাজ গভর্নমেন্ট তাহাকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। ফলে করীকে অল্পদিনের মধ্যেই এ অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরে যখন ইংরাজী শিক্ষা ও হুকুম-দর্শন প্রচারের জন্য করী এবং মার্শ্চল এদেশে একটা কলেজ খুলিতে চাহেন তখনও ইংরাজ বণিক-রাজ্যের রাজ্যে ইহার স্থান হইল না।

কলিকাতার নিকটে শ্রীকালপুরে দিনেমার রাজ্য জাগাতে বাইয়া
তাহাদের আশ্রয় লুইতে হয়। শ্রীরামপুরের কলেজের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য ইংরাজ গভর্মেন্ট আদিতে কোনও চেষ্টা করেন নাই, বরং নানাদিকে বাধা দিতে চাহিয়াছিলেন #। তাহারা হিন্দুদের শিক্ষা জন্য সংক্ষিপ্ত কলেজ এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ও ফার্সী মাধ্যমে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বখন কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়া বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় তখনও গভর্মেন্ট সাফাতে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। দেশের লোকেরাই কোনও কোনও সদাশিষ্ঠ ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া। এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বহুদিন পরেও সকার এদেশের পুরাতন শিক্ষার প্রাণালী আমুসারে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে ব্রতী হইবেন, এ প্রদেশের মীমাংসা হয় নাই। ইংরাজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ে দুইটা মত প্রবল হইয়া উঠে। একদল বলেন, হিন্দু ও মুসলমানকে তাহাদের নিজেদের বিষ্যাই শিক্ষা দেওয়া হউক। ইউ-রোপের নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানী করিতে গেলে ইহাদের পুরাতন সংস্কারে আয়ত লাগিয়া। দেশে ঘোরতর অশান্তির সূত্রপাত হইতে পারে; স্বতরাং সে পথ নিরাপদ নহে। আর একদল কহেন যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সাধনা প্রচার করাই কর্তব্য। সে শিক্ষা ও সাধনা ব্যতীত দেশীয় লোকের জ্ঞান উন্নত ও চিন্তা উদার হইতে পারে না। আর আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া। এদেশের লোক যদি ক্রমে আমাদের অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেই চাহে, তাহাতেই

* ১৮১৪ সালে কাশীরাম ঘোষাল নামক একজন সপ্তাহ হিন্দু ভ্রাত্রোক্কলে লজায় শিক্ষার্থী সোহাইটার হস্তে ইংরাজী শিক্ষাদিত্তার জন্য বিশেষতঃ সহযোগী মায়ার দিয়া যান। গর্ভায় শিক্ষাদান বিষয়ে উদাসীন দেশিদেহাই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন। বর্তমান শিক্ষার পাঠ্য প্রণালী প্রতি। "রামত্ব নাসাই ও তৎকালীন বল সমাজ" পৃঃ২৪৫।
ইংরাজি শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগতত্ব ৪৯
বা কি আসিয়া যাইবে? আমরা একটি প্রাচীন সভ্য জাতিকে অসহায় ও পরিত্যাগ করবো যদি হাত ধরিয়া তুলিয়া। পুনরায় স্পষ্টত্ব ও স্বাধীনতা করিয়া দিয়া পারি, ঐ অপেক্ষা আমাদের গৌরবের কথা অর কি হইতে পারে? লড়াই মেকলে এই শেষের দলের নেতা ছিলেন। পূর্বদিকে Orientalists কহিত।
শেষের দলের Anglicists নামকরণ হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া এই দুই দলের মধ্যে এদেশের শিক্ষানীতি লইয়া বিরোধ চলে।
পরিশেষে ১৮৩৩ ইংরাজীতে মেকলের দল বা Anglicistsরাই অযত্ন করেন। তখন হইতে ইংরাজ বণিক-সরকার সরকারী ধরনের সরকারের তত্ত্বাবধানে ইংরাজী যুক্তি ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন তখন বিলাতে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লড়াই আহ্বান করিয়া যে নূতন শিক্ষানীতি সমর্থন করিয়া। পত্র লিখিয়াছিলেন, নয় বৎসর বাঙালিদের পরে সেই নীতিই গৃহীত হইল।

রাজা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, ইহার পূর্বেই কিন্তু তাহার অন্যুরোধগত হইতে আরস্ত করিয়াছিল। বণিকরাজ সরকারের এই প্রতি গ্রহণ করিবার পূর্বেই কলিকাতায় দেশ-নায়কের। হিন্দু কলেজের প্রতি ঘাট দ্বারা নিজেদের সমানভাগ শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই কলিকাতা সমাজে এই নূতন শিক্ষার ফলে একটি প্রবল ধরম ও সমাজ বিভক্ত বান ধাক্কা ছিল। রাজা রামমোহন প্রাচীন বৈদেশিক প্রাচীন প্রচার করিয়া প্রচলিত, সংস্কারের সঙ্গে যে বিরোধ জগাইতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা যুগাপনের জন্য-বিভক্তনের প্রভাবে সে বিরোধিতা সমর্পিত অর এক দিক দিয়া পাকিয়া উঠিতে লাগিল।

বিরোধিতা পাকিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যে
নবযুগের বাংলা

সময়ের পথটি দেখাইয়াছিলেন, তাহার সদ্ভাব লোকে পাইল না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম চেষ্টা শিক্ষিত বাঙালীকে একবারেই স্বদেশের সভান্ত্র ও সাধনার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া আধুনিক যুরোপীয় সভান্ত্র ও সাধনার দিকে প্রবল বেগে ঠেলিয়া দিল। আর ইহার মূল কারণ ছিল—এই নূতন শিক্ষা ও সাধনার অতিশয় বলবতী স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণ। ইহাই বাঙালীর অন্তর্নিহিত চিরকাল কিন্তু অধুনা বিশ্বৰূপী স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে জাগাইয়া কস্তুরী-মুগকে যেমন নিজের নাভিকে মাতাইয়া চারিদিকে ছুটাইয়া থাকে বাঙালীকেও সেইরূপ নিজের আদর্শের গঙ্গেই যুরোপের দিকে ছুটাইয়া দিল।

মেঘলার কথার অমর্যাদা না করিয়াও ইংরাজ বণিক-কোম্পানী যে পতিত ভারতবর্ষের উদ্দার কর্মে এর্দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারিত করিয়াছিল, এ কথা একবারে বিশ্বাস নাও করা যাইতে পারে। কারণ এই শিক্ষা প্রচারিত না করিলে ইংরাজের পক্ষে এই বিশাল দেশকে এত সহজে শাসন করা কখনই সম্ভব হইত না। ইংরাজ যতদিন কেবল ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া যায় ছিল, ততদিন এই প্রয়োজনের উপস্থিত হয় নাই। মেঘলার রাজদণ্ড নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াও কিছুকাল ধরিয়া ইংরাজ বণিক কোম্পানী রাজকাৰ্য্য অপেক্ষা নিজের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে বিলাতের সাধারণ ইংরাজ-সামাজের চক্ষু ভারতবর্ষের উপরে পড়িতে আরম্ভ করে। শিক্ষিত ইংরাজ তখন ভারতবর্ষের শ্রোতীসের জয় বলি-বিস্তর বাণ্ড হইয়া উঠেন। পারিয়ামেন্টে লাটে হেডিংস অসহায় ভারতবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া
ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল—মুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগতত্ত্ব

অভিষেকে অভিযুক্ত হইলে ভারত শাসন সর্বজ্ঞ ইংরাজ শাসক সমাজ
নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তখন
হইতে কেবল বাবসা বাংলা নহে, কিন্তু শৃঙ্খলাগুলি এদেশের নূতন
ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠে। সকল ইংরাজই
ভারতবর্ষের ঠাকুর লুটিতে চাহে নাই। অনেক ইংরাজ সরলভাবেই
ভারতবর্ষে নিজস্ব সভ্যতা ও সাধন। বিতারণের জন্য বাংলা হইয়া-
ছিলেন। ইংরাজ সদরের আইন কান্নুন অস্মাতীর বাহাতে ভারতীয়
শাসনকার্য পরিচালিত হয়, ইহা চাহিয়াছিলেন। ইহাই ক্রমে
ভারত শাসনের আদর্শ হইয়া উঠে। এই আদর্শে রাজ্য শাসন করিতে
হইলে দেশীয় রাজকোষ চারিদিগকে উচ্চ ইংরাজী শিখ। দেওয়া
অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। স্তূতরঞ্জ পতিত ভারতের উদার করেই
যে ইংরাজ এদেশে শাসন করিতে অগ্রসর হয়, একথা অংশিক সত্য
হইলেও যেল আনা সত্য নাও হইতে পারে।

ভারতের আরও কথা আছে। দূরদূর ইংরাজ মনোজ্বল। ইহা
নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন যে কেবল ভয় দেখাইয়া এই বিপুল জনসমূহকে
বহুদিন নিজস্ব শাসনাৰ্থীর রাখা সত্য হইবে না। লাঘিয়ার জোরে
মাট জয় হইয়াছে তবে, এখন যদি নিজস্ব আন্তঃবিজ্ঞানের বলে
এদেশের লোকের চিন্তকে জয় না করিতে পারা যায়, তাহাতে
ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রবৃত্তি কিছুতেই বেশীদিন তিয়ততে পারিবে না।
লোকের লোকে তখন ইংরাজকে স্বৈচ্ছিক মনে করিয়া অত্যন্ত সুখ করিত।
ইহাতে কোম্পানীর আফিসে বা আদালতে কিশোর ইংরাজ
সুদায়াগর্দির দগ্ধের কার্য করিতে জীবিকা উপার্জন করিত তাহাতে
পর্যন্ত সন্ধান করিয়া আফিসের পোষাকগুলি গঙ্গাজলে অবগাহন
করিয়া বাড়ীতে চুকিত। যে প্রজার রাজ্যকে এরূপ
'অপুষ্পী' মনে করে তাহাতে কখনই বেশীদিন তাহার শাসন মানিয়া।
চলিতে পারে না। এ অবস্থায় এদেশে যতদিন না বজ্রসমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা ও সাধারণ বিদ্যার ফলে এমন একদল লোকের স্থিতি হইবে যাহারা দেশের নুতন রাজপুরুষদিগের রীতি-নৈতি ধর্ষন-কর্ষন, সভ্যতা ও সাধনাকে এগাছতর বলিয়া বরণ করিয়া লইবে ততদিন এই বিদেশীয় শাসন কিছুতেই বক্ষাগুলি হইতে পারিবেন।।
এই দিকের বিচার করিয়াও এদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ইংরাজের রক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মেকেলে প্রভূতি নীতিকের একাধারে যে ভাল করিয়া রুখ্তান নাই, এরূপ কলন। করাও করিতে। বিশেষতঃ ইহাদের প্রতিপক্ষীয়রা, যখন রাজ্যার্কর জন্যই এদেশের লোককে ইংরাজী না শিখাইয়া প্রাচীন সংস্কৃত, ফার্সি এবং আরবী শিখাইতে চাহিয়াছিলেন তখন এই দিক দিয়া যে কথাটাও বিচার হয় নাই, এরূপ অমুকানও করা যায় না। সত্তরাং কেবল আমাদের উদারকর্ত্রেই নহে, কিন্তু নিজেদের রাজ্যে শাসন সংস্কৃতের সুবিধ। করিবার জন্যও এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

তবে মেকেলে প্রভূতি যে যুগের লোক ছিলেন সে যুগটাই যুরোপে
এক অভিনব স্বাধীনতা এবং মানবতার প্ররোচনায় মাত্রিয়া উঠিয়াছিল।
যে আদর্শের ইংরাজ ফরাসি বিপ্লবের স্থিতি হয়, সেই আদর্শ
তখন যুরোপের মানুষের সমাজের মধ্যে সর্বত্র ছড়াইয়া। পড়িয়াছিল।
শিক্ষিত ইংরাজেরাও তখন ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রে, স্বাধীনতা
এবং বিশ্বাসনবতার বা Humanityর আমাদের অনেকটা চর্চা হইয়া
উঠিয়াছিল। এদেশে যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ তখন আসিয়া';
ছিলেন তাহার অনেকেই এই আদর্শের ধারায় স্বল্পবিস্তর অভিভূত
ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল—মুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদতত্ত্ব  

হইয়াছিলেন। ন্যায্যতা মেকেলে যে সরলভাবেই ভারতবর্ষের উদ্দার- 
করে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিয়ে চাহিয়াছিলেন, একথাও 
অধিকাংশ সময়ই মানুষ 
কেবল একটা লক্ষ্য ধরিয়াই কাজ করে না। নানা ভাবের প্রেরণা 
মানুষকে কর্মে প্রণেতিত করে। স্বার্থ ও পরামর্শ অনেক সময়ে 
উভয়ে এমন জড়াজড়ি করিয়া থাকে যে কোথায় স্বার্থ আর কোথায় 
পরামর্শ ইহা নির্ধারণ করা সহজ হয় না, সম্ভবই হয় কিনা সন্দেহ। 
এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। নিজেদের স্বার্থ সাধন এবং আমাদের 
কল্যাণ বিধান, এই দুই উদ্দেশ্যই ইংরাজ এদেশে যুরোপের জ্ঞান-
বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 

জাতীযুক্তিপথের অভিপ্রায় যাহাই হউক না কেন, এদেশে 
প্রথমে যাহারা ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তাহার। সকলেই 
ফরাসি-বিশ্ববের আদর্শের দ্বারা অত্যন্ত অভিপ্রুত হইয়াছিলেন। সাময়ি 
কৌশল, মৈত্রী, স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, ইহাদের জীবনের মূলপত্তি ছিল। 
হিন্দু কলেজের অধ্যায় প্রথায় শিক্ষক ছিলেন—ডিরোজিও। 
ডিরোজিও ফরাসি বিশ্ববের সাহায্য ও মানবতার ভাবে ভরপূর 
ছিলেন। যে মুক্তিবাদ ও ব্যক্তিবাদতত্ত্ব—ইংরাজীতে যাহাকে 
Rationalism এবং Individualism কহে, ফরাসি বিশ্ববের মূল 
ভিত্তি ছিল, তাহারই উপরে ডিরোজিওর মানস-জীবন এবং চরিত 
গড়িয়া উঠিয়াছিল। মদ খাইয়া যেমন মানুষ মাতাল হয়, ডিরোজিও 
সেইরূপ দিবানি এ সকল ভাবের ঘোরে যেন মাতোয়ার। হইয়া 
থাকিতেন। তাহারা হিন্দু কলেজে তাহার নিকটে লেখাপড়া শিখিতে 
গেলেন, তাহারা অল্পকালের মধ্যেই ডিরোজিওর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা 
এবং উদার মানবতার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। এই 
মুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-যাত্রা তাহাদের জীবনের মূলস্থা হইয়া। উঠিল।
এই নূতন আদর্শের প্রেরণায় ইংরেজি প্রচলিত ধর্মের এবং সমাজের সকল বন্ধনকে ভাঙিয়ে আরাম করিলেন। এইরূপে বাংলায় ইংরাজী-বাঙালির প্রথম দলের মধ্যে একটি তীব্র ধর্মীয় বিপুল এবং সমাজতন্ত্রী জাগির উঠিল।

৬

ডিওজিও জাতিতে পূর্ব-পুত্র ছিলেন। তাহার কোনও পূর্ব-পুত্র এদেশে আসিয়া এখানেই কোনও বাঙালি মহিলাকে বিবাহ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ডিওজিও কলিকাতার ইটালি পৃথিবীর নিকট এক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ পিতা একজন স্বতান্ত্র লোক ছিলেন। ডিওজিও কলিকাতাতে ধর্মীয় ভ্রমণ করেন। ড্রামালং ইংরাজী সাহিত্যে এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপ্রভাবিত ছিলেন। স্বর্গীয় পালিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে এরূপ শুনা যায় যে ধর্ম বিধিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে ড্রামালং চিঠিরের মত তাহার জন্মভূমি খুঁটিয়া পরিভাষা করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন।

যে স্বাধীন-চিন্তার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের অভাবন, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্বাপর্যে তাহার অন্তরে কার্য্য করিয়াছিল।

ড্রামালংর প্রতিভার সম্পর্কে পাইয়া। ডিওজিওর প্রতিভা যুটিং উঠিল। ডিওজিও কবি এবং দার্শনিক হইয়া উঠিলেন। ডিওজিও ইংরাজী ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া। ইংরাজী এবং নীতিবিদ্যা বা Moral Philosophy পড়াইতে আরম্ভ করেন।

সে সময়ে যুরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজী দার্শনিক চিন্তায় ডেভিড হিউনের খুব প্রভাব ছিল। হিউনের দর্শন অতিবাহিত হয় এবং তত্ত্বকে অর্থ বলিয়। অগ্রাহ করিয়াছিল। হিউনই ইংরাজী আধুনিক
The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects, the sentiments of Hume were widely diffused and warmly
The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state; and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people.”—( রামন্ত লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ —পং ১১০ )

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কহেন যে,—“সকলের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক বালক ইহো অপেক্ষা অনেক অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহার রাজপথে যাইবার সময় মুখ্যত মন্ত্র, ফোঁটাধারী বাঙ্গল পণ্ডিত দেবিলই তাহাদিগকে বিরক্তি করিবার জন্ত।”“আমরা গরু খাইগো,“ “আমরা গরু খাইগো,“ বলিয়া চাইকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপরে উঠিয়া প্রতিবেশীগণকে ডাকিয়া বলিত,—এই দেখি, মুসলমানের জল মুখে দিতেছি—এইবলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টাকা মুখে দিয়া।”

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকে এবং শ্রীযুত রাজনারায়ণ বন্দুক প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকে এবং শ্রীযুত রাজনারায়ণ বন্দুক
ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও বাক্সিগাত্রা

মহাশয়ের ‘একাল ও সেকাল’ গ্রন্থে এই ধর্মদৃষ্টিতে এবং সমাজ-
দৃষ্টিতার বজ্র বিবর্ণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার
প্রভাবে বাংলায় ইংরাজীনাবাশের। প্রাচীনকালে ভাঙ্গিয়া চুরিযায় যুক্তি
রঢ়ে নিঃশেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া। তুলিবার জগত কতটা
ব্যাপুল হইয়া, উঠিয়াছিলেন, এই দ্বাধি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ পাওয়া
যায়।

(৭)

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদার বা Rationalismএর
উপরেই আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীনাবাশিকায় এই সমাজ-গু-
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহিয়াছি। এই যুক্তিবাদের
অপূর্বতা তখনও ভাল করিয়া। যুরোপীয় চিন্তাতেই ফুটিয়া। উঠে নাই।
আমাদের নবাধিক্ষিত ইংরাজীনাবাশের। যে এই অপৃবতা ধরিতে পারেন
নাই, তা কিছুই আশাচুরের কথা নহে। এই যুক্তিবাদ ইস্তিমাও
প্রত্যাক্ষকেই সত্যের বা বস্তুর একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে।
তখনও এই ইস্তিমাও জ্ঞানের নিরপেক্ষ, বিশ্লেষণ হয় নাই। যে পথে
ভুগুবারুণ সংবাদ বরণ-পুত্ত ভুগ অন্ত-ব্যক্তি সিদ্ধান্ত হইতে মনোনিবেশ
এবং মনোনিবেশ সিদ্ধান্ত হইতে বিজ্ঞাননিবেশ যাইত। পৌছিয়াছিলেন,
সে পথের সঙ্কার আমাদের ইংরাজীনাবাশের। জনিতেন না। যুরোপীয়
দার্শনিক চিন্তাতে হিউমের পরে বারকল, বারকলের পরে কাউল, এবং
কাউলের পরে হেগল, ও হেগলের পরে হাবেরট স্পেনসর অষ্টাদেশ
শতাব্দীর যুক্তিবাদের অপূর্বতা দেখিয়। তাহার সংশোধনের চেষ্টা
করিয়াছেন। সেই চিন্তাধারাও যুরোপীয় তখন ফুটিয়া উঠে নাই, এদেশে
আসিয়া পৌছিয়ে কিরূপে। অষ্টাদেশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যুক্তিবাদের
মূল ভিত্তি প্রত্যাক্ষ। আমাদের প্রাচীনেরাও এই সকল যুক্তিবাদীর
মতন প্রত্যেককেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে
তাহারা মানুষের অভিজ্ঞতার সমক্ষে এই শব্দপর্যালোভনক্ষয়
ইন্দ্রিয় রাজ্য বা বিষয় রাজ্য ছাড়াও আর একটা বিশাল অতিপ্রাক্ত রাজ্য বা অধ্যাত্ম রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়প্রাক্ত এই
বাহিরের বিষয়গতে বস্তুর বা সত্তার প্রমাণ। আবার ঐ বিষয়-
রাজ্যের অভিপ্রেত, ঐ অধ্যাত্ম ইহার অংশই একাকী অবিচ্ছিন্নভাবে অধ্যাত
প্রক্ষলে জড়ে জড়িত করিয়া যে অতিপ্রাক্ত রাজ্য আছে, সে রজ্য
বস্তুর বা সত্তার প্রমাণ ইন্দ্রিয়-প্রাক্তকে নেহ, কতকটা অনুমান বা
উপমাণ—ইংরাজী ভাষায় পরিভাষায় যাহাকে Induction কহিতে
পারা যায়। কিন্তু ঐ Induction বস্তুর অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা মাত্রই
প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার অকাল প্রমাণ দান করিতে পারে না। সে
প্রমাণ দেয় অতিপ্রাক্ত কিন্তু আমাদের প্রাচীন বেদান্তের
পরিভাষায় অপরাক্ত অনুভূতি। আমাদের প্রাচীনরাও বিশ্বাস
করিতেন যে বহির্ভিন্নের দ্বারা যেমন বহির্ভিন্নের প্রত্যক্ষ হয়,
সেইরূপই সকল-ইন্দ্রিয়-চেষ্টা নিরোধ করিতে পারিলে আত্মা সমাধি
নামক অবস্থা লাভ করে। আর সেই সমাধির অবস্থাতে যোগী বা
সাধক অতিপ্রাক্ত সত্তার অপরাক্ত অনুভূতি লাভ করিতে পারেন।
সেই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান রচে। আমাদের প্রাচীন প্রমাণ-শাস্ত্রে
শব্দ-প্রমাণের যে উল্লেখ আছে 'তাহা এই অতিপ্রাক্ত প্রত্যক্ষ বা
অপরাক্ত অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অপরূপতা
অনুভব করিয়া, ইন্দ্রিয়ের প্রমাণের দ্বারা মানুষের সকল অভিজ্ঞতার
মৌমাসা হয় না দেখিয়া, Intuition বা আত্মাপ্রত্যয়ের আশ্রয়
লইয়াছিল। এই Intuition বা আত্মপ্রত্যয়বাদেই অনুমান
শতাব্দীর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদের সাংঘাতিক
The conduct of the students out of the college was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of truth. Indeed, the college boy was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which those that remember the time must acknowledge, that ‘such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy.’
(অর্থাৎ, কলেজের ছাত্রদের বাসবাসের সাথে প্রশংসার বিষয় ছিল। তাহারা সহজলভ্য ছিল। এমন কি কলেজের ছাত্র বলিতে সহজলভ্য যুবকই বুঝিত। কলেজের ছাত্র, সংতরাং সে মিথ্যা বলিতে পারে না, ইহা একটা প্রবাদের মত লাভায়া গিয়াছিল।)

আর একটি প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিশাল হরাইয়াও সকল ধর্ম-বিশাল হরাইয়ান না। ইহাদের প্রকৃতির মধ্যেই একটা বলবত্তা অস্তিত্বৰুপক্ষ বিহিত ছিল। যুক্তি যাহাই বলুক না কেন, ইহাদের মন ধীর নাই, আত্মা নাই, পরলোক নাই, ধর্ম নাই, এসকল কথা কিছুতেই বেদবাকারণে মানিয়া লইতে পারিত না। ইহাদের প্রকৃতির মধ্যেই এই অস্তিত্বৰুপক্ষ বাহিরের বক্তব্যের কাটিতে না পারিলেও ঠাকরে রাখিত। ইহারা হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে খবর হইয়াও, প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচার হইত পারিলেন না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধর্মের পরিতায় করিয়া খৃষ্টধর্মের গ্রহণ করিয়া লাগিলেন। যাহারা প্রকল্পভাবে খৃষ্টধর্মের দীঘিতে গ্রহণ করিলেন তাহাদের সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু অনেকেই অন্তরে অন্তরে খৃষ্ট-ধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়া লাগিলেন। হিন্দুধর্ম এবং খৃষ্টধর্মের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা এই যে খৃষ্টধর্ম হিন্দুধর্মের মতন কঠোর আচারবৎ নহে। রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে কিছু কিছু আচারবর্তা দেখা যায় না, কাথলিক সম্পর্কে হিন্দুধর্মের মতন ব্রহ্ম উপবাসাদিকে বিধান আছে। প্রাণেটের খৃষ্টানদিগের মধ্যে এগুলি নাই বলিলেই চলে। আমাদের ইংরাজীবানেরা খৃষ্টধর্মের প্রাণেটের শাখার কথায় কিছু পরিচয় লাভ করেন। কাথলিক শাখার সংখ্যা ইহাদের যথাযথ পরিচয় হয় নাই। আর হইলেও কাথলিক সাধনে প্রাণেটের সাধনের মত যুক্তির এবং বাস্তবাসায়তনের স্থান নাই। এ বিষয়ে কাথলিক সমাজ কতকটাই আমাদের তদানীন্তন।
ইংরাজী শিক্ষার প্রথম ফল—যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগততাবলী ৬১
হিন্দু সমাজের মতনই ছিল। যুক্তি এবং ব্যক্তিগততাবলীর নামে প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে পরিতাগ করিয়া কারণীতিক ধর্মীয় ধর্মের শাসন গ্রহণ করা সত্ত্বা ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ যুক্তির এবং বহুল পরিমাণে ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার বা Individualism-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রত্যেক ধর্মীয় আপনাকা বা Revelation নীতিকে করেন বটে। বাইবেলই তাহাদের প্রামাণ্য শাস্ত্র। কিন্তু প্রত্যেকা সাধক নিজ নিজ যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার দিকে। এই আপনাকার বা শাস্ত্রবাদীর অর্থ এবং অভিপ্রায় নির্দেশন করিয়া লইবেন, এ বিষয়ে অন্য কাহারও অভিকার নাই। ইহাতেই মার্টিন লুথার Right of Private Judgment নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অভিকার প্রত্যেকের যুক্তি ও বুদ্ধিকে শাস্ত্র নির্দেশের একমাত্র বিচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ভাবে প্রত্যেক ধর্মীয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিগততাবলী—Rationalism এবং Individualismএর—কতকটা শাস্ত্র আছে।
তাহার প্রাচীন সাধনাতেও যুক্তি এবং ব্যক্তিগততাবলীর একটা শাস্ত্র আছে। গতামুগ্ধিত ধর্মের সাধনে কেহ ইহার সন্ধান লইতনা। সুতরাং একসময় কথা তখন লোকে জানিত না এবং বুঝিত না।
এইজন্যই আমাদের যে সকল ইংরাজীবাশের। এই যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগততাবলীর প্রকাশে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে অমূল্য এবং মানবের স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপাল্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যেক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণে কুষ্ঠিত হন নাই।
ফলতঃ আমাদের প্রথম দলের ইংরাজীবাশের মধ্যে থুথুষ ধর্মের প্রতি অনুরাগ এতটা পরিমাণে বাড়িয়া। উঠিয়াছিল যে হিন্দুসমাজ তাহাতে ভাগীদার হইয়। উঠিয়াছিল। রাজা রায়াকান্ত দেব তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজের অন্ততম প্রধান নায়ক ছিলেন।
একদিকে যখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়ে লাগিলেন, অন্যদিকে তখন রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে কলিকাতার হিন্দুরা সম্মিলিত হইয়। এই নূতন ভারতের মুখে গভীরগতিক হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় হইলেন।

কিন্তু সমস্ত অভাবনীয় ঠিক ছিল। ইহার বিষয়বস্তুর প্রেরণায় নূতন ইংরেজ রাজ্যের সরকারের এবং সুদার্শনের আফিসে জীবিকার উপার্জনের লোভে বালকদিগকে ইংরাজ শিখাইতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষার স্বাভাবিক করিবার সাহস ইহাদের হইল না। রাজ্য রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হিন্দু কলেজের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্ত্রীরা এই নূতন বিদ্রোহের বাণী তিনি নিজে খাল কাটিয়া ঘরে আনিয়াছিলেন, ইহা বলা যায় যে তার পারে। যখন এই বাণচালের মুখে তাহার ধর্ম এবং সমাজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখনও তিনি ইংরাজী শিক্ষার উচ্চু সাধনে অগ্রসর হইলেন না। কি করিয়া ছেলেরা ইংরাজী বাস্তবে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার শাস্ত্র-সাহিত্য অধ্যয়ন করিবে, অথচ ইহার যে অপরিহার্য পরিমাণ যুক্তিবাদ ও বাক্সাহাতের প্রভাব, তাহার হাতেও এড়াইয়া থাকিবে, এই অসাধা সাধনায় হিন্দুসমাজের নেতৃত্ব প্রকৃতি হইলেন।

কিন্তু তদ্ব্যতিক্রমের দাবী, শাস্ত্র ও কুণ্ডলিনীর দোহাই দিয়া, কিন্তু সমাজ শাসনের ভয় দেখাইয়া নূতন ভাবের ও আদর্শের মদে মাতোয়ার। যুবকের দলের সমাজ এবং ধর্মের গোপতাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও চারিদিকে ধূমেদ্ধের বিভীষিকা জাগিয়া। হিন্দুসমাজের বিষয় আচরণ উপস্থিত করিল। কুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর সুসংগৃহীত ও সর্বমাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন প্রকাশ্যভাবে ধূমেদ্ধ গ্রহণ করিলেন, সেদিন
কলিকাতার হিন্দু সমাজের নেতৃত্ত্ব মাধ্যম হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে কৃষ্ণমোহন যে পথ দেখাইয়াছেন,
ইংরাজী-বীশ ভঙ্গস্তানের দলে দলে সে পথ অবলম্বন করিয়া আরম্ভ করিবে। ভঙ্গস্তানের বংশধরের। যদি এইরূপে খৃষ্টীয় হইয়া যায় তবে ক্রমে গোটা দেশটাই খৃষ্টীয় হইয়া পড়িবে।
ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা ক্রমে অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এই আসন বিপদে উদ্ধার করিবে কে ? ইহা ভাবিয়া তাহারা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মহব্বি দেবব্রদ্ধ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক দায়িত্বের দাবী করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠিত মুনুষ ব্যক্তিভূত নবচেতনা সঞ্চার করিয়া নব্যশিক্ষিত বাঙালীদের উপরে খুঁটখল্লের প্রভাব নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন।
চতুষ্ঠ কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ একটা খুব বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ষান্ত অবস্থা দেখিয়া। এই বড় কথাটা তুলিয়া গেলে চালিবে না। পঞ্চাশিশিব বৎসর পূর্বে যে ব্রাহ্মসমাজকে দেখিয়া, প্রথম, যে বনর অস্তরে স্বাধীনতার আদর্শের প্রবণতা তাহার অন্য গ্রাহণ করিয়াছিলাম, সে ব্রাহ্মসমাজ এখন আর নাই। থাকিলে বাংলা আজ এতটা আম্বু-বিস্মৃত হইয়া পড়িত না।

যে স্বাধীনতা এবং মানবতা বাংলার চিত্রায় এবং সাধনার সমান্তরাল বিশেষ্টা, যে স্বাধীনতা এবং মানবতার নীতি প্রেরণা লইয়া আইয়া ইংরাজী শিক্ষা ও আধুনিক ইউরোপীয় সাধন। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীকে একদিন মাতাইয়া তুলিয়াছিল, যে স্বাধীনতা এবং মানবতার সংস্কারের জন্যে দৈনন্দিন করিয়া ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেশের গতানুগতিক ধর্মে এবং সাধনে পুরান সংস্কারের ও রোঁতিনীতির নিগুঢ় ভাষ্য। নিজেদের মুক্ত করিতে উদ্দেশ্য হইয়াছিলেন,—সেই স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শ রূপে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ঠ হইয়া। ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজীর আইন-কানুন দেশমধ্যে সাধারণভাবে একটা স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে অন্যান্যক্ষেত্রেই ফুটিয়া উঠিতেছিল। ব্রাহ্ম-সমাজে এই স্বাধীনতার পরিপূর্ণ মুক্তিতে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়া। এই ধারেই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ এই তাঁ উচ্চাঙ্গ অধিকার
করে। এই ব্রাহ্মণসমাজ বাংলার নিজস্ব বস্তু। অন্য কোনও প্রদেশে এই বস্তুটি ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ এই যে, বাংলা যে স্বাধীনতা ও মানবতার প্ররক পাইয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশ তাহা পায় নাই।

বাংলার প্রথম যুগের ইংরাজীবাবুর নীতি স্বাধীনতা ও মানবতার প্ররক সমাজে একটা প্রবল সংশয়রীতি এবং সমাজীতি। বেশী উল্লেখ করিয়া একটা স্বাচ্ছন্দ্র ও অংশাচারের ব্যাপার সমাজকে ভাষায় দিতে উচিত হ'ন। কিন্তু ইহার মধ্যে বাঙালির প্রকৃতিতে অস্তিত্ব এবং ধর্মান্তরীণ রূপ ছিল, তাহার সত্তার প্রচলিত ধর্মের শক্তি। হারাইয়া বুঝাইয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করেন। এই তিনিধর অংশগ্রস্থদের হস্তে হইতেই দেশকে রক্ষা করে স্বাক্ষর মানুষ ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি বীরতাক্ষর হইয়া এই সত্য কথা ভুলিলে চলিবে কেন?

(২)

কেবল ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসনের মাত্র এই অসন্ত বিপ্লবের আশ্চর্য-নিবারণের ভার ছাড়িয়া দিলে চলিত কি? ইউরোপে ফরাসি-বিপ্লবের মুখে স্বাধীনতার এবং মানবতার যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার ভুল হাতি ধর। পড়িয়া সংশোধিতী হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই বৈশ্বিক আদর্শের উদ্দাম অস্ত্রফলন কালক্রমে ইউরোপেও সংযুগ হইয়া। আসিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসনের উপরে একাত্বভাবে আমাদের বিগত শত বর্ষের সামাজিক অভিব্যক্তি-ধারার পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিলে ইউরোপের মতন এদেশেও প্রথম যুগের স্বাধীনতার এবং মানবতার আদর্শের উদ্দামত। আপনি
নবযুগের বাংলা

সংযুক্ত হইয়া আসিত,—এরূপ কল্পনা করা যায় বটে। আর সে অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষা এবং ইংরেজ-শাসনই, ব্রাহ্মণতায় যে কাজটা করিয়াছে, আপনা হইতেই সে কাজটা করিত। ফলতঃ ইংরেজী শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণতায় এ কাজটা করিয়াছে।

সে শিক্ষা দেশময় পরিব্যাপ্ত না হইলে ব্রাহ্মণতায় কোনও দিকেই সফলতার সত্যাবাদ ছিল না। এ কথা যে একবারে মিথ্যা, এমনও নহে। কিন্তু এ সকল সীকার করিলেও বাংলার নবযুগের ইতিহাসের অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মণতায় যে কাজটা করিয়াছে, তাহার মূল্য ক্রাস হয় না।

প্রথমতঃ, শুধু ইংরেজী শিক্ষাই যদি আমাদের নবযুগের নবীন চিন্তা ও সাধনাকে পরিচালিত করিত, তাহা হইলে এই যুগের উপরে এখনও আমাদের স্বদেশের সনাতন প্রকৃতি ও সাধনায় যে ছাপটা অপ্রত্যাখ্যান আছে, তাহা একবারেই ধুইয়া মুছিয়া যাইত।

ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া এবং ব্রিটিশের শাসনতত্ত্বাধীনে থাকিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে ইউরোপের চৌচাই গড়িয়া উঠিতে পারি। জাপানের মত একটা স্রাবণ ও পরাক্রমশালী জাতিয় যেখানে নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে পারিতে না, ইউরোপের প্রভাবে, ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগ্যতা করিতে যাইয়াই ইউরোপের মতন হইয়া উঠিতেছে, তখন আমাদের মতন একটা পরাধীন ও অস্ত্রবিশ্বাসী জাতির পক্ষে এই অপরিহার্য পরিণাম পরিহার করিবার সত্যাবাদ ছিল কি?

আমাদের এই অস্ত্রবিশ্বাসী দূর করিয়া। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য করেন, ব্রাহ্মণতায়। আর এই কর্মে প্রথম এবং প্রধান নায়ক ছিলেন, মহাবিদ্যালয়ে। রাজা রামমোহন ইহার সূত্রপাত করিয়া, যান, একথা সত্য। কিন্তু রাজা বিলাত চলিয়া গেলে এবং সেখানে দেহরক্ষা করিবার পরে তাহার সংস্কার-ব্যতীত উদ্যোগের সকল সত্যাবাদ। একরূপ
লোপ পাইয়া যায়। তিনি যে কাজটা করিতে গিয়াছিলেন, তাহার জীবদ্ধশায়া অতি অল্প লোকই সে কাজের প্রকৃত মর্ম এবং মূল ধরিতে পারিয়াছিলেন। অর্থ দিকে তিনি যে ইংরাজী শিক্ষার পতন করেন, সেই শিক্ষার প্রভাব তাহার নিজের কর্মের প্রভাবকেই ছাপাইয়া উঠে। রাজা একটা সময়ের পথ দেখাইয়াছিলেন। রাজার সাধনাতে শাহসের সঙ্গে যুক্তির, গুরুর উপদেশের সঙ্গে স্বামুদ্রির, সমাজমুদ্রির সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যাধিজ্জ্বর বা ব্যক্তি-ব্যাত্নের, পাচীনের সঙ্গে নবীনের, একটা অপূর্ব সময়ের চেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়ের সূচনা যদি দেশের লোকে ভাল করিয়া ধরিতে পারিত, তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষা যে অসংখ্য ও উচ্চশ্রেণী জাগাইয়া তুলে, তাহা উঠিয়া পারিত না। রাজার অভাবেই তাহার সহস্র-রোপিত ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাধনা একটা দেশব্যাপী নান্দনিক ও বিদ্যবাহী আশ্রম জাগাইয়া তোলে। এই আশ্রম নিবারণ করেন, সঙ্গীত দেবেন্দ্রনাথ।

রাজা রামমোহন রায়ের অবর্তমানে তাহার ব্রহ্মসভা মূল্য হইয়া পড়ে। ধর্ষাত্মক রাজার সতীক্ষ এবং এবং রাজার সংস্কারকর্মে তাহার শিখার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই মূল্য ব্রহ্মসভাকে ধরিয়া পড়িয়াছিলেন। রাজা এদেশে ধারিতে বাহারা তাহার সুতর এবং অগ্রহ ছিলেন, তাহারা প্রায় সকলেই, তিনি চলিয়া গেলে, এই ব্রহ্মসভা হইতে সরিয়া পড়েন। জোড়াঢাঁকের ব্রহ্মসভার বাড়ীটা এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই রাজার এই কীর্তির মূল্য দর্শন করিতেছিলেন। এ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ রাঙ্গাসমাজের নেতৃত্ব এবং করেন।

দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে রাজাকে দেখিয়াছিলেন। রাজা আদর করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে “বেরাদর” বলিয়া ডাকিয়েন। বিকালে বেলা।
নবযুগের বাঙলা

বেড়াইছে যাইবার সময় অনেকদিন রাজ। আপনার জ্যোঁষপুত্র রমাপ্রসাদের সঙ্গে রমাপ্রসাদের সত্তর্থ দেবেন্দ্রনাথকেও গাড়িতে তুলিয়া লইতেন। এইরূপে বালক দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজার একটা স্নাতের সম্পর্ক গড়িয়া উঠত। দেবেন্দ্রনাথের মুখে এ সকল কথা শুনিয়াছি। বিলাত যাইবার সময় রাজ। তাহার শ্রুতির দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া “বেরাদার” দেবেন্দ্রনাথকেও ডাকাইয়া পাঠান; এবং নীরব কর্মস্রবণ করিয়া। তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে এই নীরব কর্মস্রবণের ঘাটাই রাজ। তাহার উপরে রাজসমাজের ভবিষ্যৎ কর্মসভার অর্পণ করিয়া যান। এইভাবে রাজার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র দেবেন্দ্রনাথের চিন্তকে বাল্যকাল হইতেই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ রাজার চরিত্রের প্রভাবেই ফুটিয়া উঠেন; রাজার বিশিষ্ট সাধন-পশ্চাদি বিষয়। তন্ত্র-সিদ্ধান্তের অনুশীলন করেন নাই। ফলতঃ দেবেন্দ্রনাথ রাজার সিদ্ধান্ত ও সাধন দুইই বর্জন করেন। তন্ত্র-সিদ্ধান্ত রাজা অত্যন্ততাবলম্বী ছিলেন। এ বিষয়ে রাজা শঙ্করের শিষ্য ছিলেন; তবে পরবর্তী অত্যতত্তাত্ত্বিক পঞ্জাবী প্রভু গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রাজা তাহাকে শঙ্করচন্দ্রের সত্য অভিযোগ্য বলিয়া মনে করিতেন না। পণ্ডিতের ব্রজসমাজ শিল মহাশয় কছেন যে রাজ। নিজের তন্ত্র-সিদ্ধান্তে শঙ্কর এবং রামাযুজের মধ্যে একটা সমন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, রাজা যে অত্যতত্তাত্ত্বিক ছিলেন, তাহার প্রাচীন পণ্ডিতে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। মহর্ষি ভক্তিবাদী ছিলেন। নুত্রাং অত্যতত্ত্বাদের নামগ্রহকারী তিনি সহিতে পারিতেন ন। রাজা তার্কিক স্থািক ছিলেন। পরমহংস হরিহরানন্দ শামী রাজার গুরু ছিলেন। মহর্ষির
সাধন অন্য পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। মহর্ষির ভক্তিসাধনের উপরে হাফেজ, সাধী প্রভুতি পারিসিঙ্গ ভক্তিদিগের খুব গুরু পাঠালে পড়িয়াছিল। ভগবদ্গুপের কথা কহিতে কহিতে মহর্ষি সরবরাহ তারে গদগদ হইয়া হাফেজ প্রভুতির কবিতা আরুতি করিতেন। ভক্তি সাধনায় মহর্ষি ইসলামীয় ভক্তির সাহায্যের বিশেষ অনুস্বর করিতেন। রাজার ভক্তির রূপের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল কিন। সেদেহ। রাজার প্রস্থানিতে তাহার তর-জানের দিকট। যে পরিমাণে ফুটিয়াছে, ভক্তিসাধনের দিকট। সে পরিমাণে ফুটে নাই। রাজা শক্ত-প্রাণের সৌভাগ্যে করিয়াছেন। মহর্ষি ব্রাহ্মস্মাধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া। কিছুকালের মধ্যেই সরাসরি ভাবে এই প্রাণায়া বজ্জন করেন।

রাজার সময়ে এবং তাহার পরেও কিছুদিন পর্যাপ্ত জোড়াস্তাকর ব্রাহ্মস্মাজে “বেদান্ত-প্রতিপাদ” ব্রাহ্মধ্যেরই উপদেশ হইত। তখনকার ব্রাহ্মস্মাজে বেদ মানিতেন। ক্রমে বেদে অঞ্চনাপলার বিহিত হইয়াছে, অথবা বেদ দেববাদ এবং দেবপাসায় প্রচার করিয়াছে, মহর্ষির অন্তরে এ স্থলে উপস্থিত হয়। এই স্থলে নিরসনের জন্য মহর্ষি চারিজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেদ পড়িবার জন্য কার্যের প্রমাণ করেন। ইহাৰা বেদ পড়িয়া কাশী ইহতে ফিরিয়া আসিয়া। কহিবার যে বেদে কেবল ব্রহ্মবাদ উপদেষ্টা হয় নাই; দেববাদ ও দেবপালানাই উপদেষ্টা হইয়াছে। মানুষের রচিত অপরাপর গ্রন্থে যেন সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশিয়া রহে, বেদে সেই আচার মিশিয়া মিশিয়া আছে। এই কথা শুনিয়া মহর্ষি বেদের প্রাণায়া বজ্জন করিলেন। আর এখানেও তিনি রাজার পথ ছাড়িয়া যান।

বেদে যে সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়া আছে, রাজা ইহা জানিতেন। শক্তির মায়া বিচার করিলে উপনিষদেও যে দেবপাসায় উপদেষ্টা হইয়াছে, ইহাও রাজার অবিদি ছিল ন। প্রাচীন ব্রাহ্মণ স্থিতাৰ্থে
এ সকল কথা জানিতেন। কিন্তু মীমাংসা-শাস্ত্রে এ সকল সত্ত্বেও যে ভাবে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে খবরও রাখি রাখিতেন।
বেদে যাহা কিছু আছে, তাহারই যে প্রামাণ্য-মর্যাদা আছে, এমন নহে।
বেদে অনেক ইঙ্গিত-প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্ণনা আছে, এ সকলের শাস্ত্র-মর্যাদা নাই।
কারণ শাস্ত্র দৃষ্টি বিষয়ের প্রমাণ দেয় না। যাহা চক্ষে দেখা যায়, চক্ষুই তার প্রমাণ।
তাহার সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ নিদর্শন নয়; তাহাতে শাস্ত্রের অধিকার নাই।
এই জন্য মীমাংসা "অদৃষ্টাত্মক শাস্ত্র" শাস্ত্রের এই সংজ্ঞা দিয়াছে।
কিন্তু অদৃষ্টও ত কল্পিত হইতে পারে।
আর সত্য হইলেও যাহা কিছু অদৃষ্ট অথবা ইঙ্গিতাত্মিক, তাহারই সম্বন্ধ আমার যে কোনও
সম্বন্ধ থাকিবে, এমন নহে।
এই প্রশ্ন উঠিলে শাস্ত্রের দ্বিতীয়
সংজ্ঞা হয়—"মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র।"
উত্তর-মীমাংসা প্রামাণ্য-
শাস্ত্রের এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন।
বেদ বা উপনিষদের
যে সকল অমুক্ত উপদেশ দেয়, তাহাই কেবল প্রামাণ্য-শাস্ত্র।
আর অন্য যাহা কিছু তাহা অর্থবাদ মাত্র; অর্থবাদের শাস্ত্র-প্রামাণ্য
নাই।
উপনিষদ পার্কার কহিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের
মুক্তি হয় না।
স্বতঃস্বাভাবিক স্বার্থে ব্রহ্মজ্ঞান
প্রাপ্ত এবং ব্রহ্মচর্যাপন।
উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কেবল প্রামাণ্য-
শাস্ত্র।
গোটা বেদ বা উপনিষদের শাস্ত্র হিসাবে কোনও প্রামাণ্য
নাই।
রাজা এই পথেই প্রাচীন মীমাংসকদিগের হাত ধরিয়া, বেদাদি
শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্থায়ী করিয়াছিলেন।
এ পথে শাস্ত্র-প্রামাণ্যের
সঙ্গে সাধারণত্তির প্রাধান্যের কোনও প্রকারের সাংঘাতিক বিরোধ
নাই।
মহর্ষি এ পথ ধরিয়েন না।
তিনি আধুনিক ইউরোপীয়
মুক্তিবাদের প্রকৃতিতে সরাসরিভাবেই বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বহন
করিলেন।
আর এরূপ না করিলে মহর্ষি এ যুগের নাস্তিক্য এবং সন্দেহ-বাদকে ঠেকাইয়া রাখিতেও পারিতেন না। রাজার সিদ্ধান্ত এবং সাধনার বিচার করিতে হইলে, তিনি যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে কালের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনের বীরাই তাহার মূল্য নির্দেশণ করিতে হইবে। রাজা দেশের লোকের অন্তরে সন্দেহ জাগাইয়া তাহাদের মানসিক তথ্যকেই দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। সন্দেহ হইতেই বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। আর বিচারের মূলেই লোকের স্বাধীন চিন্তা জাগিয়া ওঠে। সন্দেহ—বিচার—সংজ্ঞা—এবং সমষ্টি, ইহাই সমাজের প্রতিষ্ঠায় সন্তান পথ। রাজা এই পথটি ধরিয়াছিলেন।

কি করিয়া লোকের গতানুগতিক বিশালটা নাড়িয়া চালিয়া দিতে হইবে, রাজার সমক্ষে ইহাই প্রধান সমস্যা ছিল। মহর্ষির সমক্ষে এই সমস্যা ছিল না।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে নবাব্যাখ্যিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নাস্তিক্য এবং সন্দেহবাদের বান যখন জাগিয়া উঠিল, সেই সময়েই মহর্ষি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাহাকে সন্দেহ এবং বিচার জাগাইয়া কোনও চেষ্টা করিতে হইল না। কিন্তু কি করিয়া নির্বৃত্ত যুক্তি-বাদের আক্রমণ হইতে ধর্মের সত্য প্রাণবন্ধকে বঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, মহর্ষির নিকট ইহাই সর্বপ্রধান সমস্যা হইল। শিক্ষিত লোকেরা শাসকের মানিতেন না। শাস্ত্র-প্রামাণ্য ব্যতীত ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না বা হইতে পারে না, ইহাই এ কথা বিশাখা করিতেন না। যুক্তি যদি ধর্মের রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে ধর্মকে রাখিবার কোনও প্রয়োজনই নাই; ইহাই সে যুগের মূল কথা' ছিল। স্বত্বান্ত ধর্মসাধনে শাস্ত্রের কোনও স্থান আছে কি না, ভাবিতে যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কি বা কতটুকু, শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জন করিলে ধর্মসাধনের...
বা ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার কি ব্যাখ্যা হয়, এ সকল প্রশ্নের বিচার তখন নিষ্প্রাঙ্গ ছিল। এ চেষ্টার সময় তখন আসে নাই। অকলে এই চেষ্টা করিতে গেলে, তাহার ফলে গুরুশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা দুর্বল থাকবে, ধর্ম্মের মর্যাদা পরিস্ফুট নষ্ট হইত। এ অবস্থায় মহর্ষি গুরূশাস্ত্র বজ্রন করিয়াও শুধু যুক্তির উপরে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ অত্যন্ত সমীচীন ও সময়ের পয্যৌগী হইয়াছিল, এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ এতদিন পরে দেশের নূতন অবস্থায়ীনে মহর্ষির প্রথম জীবনের সিদ্ধান্ত ও সাধনের অপূর্বতা দেখিতে পাইতেছি বটে। কিন্তু সে সময়ে মহর্ষি যদি রাজার মতন শাস্ত্রগ্রামাণ্য স্বীকার করিতেন এবং শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তির একটা সমর্থণ-করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহ। হইলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরেজীনবীশেরা কেহ বা একান্ত নাস্তিক্যবাদী হইয়া পড়িতেন, আর কেহ বা কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মতন খুব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সে সময়ে মহর্ষি শাস্ত্র ছাড়িয়া কেবল যুক্তির উপরে ধর্ম্মকে গড়িতে যাইয়া এই দুইটা পথই বন্ধ করিয়া দেন। বাংলার নবযুগের নবীন সাধনার ইতিহাসে ইহাই মহর্ষির শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

(৪)

কিন্তু এখানেও মহর্ষি একটা সময়েরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যুক্তি মানিয়াও ইংরেজ-প্রত্যাক্ষই যে যুক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার করিলেন না। ইংরেজ-প্রত্যাক্ষের অপূর্বতা দেখাইয়া যুক্তির আমাদের নিরস্থ যুক্তিবাদের হাত হইতে ধর্ম্মকে ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে বঁচাইলেন। ইংরেজ-প্রত্যাক্ষ সম্পূর্ণ বন্ধনীয় দিতে
পারে না। আমাদের মধ্যে আত্মা যে আত্মা তাহাতে জ্ঞানের কতকগুলি নিতাসিক্ত ছাঁচ আছে। ততক্ষণ না ইন্দ্রিয়মূলক বস্তু-সকল আত্মার এই জ্ঞানের ছাঁচ যাইয়া চালাই হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় কোনও বস্তুজ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই ছাঁচগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না। ইহার। অতীশ্বরে যে আত্মা তাহারই বৃত্তি। এই ছাঁচগুলি নিতাসিক্ত। আত্মার ধর্মশৃঙ্খলে নিতাসিক্ত এই আত্মা তাহে। মহিষী জ্ঞানের এই নিতাসিক্ত ছাঁচগুলিকে 'আত্মপ্রতায়' কহিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ইহাকে Intuition কহে। এই আত্মপ্রতায় বা Intuitionই মহিষীর সাধনে ও সিদ্ধান্তে প্রচলিত যুক্তিবাদ এবং তাহার প্রকৃতিগত ভক্তিবাদের মধ্যে একটা সময়ের প্রতিষ্ঠা করে। উনিবুর্ণ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তা ও ইন্দ্রিয়-প্রতায়ের জগত্যুক্তামাণ্য শীর্ষ করিয়াই এই প্রতায়ে যে একটা অতীশ্বরে জগতের আত্মায় কার্যা করিছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়; এবং এই সিদ্ধান্তের সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বারা অভূতপূর্ব মানুষের ধর্মশিক্ষায় বৰ্ত্তাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখানে মহিষী আপনার সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রতিষ্ঠায় উনিবুর্ণ শতাব্দীর ইউরোপীয় তথ্বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয়। আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম চিন্তার কংগন তাহার যোগ না থাকিলে এবং সে চিন্তার দ্বারা তাহার মতবাদ সমর্থিত না হইলে সে সময়ে তিনি আমাদের নূতন ইংরাজী-নবীণন্ধনের চিন্তাকে কিছুতেই ফিরাইতেও পারিতেন না।

বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য বজ্রাত্ম করিয়াও স্বদেশের প্রাচীন এবং সর্বজনপূণ্য শাস্ত্রের পরিভাষার সাহায্যেই মহিষী নিজের স্বাভাবিক ধর্মসিদ্ধান্ত লোকসমাজে প্রচার করেন। তাহার ‘ব্রাহ্মধর্ম’ এই উপনিষদের শ্রুতির দ্বারাই রচিত হয়। ইহার ফলে মহিষির নব যুগের ১০
নবীন সাধন। প্রাচীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত্বে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সে সময়ে এদেশে উপনিষদের বহুল প্রচার হয় নাই। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বেদ-বেদান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না। সুতরাং মহর্ষির এই নূতন ধর্ম যে প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম নহে, অতি অল্প লোকেই ইহা বুঝিয়াছিলেন। অন্যদিকে মহর্ষির সিদ্ধান্তের ও সাধনের সঙ্গে নূতন যুক্তিবাদের কোনো বিশেষ বিরোধও ফুটিয়া ওঠে নাই। এই যুক্তিবাদ যাহাদের চিন্তকে অধিকার করিতেছিল, তাহারা যুগের প্রাচীন সাধনাতেই একে একটি ধর্মের সন্ধান পাইলেন, যাহা শুধু যুক্তি এবং বিচারের দ্বারাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এ ধর্মে অতি প্রকৃত শাস্ত্রের প্রমাণ নাই। ইহাতে অতি প্রকৃত শিক্ষাসম্পন্ন গুরুরও প্রাধায় নাই। এখানে পৌরোধিতা নাই। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা কোনো প্রচেষ্টা নহে। ইহার প্রমাণ কোনো বিশেষ সৌষ্ঠবতারের উপলব্ধিতেও নহে। এই ধর্মের প্রামাণ্য মূল্যের অন্তরে, সাধারণ মানব প্রকৃতির মধ্যে। সাধারণ মানুষে যাহা ধারা প্রতিদিন চারিদিকের বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতেছে, সেই জ্ঞানের মূল ভিত্তির উপরেই এই ধর্মের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অথচ ইহা আধুনিক নহে। যুরোপীয় সাধন। সবে মাত্র এই পথের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু এ পথ ভারতের অতি পূর্বতন ও পরিচিত পথ। মধ্য-যুগের লোক এই পথের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মহর্ষি এই লুপ্ত পথের উদার সাধন করিয়াছেন। এই ভাবেই আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মকে দেখিয়াছিলাম। ইহার উপরে কতটা পারমাণব যে আধুনিক যুরোপীয় চিন্তার ছাপ পড়িয়াছিল, সেকালে ইহা অতি অল্প লোকেই ধরিতে পারিয়াছিলো। মহর্ষি নিজেই ইহা বুঝিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। মহর্ষির ‘ব্রাহ্মধর্ম’ প্রাচীন উপনিষদের শৃঙ্খল ভাষাতে প্রচারিত
হইয়াছিল বলিয়া গাঁহারা দেশের প্রচলিত পৌরাণিক ধর্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপের বাহ্য দেখিয়া। স্বদেশের সাধনার প্রতি বীজত্ব হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহারা মহর্ভির 'ব্রাহ্মণির' কল্যাণে ক্রমে সে আর্থ ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন। একদিন গাঁহারা নৃতন শিক্ষা প্রাপ্তভে ইউরোপের আগম্য সাধনাকে নিজেদের স্বদেশের সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন তাহাদের চিন্তা ক্রমে স্বদেশের দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ব্রাহ্মণ আমাদের বর্তমান স্বদেশবিভিন্ন প্রথম শিক্ষার্থুর হইয়া উঠিল। এই শিক্ষার ফলে গাঁহারা একদিন হিন্দুধর্মকে মিথ্যার ও কূস্বকের জল্পনা বলিয়া যুগার সঙ্গে বর্জন করিতে গিয়াছিলেন, তাহারাই আধুনিক সভ্যতার সমক্ষে এই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচার করিতে লাগিলেন। মহর্ভির স্বয়ংবর শিষ্য এবং সহকর্মী রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্বপ্রথমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্পনাপথের করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এই পুরোহিত নামে ব্রাহ্মণ বর্তমান যুগের যুগ-সাধনার প্রথম গুরু হইয়া আছেন।

বাঙ্গালার চিরদিনের বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা এবং মানবতা। বর্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ যে পরমাণু এই স্বাধীনতা এবং মানবতার আদর্শকে একদিন জাকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং সন্তর পণ করিয়া জীবনে ও চরিত্রে এই আদর্শকে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন আর কেহ সেরূপ করেন নাই। ইংরাজী শিক্ষা ভারতের সকল প্রদেশেই স্লথ-বিস্তার প্রচারিত হইয়াছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধুনীলনে বাংলা যে অনন্তসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, এ দাবীও করিতে পারা যায় কি না সন্দেহ। কোনও কোনও দিকে বোধহই, মানসী প্রভূতি আধুনিক শিক্ষা ও সাধনার অধুনীলন বাংলা অপেক্ষা অধিক সফলতাই লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই শিক্ষা ও সাধনার
প্রাণবন্ধে যে স্বাধীনতা এবং মানবতা তাহাকে বাংলা যেমন আক্রমণাধীন ধরিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশ সেরূপ ধরে নাই। ইহাও রাজনীতিকেরই কার্য।

রাজনীতিক সত্য প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রীয় বহিঃনিবদ্ধ করিয়া। প্রতেক মানুষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই একমাত্র প্রাথমিক বলিয়া প্রচার করিলেন। যাহা আমার বিচার-বুদ্ধিতে সত্য বলিয়া বোধ হয়, কেবল তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ কর্ব। যাহা নিজের কাছে সত্য বলিয়া বোধ হয় না, তাহাকে কাহারও কথায় সত্য বলিয়া মানিয়া লাইব না। শাস্ত্রের কথায়ও নহে; গুরুর কথায়ও নহে। যাহা নিজের ধর্মের ফুটিতে সাধু এবং সন্ত বলিয়া মনে হয়, কেবল তাহারই পারস্পরিকর্ম করিয়া চলিব। যে পথ নিজের ধর্মবুদ্ধির নিকটে আত্মপ্রকাশ না করে, কল্যাণের পথ বলিয়া তাহাকে কখনই আশ্রয়ের করিব না। গুরুজনের আদেশেও নহে; সমাজের শাসনের ভয়েও নহে। সত্যা-সত্যিত্বের এবং ধর্মী-ধর্মের কাঠামোতে আমার নিজের ভিত্তরেই আছে। সত্য এবং ধর্মকে এই কাঠামোতে যাচাই করিয়া লাইব। কাহারও কথায় না বুঝিযা সত্য বা ধর্মকে গ্রহণ করিব না। এ সকলই বাংলার প্রথম যুগের রাজনীতি-সমাজের জীবনের এবং সাধনের মূল মূল্য হইয়াছিল। এই শিক্ষার প্রাক্তনই আধুনিক বাংলা দেশে এমন একটা স্বাধীনতার প্রেরণা আসিয়াছিল, যাহা ভারতের আর কোনো আসে নাই। এই স্বাধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া বঙ্গভালী যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে এবং অমনিবন্দনে যে ভাগ তীকার করিয়াছে, অন্য কেননা প্রদেশের লোকে সেরূপ করে নাই। এবং এই তাহের সাধনায় রাজনীতিকের প্রথম গুরু হইয়াছিলেন। মহিলা দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাধর্মী। কিন্তু এ সাধনার অসাধারণ-শক্তিলাভ করে, দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য রাজনীতিকের কেশবচন্দ্র সেনের
নেতৃসাদীন। বাংলার নবীতের নবীন সাধনায় ব্রাহ্মণসাধনের কার্যা
ছুই ভাঙে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগ দেবনন্দনাথ এবং আদি-
ব্রাহ্মণসাধনের, অন্য ভাগ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ভারতবর্ষীয়
ব্রাহ্মণসাধনে। দেবনন্দনাথ যে মৃত্যুকে প্রবর্তিত করিয়া বীর-
নিধনভাবে স্নীহিতিং যাতে ভিতর দিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতে-
ছিলেন, কেশবচন্দ্রের অলঙ্কারসাধন প্রভূত সকল বীরন ভাঙ্গিয়া
সেই মৃত্যুকে চারিদিকে উদ্দাম তরঙ্গতঙ্গ তুলিয়া ছড়াইয়া দিয়াছিল।
বাংলার আধুনিক ব্যাখ্যাতার সেই সংঘম অসংখ্যের উন্মাদিনী কাহিনী
এক অপূর্ব বস্তু। এই স্বাধীনতার ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এক নতুন
অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার নবীতের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া এ পর্যন্ত আমি
বহুল পরিমাণে শ্রুতির হাত ধরিয়া চলিয়াছি। রাজাকে ত দেখিয়া
নাই। প্রথমে যুগের ইংরাজীবাসিদের কাহাকেও কাহাকেও
দেখিয়াছি। কিন্তু তাহারা অতীতের স্মৃতিরপেই আমাদের মাঝখানে
দাড়াইয়াছিলেন। মহার্ষির প্রথম জীবনের কাহিনিও শ্রুত, প্রভাক্র
নহে। কেশবচন্দ্রের সময় হইতেই এই যুগস্বাত্বের মাঝখানে আসিয়া
পড়ি। স্তূতরাং এখন হইতে এই কথা বহুলপরিমাণে আমার প্রভাক্রের
উপরই গভীর। উঠিবে।
পঞ্চম কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মানন্দ

(১)

বাংলার নবযুগের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা ও মানবতা। ব্রাহ্ম-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধনের কেন্দ্রে এই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, জীবনের সকল বিভাগে সর্বত্র ভাবে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যান নাই। এ কাজটা করেন কেশবচন্দ্র। এইভাবেই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কেশবচন্দ্র একটা অতি উচ্চ স্তর অধিকার করিয়া আছেন।

আটকিয়ে বহু হইল কেশবচন্দ্র সংসারলীলা সম্বন্ধে করিয়াছেন। এই আটকিয়ে বৎসরের মধ্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে বাংলার জাতিয়া বাড়িয়া। উঠিয়াছেন, তাহারা কেশবচন্দ্রকে ভাল করিয়া জানেন না। এই আটকিয়ে বৎসরের মধ্যে এদেশের চিন্তা ও কর্মের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অতান্ত ক্রস হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও করিয়াছে। প্রথম যৌবনে কেশবচন্দ্র যে চিন্তা ও সাধনার ধারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহা একরূপ শুকাইয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবদ্ধাতেই শুকাইতে আরম্ভ করে। তাহার শেষ জীবনের চিন্তা ও সাধনা অন্ত খাতে প্রবর্তিত হইয়া নিজেই সেই আর্থি স্বীকৃতির কীণ করিয়া তুলে। কেশবচন্দ্রের জীবনদ্ধার, বিশেষত তাহার প্রথম-যৌবনে, যে সকল সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তকে অভিভূত করিয়াছিল, আজিকার শিক্ষিত সমাজের
ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মন্দ ৭৯

সমক্ষে এই সকল সমস্যায় নাই। এই সকল কারণে আজিমিকর্কার
লাউকের পক্ষে কেশবচন্দ্রের সাধনার ব্যাপারে মূল্য গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন
হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত লোকে কেশবচন্দ্রের নামমাত্রই
জানেন, তাহার আলোকাসামান্য বার্তায় কথাও লোক-পরামর্শের
শুনিয়াছেন; কিন্তু বাংলার বর্তমান চিন্তা ও সাধন কতটা পরিমাণে
যে কেশবচন্দ্রের কাছে মনো, ইহা কল্পনা করিতে পারেন না ।

কেশবচন্দ্রের জন্মকালে এ দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম ও সমাজ মানুষের
সাধনাত্মক হরণ করিয়া তাহার মনুষ্যত্বের খাটি করিয়া রাখিয়াছিল।
ধর্ম্মের সঙ্গে ধার্মিকের প্রতাপ অনুভবের কোনও সঙ্গীব সম্পর্ক
ছিল না। কলের পুতুলের মতন মানুষ ধর্মের আদেশ মানিয়া
চালিতেছিল। গীতা কহিয়াছেন :-

চতুর্দিকের ভাকে মান জনাং ব্রকৃতিনোহচ্ছনেঃ
আর্থঃ জিজ্ঞাসু সরথাহীন ভানী চ ভরতীবর্ণ ।

চারি শ্রেণীর হ্রুতিষ্ঠসম্পন্ন লোকে, হে অজ্জুন, আমার ভজন
করেন। প্রথম আর্থ, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, এবং চতুর্থ
জ্ঞানী। এই চারি শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে সমাজে সে সময়ে জ্ঞানী
এবং জিজ্ঞাসু ছিলেন না, বরং চলে। আর্থ, অর্থ ও আসন
বিষয়ে অশক্ত বার্তা। ভগবানের শরণাপন্ন হন, এবং অর্থার্থী,
অর্থ বার্তা কোনও ঈশ্বর লাভের লোভে দেবতার ভজন। করেন,
এই দুই শ্রেণীর উপাসকেই তখন যা কিছু আন্তরিক ভক্তভরে
ব্যর্থ চরণ করিতেন। ধর্ম্ম যেখানে সত্য হয়, সেখানে মানুষকে
সংসহসী এবং শক্তিশালী করিয়া তুলে। সত্য ধর্ম্ম লাভ করিলে
মানুষ ভয় ভাবনার অতীত হইয়া যায়।

শুল্মপাপস্ত ধর্মৰ্য্য খায়তে মহতোভয়াঃ
নবযুগের বাংলা

এই সত্য ধ্বনির স্নাত্তমিষ্টানো পাইল ধারামাত্বক মহৎ-ভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে সময়ের ধ্বনির উপরেই গড়াই উঠিয়াছিল। সংসারের ক্ষতির ভয়ই সে ধ্বনির প্রকাশ ছিল। মানুষ এইরূপে সবর্ধন ভয়ের তাড়নায় চলিয়ে বাধ্য হইলে তাহার জ্ঞান, ক্ষমা এবং ভক্তি, সকলই অত্যন্ত পঙ্গু হইয়া পড়ে। ভয়ে মানুষকে তাম্রঃসিক করিয়া তুলে। কেশবচন্দ্রের জন্মকালে এই তাম্রঃসিকতাতেই বাংলার সমাজ আচ্ছন্ন ছিল।

ইহার পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হয়। কেশবচন্দ্রের বাল্যবিবেচনায় সেই শিক্ষার ফলে ইংরেজীবালিক বাঙ্গালীদের মধ্যে চারিদিকে একটা অনাচার ও উচ্ছস্ত অল্পতার স্রোত প্রবাহিত হয়। এই স্রোতের মাঝখানেই কেশবচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কষ্ট তাহার পূর্বপুরুষদিগের সাধনের বলে চারিদিকের এই অনাচার ও উচ্ছস্ত অল্পতা কেশবচন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের পূর্বপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন। পূর্বপুরুষদিগের ভক্তিসাধনের ফলেই কেশবচন্দ্র প্রথম যোবনের চারিদিকের বৈষ্ণবচর এবং অনাচারের মধ্যে নিজেকে সংযমের ও সঞ্চারের বেষ্টনীর ভিত্তরে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বাংলার বৈষ্ণব-সাধনার দুইটি দায়। এক বৈধী ভক্তির দায়। দ্বিতীয় দায়ের রাগানুগা বা রাগানুগািক ভক্তিভাবের কেহ। বাংলার ভ্রমমাঝের বৈষ্ণব বৈধী ভক্তির সাধনাই করিতেন। বৈধী ভক্তি আচার-বিচার মানীয় চলে। ভ্রম শ্রেণীর বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা এইজন্য মনো, পরাশ্র প্রভৃতি স্মৃতির অনুসরণ করিয়া চলেন। ভক্তিভক্তি হইলেও ইহারা প্রচলিত মায়াবাদের প্রভাবে অতিক্রম করিতে পারেন না। এইজন্য বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও কখনও কখনও জটিল সংসার-বৈরাগ্য দেখিয়ে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকসম্পর্কে কেশবচন্দ্রের যোবনে
পদার্পণ করিতে না করিতে অত্যন্ত সংসারভিকির্তা হইয়। উঠেন। কেশবচন্দ্র কহিয়াছেন যে এই সময়ে তিনি তাঁহার প্রাণের ভিতরে এই বাণী মনিতে পাইলেন —"ওরে, তুই সংসারী হঁস না, সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিয়াস না; কলঙ্ক, পাপ এসকল ভারী কথা; আপাততঃ আমাদ ছাড়; আমাদের সূত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।" কেশব তখন আমাদকে বলিলেন,—"তুই শয়তান, তুই পাপ", বিলাসকে বলিলেন,—"তুই নরক, যে তোর আশয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।" এমন কি শরীরকে বলিলেন, "তুই নরকের পথ, স্তোকে আমি শাসন করিব, তুই মৃত্যুমুখে ফেলিবি।" এই অকুতূ বৈরাগায় কেশবচন্দ্রকে তার প্রথম যোগেন বাংলার ইংরাজী-বাংলা সমাজের অনাচার ও উচ্ছস্ততায় হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এইজন্য ইংরাজী শিক্ষা যে প্রাপ্ত যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগতত্ত্ব জাগাইয়াছিল, তাহার প্রভাব হইতে কেশবচন্দ্রকে বাঁচাইতে পারে নাই; বরং তাহার মধ্যে এই নূতন স্বাধীনতার আদর্শকে ধর্মের আদর্শের দ্বারা সংযত করিয়া আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরাজী শিক্ষা যে ব্যক্তিগতত্ত্বের আদর্শ জাগাইয়া তুলে, কেশব-চন্দ্র তাহারই মধ্যে একটা প্রাপ্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ সংগঠিত করেন। ইতিপূর্বে আমাদের ইংরাজীবিশেষে নির্ভর স্বাধীনতাকেই তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের বর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিগতত্ত্বের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ভাঙ্গাই তাহাদের জীবনের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হইয়া উঠে। এক্ষণে ভাঙ্গার কাজ কিছুদিন এবং কিছুদিন পর্যন্তই চলিতে পারে; বেশী দিন না বলিয়া পারে না। নির্ভর স্বাধীনতা-লিপ্ত। এরূপ কথা নিক্ষুদ্ধ হইতে পারে না; সর্বদাই তাই বলিয়া হইয়া থাকে। এইজন্য এই স্বাধীনতার মধ্যে তাল করিয়া। তাপের শক্তি জাগিতে পারে না। রাষ্ট্রীয়
নবযুগের বাংলা।

স্বাধীনতার লোকে প্রাণ পর্যায় পান করে, বেঁচে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিত্তে একটি বলবতী বৈরিতা জাগিরা রহে। রাজশাখকের অভাবচারের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা জাগ্রত হয়। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে অভাবচারী রাজশাখের উপর প্রতিহিংসা নিবার আত্মাঙ্ক খুব প্রবল হইয়া রহে। এই প্রতিহিংসা প্রূপ্তির মাধ্যমে মানুষের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে প্রণোদিত করে।

যে স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিত্তে এরূপ প্রতিহিংসা-প্রূপ্তি থাকে না, সে স্বাধীনতার প্রেরণা দণ্ডবিখাদ হইতে আসিলেই কেবল মানুষের তাগের পথে লইয়া। যাইতে পারে। অন্যথা এই স্বাধীনতার গতিবেগ সমাজ বাধাদিতে পাইলেই থামিয়া যায়। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের মধ্যে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগাইয়াছিল, ধর্ষের প্রেরণা না পাইলে তাহাও প্রচীন সমাজের তাড়নায় অল্পতেই থামিয়া। যাইত।

ভারতের অন্ধকার প্রদেশে ইহা হইয়াছে। যেখানেই এই স্বাধীনতার অপ্রত্যাশিত ধর্ষের প্রেরণা ছিল না, সেখানেই এই সংগ্রাম বাধিতে না বাধিতেই থামিয়া গিয়াছে; সেখানেই সমাজশিক্ষা ব্যক্তিগতত্বের আত্মাঙ্কে সহজে চাপিয়া মারিয়াছে। বোধ এবং মানুষের আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশেও যে পাওয়া যায় নাই, তাহার নহে।

আমাদের মধ্যেও এমন দেখা গিয়াছে যে শুদ্ধ বাক্তিগতত্ব অভিন্ন অনেক লোকে প্রাচীন সমাজের সমক্ষে চুর'চারিদিন বীরবর্ষে বাঁচেনি করিয়া। পরে রুহৎ তাগের আহান যখন আসিল, তখন রণে ভঙ্গ দিয়া। নিশ্চেষ্ট সেই সমাজের নিকটই আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। ধর্ষের প্রেরণা বাতিত সচরাচর এই তাগের শক্তি জাগে না। আমাদের বনবাসমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও যুরোপীয় সাঙ্কেতিক সংস্পর্শে যে স্বাধীনতার আদর্শ ফুটিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ষের প্রেরণা।
সাগার করিয়া কেশবচন্দ্রই বিশেষভাবে একটা অসাধারণ তালের শক্তি অগাইয়া তুলেন। এই তালের দ্বারা বাঙালি নব্যুগের সাধনা মহীয়সী হইয়া আছে। কেশবচন্দ্র সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত দলের মধ্যে একটি মূলক্ষ অগিলিশক্তার মত অসাই পড়িলেন। সেই আগুনে বাঙালির শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক সম্প্রদায় একেবারে জলিয়া উঠিল, এবং এই অগিল মতে দীক্ষালাভ করিয়া বাঙালির নব্যুগের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিল।

(২)

ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী শাসনের ফলে আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজীবাণিজ্যের মতি-গতি নিশাচ্ছড়ি উচ্চারণ হইয়া উঠে; এবং ইংরাজ শব্দের সাহায্য ও সাধনার প্রতি অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিদেশী সাহায্য ও সাধনার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করেন। মহারী দেবোলান্ত ইংরাজির মতি-গতিকে সংযুক্ত করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সবেশাভিমুখীন করেন। বাঙালির নব্যুগের ইতিহাসে ইহাই মহারীর প্রথানুক্রম।

মহারীর প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যে মত একটা বলবতী আশ্চর্যমণ্ডিত ছিল, অন্যদিকে সেইরূপ একটা দুর্বল রক্ষণশীলতাও ছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে দেশে যে বিগ্রহের বাণিজ্য ভাবিয়া উঠে, তাহাতেও মহারী এই প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। ধর্ম-বুদ্ধির প্রোগায় মহারী যখন দেশ-প্রচলিত ধর্ম-সংক্রান্ত প্রাক্তন ভাবে বাঁচিতেন, প্রচলিত প্রাতিমূজ্জাদিকে অস্বাভা ও অত্যন্ত বলিয়া তাহাকে তাহার করিল না। যাহা নিভাতে না ছাড়িলে নয়, তাহাই তিনি ছাড়িলেন। প্রাচীন ও প্রচলিত মতোষে যতদূরো লক্ষ্য করা সঙ্কত হয় প্রাপ্তব তিনি তাহী রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাহার চারিদিকের ইংরাজীবাণিজ্যের যখন
ধর্ষে এবং সমাজে প্রাচীন এবং প্রাচীনত্বকে নির্দিষ্টভাবে ভাঙিয়ে চুরিতে আরম্ভ করেন, তখন মহবি তাহার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইই রক্ষণশীলতাতে প্রভূত তাহার ধর্ষ-বুদ্ধিকে রক্ষা করিয়া যতটা সম্ভব দেশের প্রাচীন ও প্রাচীনত্ব রীতিনীতিতে অল্প কর্তৃত্ব ধরিয়া রহিলেন। মহবি পৌরাণিক দেবদেবীর উপাসনা পরিহার করিয়া। বিশ্বাস ব্রহ্মপুরুষ। প্রতিষ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু জাতিভেদে একবারে পরিহার করিলেন না। তাহার নেতৃত্বাধীনে আগম ব্রাহ্মণ-সমাজে ব্রাহ্মণেরা কেবল আচার্যের কর্ষ করিতে লাগিলেন। এ সকল ব্রাহ্মণ আচার্যদিগের গলায় উপবীত থাকিল। ইহারা হিন্দু-সমাজের শাসন মানিয়া চলিতেন। বিবাহাদিনী সংস্কারে শালগ্রাম এবং ব্রাহ্মণ বাধাতেন। তথাকথিত গৌরতলিকতার সঙ্গে ইহার। সকল সম্প্রীতি কাটিয়া দেন নাই। এইভাবে সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম-সংস্কারের মধ্যে একটা ব্যবধান জগীয়া রহিল। এইরূপ ব্যবধান এদেশে চিরকালই ছিল। সকল হিন্দুই যে দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহা নেহ। পরিত্যাগে। দেবদেবীর উপাসনা বা প্রতিমা-পুজোয় যে কেবল নির্দোষ অধিকারীর জন্যই বিশেষ হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মপুরুষ যে শ্রেষ্ঠতম উপাসনাই, এ সকল কথা চিরকালই মুক্তকণ্ঠ থাকার করিয়া আসিয়াছে। দণ্ডসন্ন্যাসীর। এ সকল নির্দোষ উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন না। ইহাতে তাহাদের কোনও প্রত্যাবায়ও হয় না। এজন্য লোক-সমাজে তাহাদিগকে নিন্দনীয় হইতে হয় না। মহবি যে বিশ্বাস ব্রাহ্মপুরুষ। প্রতিষ্ঠিত করেন, হিন্দু-সমাজের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোনও বিরোধ ছিল না। নিতান্ত অজ্ঞপুরীগ্রামে ও জোড়ত্রিদের মুখে এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মপুরুষের সাধুবাদ শুনিয়াছি। মহবির ধর্মের সঙ্গে তাহাদের কোনও বিরোধ ছিল না। তাহাদের সঙ্গে বিরোধ করিয়া। জগীয়া উঠে ব্রাহ্মধর্ম লইয়া নেহ, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সামাজিক আদর্শ
লইয়া। মহর্ষির সময়ে এ বিরোধটা ভাল করিয়া জাগে নাই। জাগে কেশবচন্দ্রের সময়ে। আর এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রের প্রথম বিরোধ হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

কেশবচন্দ্র প্রথমে মহর্ষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করেন। মহর্ষি নানাদিক দিয়া তাহার প্রকৃততমিতির রক্ষণশীলতার বাধনকে পর্যাপ্ত আলাদা করিয়া দেন। তখন পর্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও বসবাস অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাহার গুণে মোহিত হইয়া মহর্ষি তাহাকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যপদে বরণ করেন। ১৭৮৪ সালের ১লা বৈশাখে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে মহর্ষি কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের আয়তন ক্রমশই বাড়িয়েছিল। বাংলাদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বাঙ্গালার বাহিরে এ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্ম উপাসকগণগুলী গড়িয়া উঠিতেছিল। এ অবস্থায় মহর্ষি দেখিলেন, তাহাকে যদি কেবল কলিকাতায় আবাস ধার্য হয়, তাহা হইলে সকল সমাজে সমাকল্পে তন্ত্রধারা হয় না। তিনি বলিলেন,—

“যেখানে যেখানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বর্গে যাইবার প্রয়োজন। আমি এখানে আর কলিকাতায় বদ্ধ ধার্য হইলে পারি না, স্ত্রীরাণ এখানে একটি আচার্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব একটি আমি আচার্যপূর্বক শ্রীমুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।”

ব্রহ্মানন্দকে সন্ন্যাসন করিয়া মহর্ষি বলিলেন,—

“শ্রীমুক্ত কেশবচন্দ্র! তুমি মহন্তর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুদ্বারে অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন
করিবে। কিন্তু কলিকাতা রাজস্মাজ উল্লেখ হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মনের মালিক্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্ত কোনও প্রচলিত ধর্মের প্রতি বেশ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে এক বদন হয়, এমত উপদেশ দিবে। আপনার আমার ভাব অকালে হস্তে নির্ভরে ব্যক্ত করিবে, সদা জ্ঞান স্বভাব হইবে। ব্রাহ্মণদিগের সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মন্যাদাতা তাহাকে সেই প্রকার মন্যাদাতা দিবে। তুমি যে কর্ণে অগ্নিসর হইয়াছ, এ অতি দুর্বল কর্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া না। আমাদের ব্রাহ্মণদের প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্য যোগ্য বৎসরে দেশতাত্ত্বিক হইয়াছিলেন। সেই যোগ্য বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীতিমান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাহার হস্তে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে তাহার ধর্মের জন্য ত্যগ বীর্যকর করেন, তাহার কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হস্তেন মন সকলী ঈশ্বরের সমর্পণ কর। না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের ধারাই তাহাকে লাভ করা বায়। ধর্মের জন্য ত্যাগ বীর্যকর করিতে কৃতজ্ঞ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মণদের হস্তে ব্রাহ্মণর্বাঙ্গন প্রাণগণে রোপণ করিবে।

"এক্যে তুমি আপনার আমাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্র কর। সেই জগতঢাকিতা পরমদেবার বর্ণিয় শক্তি ধান কর, বিনি আমাদিগকে বুদ্ধিরিতী সকল প্রশংসিত করিতেছেন।

"ঈশ্বর তোমাকে এক্ষেত্রে আপনার অমৃতসিদ্ধি অভিষিক্ত করিতেছেন। তাহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।"
এই ব্রাহ্মণ-ধর্মঃগ্রন্থে গ্রহণ করে। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাত্ত হইয়া, তথাপি ইহার একটি মৌচার সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শূন্ত হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অস্ত্র হইবে না। যে প্রকারে পূর্বের অমিয়োত্রীয় অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে তত্ত্ব রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মণ! তোমার অধ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্যের প্রতি অনুকুল হইয়া। ইহার কথা গ্রহণ সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মণের অবশেষে গৌরবব্যত্যঃহইবে।

( ৩ )

কিন্তু মহবিরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের এই প্রগ্রাঢ় মস্তিসের সম্প্রদায় সেন্নতে উভয়ের মধ্যে ক্রমে গুরুতর মতভেদ দাড়াইয়া গেল। মহবির ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটা ধর্মসাধনের কেন্দ্র করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে কোনো একারের সাংবাদিক বিখ্যাতি অনন্যন করিতে চাহেন মাত্র। কেশবচন্দ্র এবং তাহার অনুশীলন জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন সাধনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ হয়েন। ইহারা সকলের আগে প্রচলিত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে চায়। জাতিভেদের চিহ্নিততর উপবীততাত্ত্বিক এই সংস্কৃত ধর্মের বিরোধে বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের উপবীত পরিভাষা করিয়া আরম্ভ করেন। ১৮৫০ ইংরাজিতে কেশবচন্দ্রের উচ্চে সংগঠন সভা” নামে একটি নূতন সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় রাজ্যদের ধর্মজীবন গঠন সম্বন্ধে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত। এই আলোচনা-বিষয়ের তালিকায় “উপাসনা, আচার্য্যরীতি, আচার, নিষ্ঠা, সত্য বাক্য, পৌষলিকতা, পবিত্রতা, কর্মক্ষমতা, বৈষাদশী, বৈষম্য, অগ্নিসার” প্রভৃতি একুশটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। “সভায়”র কার্য্যবিধিতে লেখা আছেঃ —
"যে কর্ম উচিত বলিয়া বোধ হইবে, তৎকালীন তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিবে, সকল তাগ বীকার করিবে, কোন ধরণাকে যত্ন বোধ করিবেন।" "যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অপ্রকার দেখায়, সেই আত্মাপারী চৌর কর্ষক কি পাপ কৃত না হয়।" "কেবল বাহা পৌর্ণিমিকতা যে অবাক্রান্ত নিষেধ করিতেছেন এমত নহে, ইহা পরিযাগ করাও সহজ, অধ্যাত্মিক পৌর্ণিমিকতা। অতীব ভয়ানক। বিষয় স্থায়িভিত্ত, মানাকালীন, কাম-ক্রোধ-লোভ-যত্ন-ইত্যাদি। প্রভৃতি প্রবৃত্তিকলনের শরণাগত অনুসরণ দাস হইয়া তাহাদের দেখা ও উপাসনা করাকে অধ্যাত্মিক পৌর্ণিমিকতা বলে।" "অভর্ষ্পকতা হইতে মুক্ত হওয়াই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া।"

এই সকল আলোচনার ফলে দলে দলে ব্রাহ্মণ যুবকেরা প্রচার সমাজের সঙ্গে সকল প্রকারের সম্পর্ক কাঠিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক পরিবার পরিচর্থন এবং বিষয়া সম্পত্তি পরিবার করিয়া পথের ভিক্ষৃণ হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অশেষ প্রাক্তানের শারীরিক নির্ণয়তন সহজ করিতে আরম্ভ করিলেন। এতদিন পৃথিবী ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্যক্তিগত ভাবেই ব্রাহ্মণগণ করিতেছিলেন। এখন অদ্যাৎ উৎসাহ সহকারে সমাজ-সংস্কারবাদ গঠন করিলেন। শ্রীশ্রী প্রচার, বিধবা, বিবাহ এবং অস্বর্ণ বিবাহ প্রচলন করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহর্ষির প্রক্ষণিত রক্ষণশীলতাতে আঘাত পড়িল। প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্রের প্রতি রেহর্পরবশ হইয়া তিনি নবীন ব্রাহ্মণগণের এ সকল সংস্কার চেষ্টা সম্পর্কে যাইতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে আর সহিতে পারিলেন না। এতদিন পৃথিবী ব্রাহ্মসমাজের কার্যালয়ে মহর্ষির অন্তঃপ্রতিক্রিয়া একদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবীন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মসমাজের কার্যকে ব্রাহ্মসাহায্যের মতামতাজী পরিচলন করিবার জন্য এক ব্রাহ্ম-প্রতিনিধি সভায় প্রতিষ্ঠা।
করিলেন। ছোট বড়, মূলক ও বুদ্ধ রাক্ষসমাজের কার্য পরিচালনায় প্রত্যেক রাক্ষসের সমান অধিকার, এই গণভূমি অন্তর্ভুক্ত উপরে ঈহারা রাক্ষসমাজকে গড়ে তুলিয়া জন্ম উঠাত হইলেন। মহর্ষির একাধিপত্য নদ হইবার উপক্রম হইল। যে সকল রাক্ষস কেবল ধর্মসাধনের কেন্দ্রেই রাক্ষধর্মকে আবঙ্গ বাধাতে চাহিয়াছিলেন, হিন্দুসমাজের সঙ্গে কোনও প্রকারের বিরোধ বাধাইতে চাহেন নাই, তাহার। নবীন রাক্ষসদিগের উভয়ে শক্তি হইয়া উঠিলেন। মহর্ষির রক্ষণশীলতাকে অত্যন্ত করিয়া ঈহারা রাক্ষসমাজের মধ্যে একটা বিরোধের অস্থি করিতে লাগিলেন। মহর্ষির রাক্ষসমাজের টুঢ়া ছিলেন। কলিকাতা রাক্ষসমাজের সকল সম্পত্তি তাহার তহবিলাধানই হইত ছিল। উপরিতলে রাক্ষসমাজের আচার্যা ও অধ্যায়া কর্মচারী নিয়োগের অধিকার তাহার হাতেই ছিল। তিনি সে সকল অধিকার মাঝখানে রাক্ষস প্রতিনিধি-সভার হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন আবার সে অধিকার নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। উপবীতধারী রাক্ষস রাক্ষসমাজের আচার্য থাকিতে পারিবেন না, নবীন রাক্ষসের এই প্রস্তাব অনুমলন। মহর্ষি সম্পূর্ণভাবে ঈহার সায় দিতে পারিলেন না। উপবীতধারী রাক্ষসকে তিনি রাক্ষসমাজের আচার্য পদে বরণ করিলেন। ঈহার ফলে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন রাক্ষসগণ আদি রাক্ষসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়া। ভারতবর্ষীয় রাক্ষসমাজ নামে এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে এই ভারতবর্ষীয় রাক্ষসমাজই বাংলা দেশে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটা প্রবল চেষ্টা জাগাইয়া তুলিলেন।

মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে আদি বা কলিকাতা রাক্ষসমাজে স্থায়ীতার সংগ্রামটি ভাল করিয়া। ফুটিয়া উঠে নাই। মহর্ষির চরিত্র, সাধনা এবং বৈষ্ণব পদপঞ্জাবীর প্রভাবে সেখানে ব্যক্তিত্বমূলক ভাল করিয়া।
নবফুলের বাংলা

মাথা তুলিবার অবসর পায় নাই। মহর্ষী ব্রাহ্মণসমাজের সমুদয় ব্যক্তির বহন করিয়ে। কখনও কখনও বিপরীত ব্যক্তিগত অন্যের অবদান রাখিয়া রাখিতেন। একসময় কারণে ব্যক্তিগত সাধারণত, সমাজ পরিমাণে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি ধর্মসাধনেও প্রতীক সাধকের সাধারণ যুক্তি যে সত্যসত্য নির্ধারণের একমাত্র কঠিনার্থের, ইহাও ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পায় নাই। বেদান্ত প্রাচীন শাস্ত্রের গ্রামাণ্য বজ্রন করিয়া। মহর্ষি তুঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্ম প্রশ্নানার্থকে ব্রাহ্মণ সাধকদের শাস্ত্রনুস্মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রপ্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ-সমাজের আচরণ পদে বর্ণ করিবার সময় মহর্ষি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে ইহার সম্পন্ন গ্রামাণ্য পাওয়া যায়।

"যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার (অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের) একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষ সাগর শুক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যমাত্র অস্থূল হইবে না।"

এখানেই মহর্ষি তুঁহার ব্রাহ্মধর্ম প্রশ্নের কিছু চক্ষে দেখিতেন, ইহার পরিচিত পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিবেকের সাধারণত অনেকটা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই ব্যক্তিগতত্ব পরিপূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই ব্যক্তিগাত্রের অভিধানের প্রাতি লক্ষ্য করিয়াই সে সময়ের খৃষ্টীয় পাদরী ডাইসন (Dyson) সাহেব কহিয়াছিলেন যে ব্রাহ্ম-ধর্ম আর কিছুই নেহ—কেবল conjugation of the verb to think মাত্র; অর্থাৎ I think, we think, thou thinkest, you think, he thinks, they think—মাত্রই নাম ব্রাহ্মধর্ম। এককথায় প্রতৰ্য ব্যক্তির বিচার-বুদ্ধি ব্যতীত এই ধর্মের আর কোন প্রামাণ্য নাই।
কথাটি সম্পূর্ণরূপে সত্য ছিল বটে। কিন্তু যে কালে জগতের সকল ধর্মেই মানুষের বিচার বৃদ্ধিকে শাস্ত্রের বন্ধনে একোনোর বাধিয়া। রবিরাম ছিল, সে সময়ে ব্যক্তিগত বিচার-রুদ্ধির সাধনাযার প্রচার করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছিল, ইহাও মনিতেই হইবে। এদেশে এই শাস্ত্রানুগত্তের ফলে ধর্মসাধনের সঙ্গে সাধনের আধ্যাত্মিক অনুভবের একটি বিপ্লব ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্যবধান নিবন্ধন লোকাল্প ধর্মের শক্তি ও সজ্জীবত। নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম মানুষকে মনুষ্যমূহের উচ্চতম শিখ্রে তোলা। দুই থাকিয়া, নানা হিসেব মনুষ্যহইতে বক্তিতে করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিতে উদ্যোগ হন, তাহা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই ব্যক্তিগতমূল্য স্বাধীন ব্রাহ্মমালোর জীবনে ধর্মকে কেবল একটি খেয়ালরূপেই গড়িয়া তুলা নাই, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাযায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহারা নিজে বাহু সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহার জন্য প্রচু, বিশেষজ্ঞ দিতে সর্বদাই প্রশ্ন ছিলেন। কত দারিদ্র্য, কত বিষয়ক, আত্মীয় অজ্ঞনবচের সঙ্গে কি দুর্বলবহ বিচেদ-যাত্রা, ইহাদিগকে নিজেদের মতবাদের জন্য সহ করিতে হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে এই সকল স্বাধীনতার সাধনার প্রতি অন্যর অন্তঃভাবের অবমত হইয়া পড়ে। এ বেলা ছিল না। ইহারাই বাংলা দেশে স্বাধীনতার জন্য অসাধারণ ত্যাগের শক্তি জাগাইয়া তুলেন।
ষষ্ঠ কথা

ব্ৰাহ্মণসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

প্রথম অধ্যায়

ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাংলার নবাধিকৃত সমাজে যে স্বাধীনতার আদর্শ জাগিয়া। উঠে, ব্রাহ্মণসমাজই সর্বপ্রথমে সেই আদর্শকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরবরাহে গড়িয়া তুলিয়া চেষ্টা করেন। এই কারণেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব একটা বাড়িয়া। উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণসমাজের মতবাদ যে বেশী লোকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ যে পরমার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন, দেশের শিক্ষিত সাধারণে এই সাধনার মূল্য ও মর্যাদা যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এ কথাও বলা যায় না। ফলতঃ সে সময়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে অসংখ্য যুক্তিবাদ এবং সন্দেহবাদই বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। বাঁহারা একটা বাড়িয়া করিতেন না, ভাবারাও উপাসনা ও প্রার্থনার অর্পণকারী স্বীকার করিতেন না। ধর্মসম্বন্ধে অনেক লোকই নিভান্ত উদাসীন ছিলেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণসমাজের বিশিষ্ট মতবাদের উপরে শিক্ষিত জনসাধারণের যে খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল, এমন বলা যায় না। অথচ ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি সাধারণভাবে প্রায় সকল শিক্ষিত লোকেরই গভীর সহায়তার দেখা যাইত। আর এই সহায়তা তর্কের মূল কারণ, ব্রাহ্মণসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়েই এই স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সেকারা ইঞ্জিও-নবাবের হিন্দুধরমের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন। দেবদেবীর উপাসনাকে এবং বিশেষভাবে প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে মিথ্যা এবং মানুষের উত্তরায় বলিয়া বিখ্যাত করিতেন। এই সকল কুসংস্কারের জন্য আমরা যুরোপীয়দের মতন সাংসারিক অভ্যাদয়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়া পারিতেছি না, অনেকেই এই ধারণা ছিল। এই সকল কুসংস্কারের জন্যই আমরা তুলনিয়া ডাঁড়াইলে হয় হইয়া রহিয়াছি, প্রায় সকল ইঞ্জিওবীর ইহা বিখ্যাত করিতেন। স্ত্রীতাং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিকৃত্তে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন, তখন বাঙালিক সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই তাহার পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন। মহর্ষি যখন বাঙালিসমাজের বেদী হইতে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসারপাপ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন আমরাকে তাহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আসারাহার প্রতিষ্ঠাতার সহকারে সে সময়ের যুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং দার্শনিক চিন্তার প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। অক্ষয়কুমার দত্ত নামে মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তাহার নেত্রের জোঁক বৈজ্ঞানিক অভ্যাদয়-বাদের দিকেই বেশী ছিল। এই জোঁকটা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে মহর্ষির সঙ্গে তাহার প্রকাশ মত-বিরোধ হয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধালীর জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সে সময়ে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল বাঙালীর নিকটে এই এক আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পূণ্যশ্রোত বিষ্ণুপুরুষ, উদারমতী দার্শনিক বিদ্যাভূষণ এবং মন্ত্রী সংগ্রাম শাস্ত্রী ও চিন্তানায়কের। প্রায় সকলেই ‘তত্ত্ববোধিনী’ এবং মহর্ষির ব্রহ্ম-সমাজের সঙ্গে সংঘটিত গঠিতভাবে সংঘটিত ছিলেন। তাহারা।
সকলেই প্রায় প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশভাবে না দাঁড়াইলেও ভিতরের ভিতরে অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। আর এই জন্মই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাইহার একটা সহায়কমূল্য জমিয়াছিল। কিন্তু মহব্বরের নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মীনতার সংগ্রামটা কেবল আরম্ভ হয় মাত্র; এই জন্ম যে সকল শিক্ষিত যুবকরা ব্রাহ্মীনতায় নামে মাত্যো। উঠিয়াছিলেন মহব্বর ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

এই ব্রাহ্মীনতার সংগ্রাম পরিপূর্ণমাত্রায় বাধিয়া। উঠে কেশব চন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে। আর এই সংগ্রাম প্রথম বাধে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেই মহব্বর এবং কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মীনগদের মধ্যে।

তিন কারণে এই বিরোধটা বাধে। প্রথম, মহব্বর ধর্মসাধনের সংস্কৃততা; দ্বিতীয়, মহব্বর ধর্মসাধনের একদেশদর্শন; তৃতীয়, ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য-পরিচালনায় মহব্বর একত্রিত বা autocracy।

মহব্বর দেবেশ্বরনাথ ব্রাহ্মসমাজকে কেবল বুদ্ধপ্রাসাদের মধ্যেই কার্যতঃ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম মতবাদকে জীবনের সকল কর্ম এবং সকল সম্ভবের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এ ভাবটা তখনও ব্রাহ্মসমাজে প্রবল হয় নাই। কেশবচন্দ্র এবং তাইহার বঙ্গোপগ্রস্থ ব্রাহ্ম মতবাদের আদর্শ বুদ্ধ বাজিয়া মজ্জা বাজাই। তুলিবার জন্য যাতে হইয়া উঠিয়াছে।

তাইহার কহিলেন, বুদ্ধ-মন্দিরে আসিয়া বুদ্ধপ্রাসাদের সময় এক কথা কহিব এক ভাবের অনুশীলন করিব, যেমন মনে এক আদর্শের ধ্যান করিব, আর মন্দির হইতে ফিরিয়া। বাড়া যাইয়া পরিবারে এবং সমাজে অন্যরূপ আচার আচরণ করিব, ইহা সম্ভব নহে। ইহাতে সত্যের প্রতি সমাজ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় না। যাহাতে সত্য বুঝিব তাহাজীবনের সর্ববিধ ব্যাপারের মানিয়া চলিব। অন্যদের ধর্মবুদ্ধি বা বিশ্বাস বা conscience
ধর্ম ও সাধারনতার সংগ্রাম—প্রথম অধ্যায়

অনুষ্ঠানের সমাপ্ত জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মণ ধর্মের সত্য আদর্শ। এই লইয়াই মহির সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে। কেশবচন্দ্র এই বিরোধ সম্বন্ধে তাহার ইংরাজী পার্থিকপত্র 'ইন্ডিয়ান মিউনিয় লেখেন যে ব্রাহ্মণভূক্তের প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল কেশবচন্দ্রের যুদ্ধ। এই সংগ্রামে প্রথম রামমোহন এবং পরে দেবেন্দ্রনাথই সেনানায়ক ছিলেন। ব্রাহ্মণভূক্তের 'দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ।' বিবেকের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই—

“সঙ্কীর্ণ ভারতীয়লীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পূর্বতন অভ্যন্ত ভাবের সহিত নৃত্য নৃত্য ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রাহ্মণ লইয়াই সম্ভবত রহিলেন; কিন্তু কয়েকজন সেই জীবন পরিধান করিবার জন্য নূতন প্রতিশ্রুতি ও ব্যাকুল হইলেন। তাহারা বলিলেন, কেবল সম্প্রতিক একবার সামাজিকভাবে উপস্থিত করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের 'জীবনে আপন বিশ্বাস অনুমোদন কর্ষ্যায় মিশ্রণ করিয়া সম্প্রতির ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। রূপের অভিপ্রায় অন্যতম বিবেকের পরম্পর ভিত্তি কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্যাদিগণ বিবেকের অনুমোদন হওয়া উচিত। প্রথমে বুদ্ধিবাদিগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, তাহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।’

এই বিরোধের দ্বিতীয় কারণ, মহির ধর্মের আদর্শের সঙ্কীর্ণতা। মহির ব্রাহ্মণভূক্তের হিন্দুধর্মের অন্তরূপ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণ কোনও বিশেষ ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বরগুরুত্বের কিছু ধর্ষের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রহণ বলিয়া মায়াকার করেন না। সত্য ভিন্ন এই ধর্মের অন্য কোনও প্রামাণ্য নাই। বৈষ্ণবগণ গুণোপত্ত সত্য আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। তাহাকেই মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতে
হইবে। কিন্তু কার্যতঃ মহবির হিন্দুধর্ম হইলে ভিন্ন অথবা কোনও সাধা স্পর্শ করে না। নবীন ব্যাপারে এই সৃষ্টির তাত্ত্বিক প্রতিবাদ করেন। ইহাও মহবির সঙ্গে তাহার বিরোধের একটা কারণ হইব। উঠে।

বিরোধের তৃতীয় কারণ, ব্রাহ্মসাজের কার্যা-পরিচালনায় মহবির অবদান প্রতিদিন একাধিকটা। মহবির ব্রাহ্মসাজের গৃহের ও অন্যান্য সম্পত্তির ‘টাইষ্ট’ ছিলেন। ব্রাহ্মসাজের ‘টাইষ্ট-পত্র অমুসারে ‘টাইষ্ট’ হিসাবে মহবিরের উপরেই সাজের কর্ষণচারী নিযোগের ভার শেষ ছিল। ব্রাহ্ম-সাধারণের এ সকল বিষয়ে আইনতঃ কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু বিরোধ বাধিবার পূর্বে কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহবির ব্রাহ্মসাজের প্রতিনিধি-সভা গঠন করিয়া, তাহারই হস্তে ব্রাহ্মসাজের সকল কার্যাবলী অর্পণ করেন। বিরোধের সৃষ্টিতে হইলে তিনি প্রাচীন ব্রাহ্মসাজের পরামর্শ নবীন ব্রাহ্মসাজের এই অধিকার কাজ। টাইষ্টরূপে ব্রাহ্মসাজের সকল কর্ষণ নিজের হাতে গ্রহণ করেন। মহবির এই একত্রিত বিরোধের তৃতীয় কারণ হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

“বাহিরে দেখিতে কলিকাতা ব্রাহ্মসাজের কর্ষণচারীর সমাজ-গৃহের টাইষ্ট মাত্র। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার সমাজের ব্রাহ্মচন্দ্র অধীন ও নিয়মক। মানবাত্মাগুলিকে শাসনাধীন করিবার জন্য তাহারা রাজতন্ত্র গঠন কর্ষণ অবলম্বন করিয়াছেন। এরুপ বাপার আমাদিগের বিবেকের নিকট অতি উদ্ভিদকক। সাধারণের আর এরুপ ভাব এখন স্থির করিতে পারেন না। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বোঝান প্রয়োজন হইয়াছে যে কলিকাতা-সমাজের বন্দ্যোপাধ্যায় মণ্ডলীর সহযোগে প্রবর্তন কর্ষণ করে না। উহা এখন জন-কয়েক ব্যক্তির মাত্র যে অন্যে উহা আপনাকে গঠন করিয়া।
তুলিয়াছে, সেই অস্ত্রী এখন আমরা উহাকে ভগ্ন করিব।........
একপক্ষের একাধিপত্য অন্য পক্ষের শৃঙ্খলমুক্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে।........

কেশবচন্দ্র এইরূপে তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া। বাংলার শিক্ষিত সাধারণের বর্তমানে আমাকে অপ্রত্যক্ষ সম্মান করেন। বিশ্ব প্রবন্ধে তিনি কহেন যে “কলিকাতা সমাজ (আমরা এখন যাহাকে আদি সমাজ কহি, আদিতে তাহাই কলিকাতা সমাজ নামে অভিহিত ছিল) মানবের ব্যক্তির আদর্শকে একটা কথার কথায় পরিণত করিয়াছে।”

বিরোধের সকল কারণগুলির সমাহার করিয়া উপসংহারে কেশবচন্দ্র কহেন :—

“কলিকাতা সমাজ এইরূপে ঐশ্বর্যের ধর্মকে সংসারের ধর্মে করিয়াছেন; সমগ্র মানবজাতির উদার ধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম করিয়াছেন; বিবেকের প্রলেপ ফলাফল চিহ্ন, বীরত্ব ও ঐকান্তিকতার প্রধান চাঙ্গল্য, ভীরুতা ও কপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন; সত্যকে সংসারের দাস করিয়াছেন, এবং ঐশ্বর্যের মন্দিরে ঐশ্বর্যের নামে ধনের সম্প্রসারণ বেদী স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের কথা প্রায়শ্চিত্ত করা সমৃদ্ধি, অথবা যথা বিশ্ব ঘটিবে। সত্যকে কখনও কেহ দাসত্বে বদ্ধ করিয়া রাখিতে সমস্ত হইবে না, উহা সমুদয় শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া স্বাধীন হইবেই হইবে।”

কেবল ব্রাহ্মসেনের ধর্মসাধন বা ধর্ম-সিদ্ধান্ত লইয়া এই বিরোধ উপস্থিত হইলে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই বিরোধের ফলাফলের কোনও ফাযর্ড ধারিত না। তাহারা এ বিষয়ে কিছুত্তর মনোনিবেশ করিতেন না। আর এই সংগ্রামের সোনাগরের কেশবচন্দ্র তাহাদের চিন্তাকে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন না।
ক্ষুদ্র সংখ্যক ব্রাহ্মণেরা ইহাকে একটা ধর্মী-সংগ্রাম বলিয়া মনে করিলেও, দেশের শিক্ষিত সাধারণের এই বিবাদকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র নিজেও ইহাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়াই প্রচার করেন। মহর্ষির দল ছাড়িয়া যাইয়া কেশবচন্দ্র স্পষ্টে লোকমত গঠনের জন্য ইংরাজীতে ‘ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এই নাম দিয়া এক স্বদীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় কোনও কোনও বাঙালী পাদরী উপস্থিত ছিলেন। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের নেতৃত্বাধিকারী ঝুঁকির প্রধান পুরুষের নামও বক্তৃতার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজের একজন দিগন্তের মিত্র, অপর মহেশ্বর লাল সরকার। ইংরাজের কেহই শ্রদ্ধা ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের মত-বিরোধে ইংরাজের কোনই ইটানিফ ছিল না। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর। সকলেই যেমন দেশপ্রাপ্তির কুসংস্কার এবং সমাজনীতির বিরোধী ছিলেন, ইংরাজের সেই রূপ সংস্কারের কল্যাণ কামনায় যাত্রাতে সত্য ও স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষী যাবতীয় রাত্রিনির্মাণ নিহত হয় সর্বাধিকক্ষেপে তাহাই চাহিয়াছিলেন। সরকার মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যেখান না দিয়াও জীবনের শেষঃ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরবাসীর চিন্তা ও চরিত্রকে সত্য ও স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। মিত্র মহাশয় অন্য দিকে প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েশনের অন্তর্গত অধিনায়কের পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঈশ্বরবাসীদের অধিক বিস্তারের জন্য সাবধান চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজ উভয়েই নিজে নিজ ভাবে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। আর এই সময়ই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে যখন এই স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া। উঠিল তখন দেশের শিক্ষিত সাধারণের কাছে ইংরাজের কেশবচন্দ্রের পক্ষে সমর্পন করেন।
( ২ )

ফলতঃ সে সময়ে কেশবচন্দ্রের সকলের চিত্ত ও চরিত্রকে স্বাধীন ও উদার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ ইংরাজীর নভেম্বর মাসে নবীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া এক নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহ সময়ে শিক্ষিত বাঙালীর স্বাধীনতার আদর্শকে সাকার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্যকাল বিশুদ্ধ মতবাদ গঠন ও প্রচার করিয়াই কান্দ থাকেন নাই; সাধারণ ভাষায় নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী চরিত্র গড়িয়া তোলা, এবং পরিবারের এবং সমাজের সকল সম্প্রদায়কেই নিয়ন্ত্রিত করা—ইহাই তাহার ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সর্বাঙ্গীন ধর্মের মূলসূত্র হইল, সত্য ও স্বাধীনত। নিজের বিচার রুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, প্রাণপণ করিয়াও তাহার অমূল্য করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও গ্রহণ করুক, কোনও পুরাচিত সম্প্রদায়, বা সমাজের অধিনায়ক শ্রীকার করিলে চলিবে না, তাহার ধর্মহানি হইবে। ইহাই কেশবচন্দ্রের নতুন ব্রাহ্মসমাজের মূলসূত্র হইল। এই মূলসূত্র স্বাধীনতার মন্ত্র। এইজন্যই বহুতর শিক্ষিত বাঙালী এবং ভারতবাসী ব্রাহ্ম মতবাদ বা ব্রাহ্ম সাধন গ্রহণ না করিয়াও সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইভাবে সেকালের শিক্ষিত লোকমাত্রই ব্রাহ্মভাবী ছিলেন।
কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের বাহিনীতেও এই সংগ্রাম ঘটণা করেন। প্রকাশ্যভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু নানা দিক দিয়া অপরূপভাবে যেদিনের আত্মামর্যাদা বোধ জাগাইয়া যুদ্ধ করেন। প্রথমতঃ তাহার অলোকসমাজ মনীষা এবং বাংলা দেশের লোকের হীনতা-বোধ নষ্ট করিয়া দেয়। সেকালে ইংরেজী বিদ্যারই একাধিক ছিল। ইংরাজী বিদ্যা প্রতিষ্ঠা করিলেই বিদ্যানর্থী ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের লোকসমাজে সমাদর পাওয়া যাইত। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। তাহার মনীষা এবং বাংলা। ইংরাজসমাজে পর্যাপ্ত বিনিময় করিয়া তুলে। ইংরাজী ভাষায় উপরে কেশবচন্দ্রের যে পরিমাণ দখল ছিল, অনেক ক্ষুদ্রবিদ্যা ইংরাজের ও পঞ্চ ভাষা ছিল না। দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজপুত্রের। পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের বিদ্যারত্ন ও বাংলার মন্ত্রমূর্তি মতন হইয়া যাইতেন। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙালীর অত্যন্ত পরিবর্ধন বোধ জাগিয়া উঠিল। এই অত্যন্ত পরিবর্ধন বোধ জাগাইয়া সকল দেশাভিতর প্রথম সূচনা হয়। কেশবচন্দ্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নায়ক না হইলেও, এই দেশান্তর্ভে সে সময়ে বিশেষভাবে জাগাইয়া তুলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মাঝে কয়েক পূর্বের কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ-থিয়েটারে কেশবচন্দ্র ‘ষিদুখুটী—যুরোপ ও এশিয়া’ এই নাম দিয়া। এক ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই এক বক্তৃতাতেই দেশের চিন্তানায়কে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার মূলকথা ছিল যুরোপ। এক তোমরা তাহার খুটাই বলিয়া। পরিচয় দাও, তাহারা অনেকেই যিনি বিশ্বকোষের চরিত্রের অসুসন্ত কর না। যিনি বিশ্বকোষের শিক্ষা, তোমাদের চরিত্রে;
ফলিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয় কথা, বিশ্বগুম্র এশিয়ার লোক ছিলেন। এশিয়ার সাধনা এবং সত্তার মূলগত বিনয়, সদ্ব্যাপার, সর্বজিবে মেঠো এবং আধ্যাত্মিক উপরেই বিশ্বগুম্রের জীবনের ও ধর্মের পূর্বপ্রতিষ্ঠা। এই সকল আদর্শ প্রবল পরাক্রমে যুগোসালী জাতিদের মধ্যে ভাল করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। বিশ্বগুম্রকে বুঝিতে হইলে এশিয়ার সত্যতা ও সাধনার প্রতি ঘর্ঘা লাভ করিতে হইবে। এশিয়াকে সংসার চক্ষে দেখিলে বিশ্বগুম্রের জীবন ও চরিত্রের প্রতি মর্যাদা দেখান হয় না। এই বক্তৃতা দিয়া কেশবচন্দ্র কেবল ভারতবাসীদের নহে, কিন্তু ইরানীদেরও শিক্ষকের অসন এর্যহ করিলেন। ইতিপূর্বে এভাবে কোনও বাঙালী দেশের রাজপুরুষদিগকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই। আর যে ভাব কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতাটি দেন, তাহাতে ইংরেজ খাতুন্নারা। ভিতরে ভিতরে বাঙালীর মুখে এ সকল কথা শুনিয়া যতটাই অবমাননা। বোধ করিয়া না কেন, মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার উপযোগী তাহাদের ছিল না।

সমসাময়িক ঘটনার আলোচনা করিলে মনে হয় যে কেশবচন্দ্র স্বভাবের সমান রক্ষা করিবার জয়ই এই বক্তৃতা দিতে উদ্যত হন। ইহার কিছুদিন পূর্বে আর, যে মনক্রীফ নামে এক বিলাতী সোফিয়া বাঙালী চরিত্রের উপরে অথবা আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি বাঙালী পুরুষদিগকেই শ্রদ্ধ, জ্ঞানচারী ও প্রবঞ্চক বলিয়া কৃত্য রহন নাই, আমাদের দেশের সহিলদিগের উপরেও অথবা আক্রমণ করেন। ইহার ফলে স্বদেশী ও বিদেশীদিগের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ জনিয়া ওঠে। উত্তরপক্ষের সংবাদপত্রের সাহায্যে এই আগুন দেশময় ছুড়াইয়া পড়ে। কেশবচন্দ্র মনক্রীফের বক্তৃতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার এই বক্তৃতা প্রদান করেন।
In handling this rather delicate part of my subject, I must avoid all party spirit and race antagonism. I stand on the platform of brotherhood and disclaim the remotest intention of offending any particular class or sect of those who constitute my audience, by indulging in rabid and malicious denunciation on the one hand and dishonest flattery on the other.”

"In handling this rather delicate part of my subject, I must avoid all party spirit and race antagonism, I stand on the platform of brotherhood and disclaim the remotest intention of offending any particular class or sect of those who constitute my audience, by indulging in rabid and malicious denunciation on the one hand and dishonest flattery on the other.”

"In handling this rather delicate part of my subject, I must avoid all party spirit and race antagonism, I stand on the platform of brotherhood and disclaim the remotest intention of offending any particular class or sect of those who constitute my audience, by indulging in rabid and malicious denunciation on the one hand and dishonest flattery on the other.”
Shogal’s education is partial, Shogal’s life is sparsely lived, and so on. Further—As a fox a native should always be distrusted, and treated with contempt and hatred. As the English have infected the Bengali with ‘dread’—as we see. But, English education teaches the child that the native is an inferior, that the language is inferior, that the culture is inferior, and the like. English education teaches that the native is a Second-class citizen, and his life is a shadow of the Englishman’s life. ‘Once out of temper he rants and raves, and inflicts the most cruel and barbarous torture on his enemy to gratify his ire and is even sometimes so far carried away by his passions as to commit the most atrocious murder.’ Further, the English have infected the Bengali with ‘fear’—as we see. ‘This fear, be it said, is not the fear due to a superior nature but that which brutal ferocity awakes.’ Further, the English have infected the Bengali with ‘shame’—as we see. ‘We are a subject race and have been so for centuries. We have too long been under foreign
sway to feel anything like independence in our hearts. Socially and religiously we are little better than slaves..... Under such circumstances all the higher impulses and aspirations of the soul must naturally be smothered, and hence it is that though educated ideas rebel, and organised communities of enlightened men often protest, the general tenor of native life is a dead level of base and unmanly acquiescence in traditional errors.”

( ৪ )

বিগত পণ্যশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী যে স্বাধীনতা-মন্ত সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্র সেই মন্ত্রের একরূপ প্রথম দীক্ষা ছুঁয়া। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিউজিরটেন্ডার সাধনে ও রাষ্ট্র-ত্যাগে ফরাসিসের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডেও পিউরিটানদের সাধন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদের মূলেও হিউজিরটেন্ড এবং পিউরিটানদের সাধন দেখিতে পাই। আমেরিকার রাষ্ট্রের মূলেও হিউজিরটেন্ড এবং পিউরিটানদের সাধন দেখিতে পাই।

আমদের সমকালে রুশের রাষ্ট্রত্ব স্বাধীনতার সংগ্রামও বহুলপরিমাণে টলস্টোয়ের শিক্ষা এবং আদর্শকে অপরাধ করিয়া জাগিয়া উঠে। যেখানেই জাতীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা হইয়াছে, সেইখানেই তাহার গোড়ায় একটা ধর্মের প্রেরণ জাগিয়াছে। এবং এই ধর্মের প্রেরণায় মানুষ আগে ভিতরের বাঁধন কাটিয়াছে, নিজের চিন্তা ও চিন্তকে বাহিরের বক্ষমূক করিয়াছে, পরিবারে ও সমাজে এই স্বাধীনতার আদর্শের গোড়ায় তুলিতে গিয়াছে, এবং পরিণামে এই
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থদৃঢ ভিত্তির উপরেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে যে দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। পরিবারে এবং সমাজে যে আপনার বিচারবৃদ্ধি এবং বিশ্বাস অনুসারে চলিতে বিয় পায়, সে কখনও নির্ভার হইয়া। একতম রাজশক্তির সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেবল সাংসারিক হৃদ সুখবিধা যেখানে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল প্রকরণ হইয়া রহে, সেখানে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে কদাপি জয়যুক্ত হইতে পারে না। যেখানে জয়ভূক্ত হয়, সেখানে দেশের জনসাধারণের এক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া। অপর অধীনতাতে যাইয়া, 'শ্বয়ের উপর দাড়াইতে পারে না। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রকরণ লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশ্লেষ, উদার এবং অপরাজেয় হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে কেশবচন্দ্র এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দেখিতে পাই।

(৫)
কেশবচন্দ্র বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাক্ষাৎভাবে রাজ্য পরাধীনতার শৃঙ্খল ভঙ্গিতে চেষ্টা করেন নাই, একথা সত্য। কিন্তু সে সময়ে রাজ্য বন্ধনের বেদনা লোকে অন্যভাব করিয়ে আরম্ভ করে নাই। বন্ধনের বেদনা যেখানে নাই, মুক্তির বাসনাও সেখানে জাগে না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ইংরাজের শৃঙ্খল আমাদের গলায় বাধে নাই। প্রচলিত হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ডের এবং জাতিভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ও হেংমাগুচ্ছারী সমাজের 'কাঠার রজ্জুক্তাই
নবযুগের বাংলা

আমাদিগের গলায় এবং হাতে ও গায়ে বড়ই বাজিয়া উঠিয়াছিল।
এইখানেই বন্ধনের বেদনা জাগিয়াছিল। পৌরাণিক দেবদেবীতে
বিশ্বাস নাই, অথচ তাহাদিগের নিকটে মাথা নোয়াইতে হইত;
ব্রাহ্মণের অতিপ্রাকৃত অধিকারে আস্থা ছিল না, অথচ পরিবারের
শাসন-ভয়ে পৃথিবীর আনন্দশালিতে বামুন ডাকিয়া মন্ত্র পড়িতে
হইত। সংস্কৃত জ্ঞান বা শাস্ত্রজ্ঞান তখনও জ্ঞান নাই, স্ত্রীঘট
না পুরোহিতের, না ব্যজ্ঞানের, কাহারও মন্ত্রের অর্থবোধ ছিল না,
অথচ জ্যৈষ্ঠাদিবীর মতবন এ সকল অর্থগুলি শস্ত্র আরুণ্ডি করিতে হইত।
এই সকল ব্যাপারে বিচার বুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। এই আঘাতের
তাড়নাতেই মন বিলোলী হইয়া উঠিল। বাঁহার। সমাজ-ভয়ে এ সকল
অসম্ভাবে করিতেন, তাহারাও মনে মনে অতিশয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।
সত্যধর্মের প্রবণা, বিশ্বাস ও ভক্তি। বিশ্বাস বিচার বুদ্ধির দ্বারা
সম্পর্ক হইলেই সত্য ও শক্তিশালী হয়। এখানে তাহা হইত
না। সমাজে জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইত। অথচ নবাবশিষ্টদের
লোকের কিছুতেই বিচারবুদ্ধি কিন্তু নিজের বর্ণন্ত্রুদ্ধ দ্বারা
এই কৃত্রিম সামাজিক ভেদবদকে সত্য বা কল্যাণকর বলিয়া
মানিয়া লইতে পারিতেন না। এই জাতিভেদ মানিতে যাইয়াও
তাহাদের অন্তরে গুরুতর আঘাত লাগিত। বাঁহার। মানিতেন
তাহারাও নিজের কাছে নিজে অত্যন্ত খাটো হইয়া থাকিতেন। আর
নিজের কাছে নিজে খাটো হইয়া থাকার মতন ঘরবস্তা মানুষের
আর কিছুতে হয় না। ইহাতে তাহার আত্মসমাগত যেমন আঘাত
লাগে, পরের অপমান বা নির্যাতনে তাহার শতাংশের একাংশের
আঘাত লাগিতে পারে না। এই বন্ধন-বেদনাটাই তখন আমাদের
শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্ত স্বাধীনতা
এবং মুক্তির সংগ্রাম সর্বপ্রথম ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেই বাধিয়া।
খাঙ্গসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—প্রথম অধ্যায় ।

উঠল। মহর্ষি এই সংগ্রামের পূর্ববস্থাটু মাত্র আনিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজের চিত্তে তিনি স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন; তাহাদের ধর্ম্মদুর্বলতা জাগাইয়া, ইংরেজী শিক্ষা ও যুযুরোপের সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মধ্যে যে উচ্চুম্বলি ও সঘ্নাচারিতা জাগিয়া। উঠিয়াছিল, তাহাকে সংযুত করিয়াছিলেন। এইভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য তিনি দেশবাসীদিগকে প্রশস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রাম যখন প্রতাপত্বাবে বাধিয়া উঠিল, প্রচীন নবীনে যখন মুখোমুখী হইয়া দাড়াইল, এবং কে কাহাকে বিধিমত করিবে তাহারই চেষ্টা আরম্ভ হইল, তখন মহর্ষির শাস্ত্র ধীরে প্রকৃতি, এবং অষ্টমত্তত্ত্বর রক্ষণীয়তা এই বিপ্লব তবে কংগাইয়া পড়িতে পারিল না। কেশবচন্দ্র তখন নবীন জ্ঞানিদিগকে লইয়া এই ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের মাঝখানে ‘জয় জগদীশ হরে’ বলিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। এই শোচা বীর্যের বলেই তিনি এবং তাহার সহচর এবং অনুচরেরা বাংলার স্বাধীনতা ভিক্ষার শিক্ষিত সমাজের হস্ত অধিকৃত করিয়া তাহাদের চিন্তা ও ভাবরাজ্যের রাজ হইয়া উঠিলেন। তাহাদের অন্তরে যে সকল ভাব মুক্ত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের দেবশিক্ষার্থীর বর্ণনায় তাহাই বাচাল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের চিন্তায় যে আকাশে ভয়ে ভয়ে নড়িতে চড়িতেছিল, কেশবচন্দ্র এবং তাহার সঙ্গীগণের জীবনে তাহাই নির্ভীক হইয়া দাড়াইতে লাগিল। যে বন্ধন তাহাদের মর্যাদা মর্যাদা বাঁচিতেছিল অগ্র তাহ। ছেড়ে করিবার শক্তির প্ররোণ তাহারা পাইতেছিল না, কেশবচন্দ্র এবং তাহার সঙ্গীগণ অবলোকনের সে সব বন্ধন ছড়িয়া। মুক্ত পুরুষের মতন তাহাদের সমক্ষ দাড়াইলেন। এই ভাবেই স্বদেশবাসীদের চিত্ত ও চিন্তাকে অধিকার করিয়া কেশবচন্দ্র নবশিক্ষিত বাঙালীসমাজের অধিনায়ককে
হইয়া উঠিলেন। তিনি যে স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষনা করিলেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে সর্বব্য তাগ করিয়া তাহাতে আসিয়া পড়িলেন। কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের এই সাধনা মহার্ষ বস্তু। সেই সাধনার উত্তরাধিকারীরূপে বাঙ্গা আজি পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার সাধনে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইয়া আছে।

রাজ্যের বন্ধনের বেদনা তখনও জগত নাই, সুতরাং রাষ্ট্রীয় মুক্তির বাসনাও প্রকল্প হয় নাই। তবে এই সাধনার পূর্ব অবস্থা কেশবচন্দ্র অনেকটা স্থান্ত্র করিয়া ছিলেন। রাজ্যতের গৌরববোধ জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বিন্যাস। কেশবচন্দ্র এই গৌরববোধ নানাদিক দিয়া জাগাইয়া তুলেন। তাহার মনীষা এবং বাঙ্গালি এ বিষয়ে কতটা সাহায্য করিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় আঙ্গ্রসমাজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র ধর্ষ প্রচারে বিলাতে যান। সেখানে তাহার অলোকসামাজ মনীষা ও বাঙ্গালি ইঞ্জিনাম বিশ্বে ও স্থানীয় হইয়া ‘যায়। কেশব-
চন্দ্রের নাম দেশময় ছায়া পড়ে। সুরসিক পাঞ্চ (Punch) লিখে সংকল্পনা করিয়া ছিলেন—

Big as a lion or small as a wren
Who is this Chunder Sen?

মহারাজী ভিকটোরিয়া কেশবচন্দ্রকে নিম্নলিখিত শ্রদ্ধা করিয়া তাহার সংগ্রাম সাধনে সাহস করিলুন, এবং নিজের ফোটোগ্রাফ স্মৃতিচিহ্নপূর্ণ তাঁহাকে দান করিল। সামাজিক মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী নিজের কেবল মনীষা ও প্রতিভাবলে বিলাতে কামাইয়া, মাতাইয়া। তুলিয়া ছিলেন, এবং ব্রিটিশ সাহার্জ্জের অধীনতার নিকটে রাজনীতিক সম্মান পাইযাছিলেন, ঈহতে কেবল বাঙ্গালীর নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তা গৌরবে কাপিয়া। উঠিয়াছিল। সে সময়ে সকল বিষয়েই আমরা ইঞ্জিনামের মুখপেক্ষী হইয়া ছিলাম। ইঞ্জিনামের সার্টিফিকেট মাথায় পাটিয়া।
লইতাম। ইংরাজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। ইংরাজ আমাদিগের অপেক্ষা কতো যে উঁচু, ইহা আমরা সকল সময়ে ধারণাতে পরিপালন না। এই ইংরাজ যখন রাজা প্রথম সকলে মিলিয়া। কৈশবচন্দ্রের প্রতিভার নিকট মাথা হইত করিয়া দাড়াইল, তখন আমরা বাঙ্গালী ও ভারতবাসী বলিয়া অজ্ঞতাতের গোরব অমূল্য করিতে লাগিলাম। এই স্বাধীনতাভিমান সর্বত্রই জাতীয় জীবনের এবং জাতীয় আতিথীত্বের—national life এবং national consciousness-এর সূচনা করে। কৈশবচন্দ্র এইরূপে আমাদের বর্তমান বৃহত্তর জাতীয় প্রচেষ্টার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বিলাতে যাইয়া তিনি যে সকল বক্তৃতা দেন তাহাতে অনেক সময়ই খোলাখুলিভাবে ইংরাজ চরিত্রের বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের দোষ কীর্তন করিয়াছিলেন। সেই সকল বক্তৃতা পড়িয়াও আমাদের আত্মচেতনের উদয় হয়। দুঃখিত তাঁতি যে আমাদের কিছু দিবার আছে, সভ্য জগতের যে আমাদের নিকটে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে এই ভাবটা জাগাইয়া দেন। এই দিক দিয়া আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার হরিদ্রার কৈশবচন্দ্রকে দেখিতে পাই।

প্রথম যুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে কৈশবচন্দ্র এবং তাহার অন্যগত নবীন ব্রাহ্ম যুবকেরাই সেনানী হইয়াছিলেন। তাহারা যে স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহারই উপরে আমাদের বর্তমান স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রচেষ্টা। গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্লার নবগত ইতিহাসে কৈশবচন্দ্র এবং তাহার ব্রাহ্মসমাজের ইহাই প্রধান কীর্তি।
শপ্তম কথা

ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতার নামেই কেশবচন্দ্র এবং তাহার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দল ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। ধর্মসম্বন্ধে মহর্ষি নিতান্ত স্বাদেশিক ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে সাবজনীন করিয়া তুলিয়ার চেষ্টা করেন। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম এমন বেদ ও উপনিষদ হইতেই সংগ্রহিত হয়। কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে একেকবাদ-প্রতিপাদক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের নতুন গুহা প্রচার করিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বলিকাতে ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা বেশী উদার করিবার চেষ্টা হয়। রাজা রামমোহন জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের পরম্পরার বৈরিতা নষ্ট করিয়া একটা উদার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র রাজার সেই ভাবেরই অনুরোদ্ধর করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসকলের মধ্যে একটা সমষ্টি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। রাজা এই বিভিন্ন ধর্মসকলের বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়া তাহাদের মধ্যে যে মিলটুকু ছিল, তাহাদের উপরে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজকে গড়া তুলিয়া চেষ্টা করেন। এরূপভাবে একমাত্রের মিলনকেত্ত্ব গড়া। তোলা সম্ভব। কিন্তু এরূপে সমস্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। রাজা সে চেষ্টা করেন নাই; সে চেষ্টা করিবার সময়ও তখন আসে নাই। কেশবচন্দ্র এই সমস্যায়ের চেষ্টাই করিয়াছেন। যে পথে কেশবচন্দ্র এই সমস্যায়ের প্রতিষ্ঠা
করিতে গিয়াছিলেন, তাহ। সর্বতোভাবে সমীচীন হইয়াছিল কিনা,
সে বিচারে প্রকৃত হইব না। বাংলার নবমুন্দের ইতিহাসে এই
ধর্মরত্বের আলোচনা ঠিক প্রাসঙ্গিক হইব না। তবে কেশবচন্দ্র
এই সময় করিতে যাই। ভারতবর্ষের এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন
ধর্মসম্প্রদায়কে একটা অতি বড় স্থায়ীতার সন্দে দিয়াছিলেন,
একথাটা বর্তমান প্রসঙ্গে বলা নিতান্তই প্রয়োজন। ধর্ম-বিজ্ঞানের
ইতিহাসে ইহ। অতি বড় কথা। প্রথম কথা ছিল, আমার ধর্মই
একমাত্র সত্য ধর্ম, অথা ধর্মসকল মিথ্যা। দ্বিতীয় কথা হইল,
আমার ধর্ম সত্য, অথা ধর্মসকল একেবারে মিথ্যা। নহে, তাহাতেও
সত্য আছে; জগতের সকল ধর্মেই সত্য আছে। ইহাই ব্রাহ্ম-
সমাজের প্রথম কথা ছিল। এই সূত্র ধরিয়াই বেদ ও উপনিষদাদি
ইহাকির। তাহার সত্য সংগ্রহ করিয়া মহর্ষি ব্রাহ্মধর্ম এই রচনা করেন।
এই সূত্র অবলম্বনেই কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের সমাজের
“শ্রোতসংগ্রহ” রচনা করেন। সত্য ও অসত্য মিশ্রিত শাস্ত্র হইতে
সত্যগুলিকে বাছিয়া লইতে হইলে সত্যের একটা কণ্ঠপাত্র আবশ্যক
হয়। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই নিজের বিচার-রূপকে এই
কণ্ঠপাত্রগুলিকে ব্যবহার করেন। সকলে এ কণ্ঠপাত্রের গুণ করিয়া
না, করিতে পারেও না। এইজন্যই জগতে এত মতভেদ দেখিতে
পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র পরস্পরের সকল ধর্মেই সত্য আছে,
এই মতকেও ছাড়াইয়া যায়। নববিধান প্রতিষ্ঠা করিতে যাই।
তিনি কহেন, সত্যের সকল ধর্মে কেবল সত্য আছে, তাহ। নহে,
কেন্দ্রের সকল ধর্মেই সত্য; নিজ নিজ অধিকারে, নিজ নিজ দেশকাল-
পাত্র-বিবেচনায় সকল ধর্মেই সত্য। সকল ধর্মেই ভগবদ্প্রতিষ্ঠা করেন;
সকল ধর্মেই ঈশ্বরের বিধান। এইরূপে কেশবচন্দ্র জগতের সকল
ধর্মেই একটা অতি বড় স্থায়ীতার সন্দে প্রদান করেন। যতক্ষণ
না জগতের ধর্মিকেরা এই সূত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মে বিরোধ কিছুতেই নষ্ট হইবে না। সত্য অসাম্প্রদায়িকতা এইভাবেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। আধুনিক ভারতের জাতীয় একতা ও জাতীয় জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন যে জ্ঞানসত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ভিত খুঁজিতাছিল মাত্র; কেশবচন্দ্র ‘সকল ধর্মই সত্য’ এই সূত্র প্রচার করিয়া সেই পাবিত্র মিলনমন্দিরকেই গড়িয়া। তুলিরাব চেষ্টা করেন। হিন্দু যেদিন বুঝিবে, তার নিজের ধর্ম তার নিজের নিজের যেমন সত্য, বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীনে, ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারাতে তাহার ব্যক্তিগত সাধন ও সিদ্ধির সঙ্গে এই ধর্মের যেমন অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্যায়ী সম্প্রদায় রহিয়াছে, সেইরূপ মুসলমানে নিকটে মুসলমান ধর্ম, স্বাধীনতার নিকট স্বাধীন ধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈনের নিকটে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পূর্ণ সত্য, ঐ সকল ধর্মের আশ্রয়েই তাহার নিজেদের জীবনে ধর্ম সাধন করিয়া পরমার্থ লাভ করিবে; সেইদিন ভারতবর্ষে ধর্মে ধর্মে বিরোধ নিরস্ত হইয়া। আধুনিক ধর্মবিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের একটা বিরুদ্ধ সাধীনতার ভূমিতে আমাদের জাতীয় একতা গড়িয়া। উঠিবে। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অধিকারে নিজ নিজ দেশকলপনাভেদে সকল ধর্মই সত্য, এই উদার ভূমিতেই সমৃদ্ধ সাম্প্রদায়িক বিরোধ নষ্ট হইতে পারে। কেশবচন্দ্র এই সূত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্য ভাবেই সর্ববধূমি সময়ের পথ খোলাসা করিয়া গিয়াছেন।

( ২ )
কিন্তু কেশবচন্দ্র মহার্থের সঙ্গে বিরোধ বাধায়। যে সাধীনতার আদর্শকে ধরিয়াছিলেন, ক্রমে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—দ্বিতীয় অধ্যায়

চাকরিত মহাপুরুষ—বাদ” প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। “বীরন্ধুলকার ও এসিয়া” এই বক্তৃতা দিবার পরে অনেকে ভাবিলেন কেশবচন্দ্র বুঝিয়া নাই। যাইতেছিল। লোকের এই ভাব নিরসনের জন্য তিনি ইহার কিছুদিন পরে “মহাপুরুষ” বা “Great Men” এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাতে তিনি কহেন যে জগতে পরিপ্রেক্ষিত সংবাদ প্রচারের জন্য মাথা মুছি মহাপুরুষেরা প্রেরিত হন। ইহাদের দ্বারা জগতের বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহারা ঋষির অবতার নহেন, কিন্তু ঋষির আদেশ তাঁহার নিকট হইতে সন্ন লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। যৌথ যেন কখনও এই শ্রীলর প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন, সেই রূপ আরও অনেক ছিলেন। সক্রেটিস, বুদ্ধ, মহা সকলেই ‘প্রেরিত মহাপুরুষ’ ছিলেন। এই বক্তৃতার দ্বারা কেশবচন্দ্র বুঝিয়া নাই। যাইতেছিল এই আশঙ্কা দূর হইল বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা ভিতরেই আবার ব্রাহ্মদের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধের বৈঞ্জ রোপিত হইল। কেশবচন্দ্র ক্ষেম নিজকে ‘ঈশ্বর- 
প্রেরিত’ বলিয়া মনে করিয়া লাগিলেন। তাঁহার প্রচারকারণ 
প্রকাশভাবেই এই গতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। স্বাধীনচেতা 
ব্রাহ্মেরা দেখিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা 
নষ্ট করিবার জন্য আবার একটা নতুন আরোজন হইতেছে। 
ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র ক্রমে 
‘আদেশবাদ’ অর্থাৎ সাধকেরা ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হন, 
এবং ঈশ্বরাধিকৃত হইয়া তাঁহারা যে কর্ম করেন, তাহ। সর্বত্রেভাবেই 
ধর্ম সংগঠনে এ বিষয়ে প্রকৃত বিচার-বুদ্ধির সমালোচনার অধিকার 
নাই,–এই গতবাদের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার সঙ্গে 
১৫
সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রবৃত্তিমূলক সহজ কথার চেষ্টায় ধনুর্যের নাম সন্ধিত করিয়া প্রচার বেঁইয়ার আদর্শ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও আর একটা বিরোধের কারণ হইয়া উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র নানাদিকে সমাজসংঘারের চেষ্টা করেন। বাক্সীমাত্মক প্রতিষ্ঠাই এই সংঘারের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ ও অস্বরূপ বিবাহ প্রচলন—এ সকলের চেষ্টা হয়। ক্রমে এখানেও বিরোধ বাধিয়া। উঠিল। একদল ব্রাহ্ম শ্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীব্রাহ্মীবেরও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাংলা হইয়া উঠিলেন। ইঁহার সরবরাহের দেশ-প্রচলিত অবরোধ-প্রাধার বিরুদ্ধে দুঃখান্তি। মহিলামুখে রাষ্ট্রসমাজে মহিলাদিগের যাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেশবচন্দ্র ভারত-বর্ষের ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার কোন। সেখানে পার্থার আড়ালে মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিবাহ স্বান করিয়া দিলেন।’ ক্রমে একদল ব্রাহ্ম নিজেদের পরিবারের মহিলাদিগকে এইরূপ পূর্বসূরীর করিয়া রাখিতে রাজি হইলেন না। যাহাতে ইঁহারা পার্থার বাহিরে বসিতে পারেন, ব্রহ্মসম্প্রদায়ে তাহার বাধ্য। করিতে চাহিলেন। এই লইয়া কেশবচন্দ্র ও তাহার প্রচারকৰ্মের সঙ্গে ইঁহাদের বিষয় বিরোধ বাধিয়া উঠিল। গ্রামের সমাজমধুমোহন ব্যবস্থা, উগ্রমোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গাপাধ্যায় প্রভৃতি এই সংগ্রামের অধিনায়ক ছিলেন। স্বাধীনতাবাদীর জয়লাভ করিলেন বটে; ভারতের ব্রহ্মসম্প্রদায়ে মহিলাদের জন্য প্রকাশ্য স্বান নির্দিষ্ট হইল; কিন্তু এ বিরোধের বৈজ্ঞান নষ্ট হইল না। ফলতঃ এই সংগ্রামটি কেবল শ্রী-শ্রীব্রাহ্মী লইয়াই ছিল না। ইহার মূল কারণ ছিল, কেশবচন্দ্রের একনায়কস বা একাধিপত্য। মহিলকে চাহিয়া। আসিয়ার সময় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মসম্প্রদায়ের কার্য-পরিচালনায় একরূপ গণতন্ত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সময় রঞ্জ সাধারণের প্রকাশ ভাবায় কেশবচন্দ্রের নিজের রচিত এই সন্ন্যাসী গৃহীত হয়।

"Whereas the trustees of the Calcutta Brahma Samaj have taken over to themselves the charge of the whole property of the said Samaj and the connections of the public with the said property have ceased, and whereas the money subscribed by the public should be spent with the consent of the public, it is resolved at this meeting that the subscribers or members of the Brahma Samaj be formally organised into a Society, and that subscriptions be spent in accordance to their wishes for the propagation of Brahmioism."

এই আদর্শ অনুসারী কার্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসাধারণের এক প্রতিষ্ঠিত সভাও গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্যান্তরকালে এই গণতন্ত্র আদর্শ গড়িয়া উঠিতে পারিল না। কলিকাতা সমাজে সুখ্য দেবক্ষেত্রনাথের যোগের একাশ্বিতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও সেইরূপ কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র-শাসন বা অটোক্রাসি (autocracy) প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বাধীনতা ব্রাহ্মের এই জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাপ্ত্রী মহাশয় সম্প্রদায় “সমদর্শী” নামক বাঙ্গলা পত্র এই প্রতিবাদী দলের মূখপত্র হইল। যে যুক্তির ও বাক্তিগত ধর্মসূচক বা conscience এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল, “সমদর্শী” সেই আদর্শেরই প্রচার করিতে লাগিল। এই পত্রের লেখকেরা ধর্মসম্পর্কীয় সকল
মতবাদের উপর প্রথম যুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্যসত্যের বিচার করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর আছেন কি না, ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা কি, প্রার্থনার যুক্তিযুক্ততা এবং উপকারিতা, পরলোক আছে কি নাই, ধর্মের এই সকল মূল প্রশ্ন লইয়া ঈশ্বর নিতান্তভাবে সর্ব সংসার বর্জিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন। আগাধিকে কেশবচন্দ্র যে বেরীগোর সাধন করিয়াছিলেন এবং যে ভারুকত্বপ্রবন্ধ ভক্তিবাদ ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার ও চীন প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র যে নির্জন যুক্তিবাদ ও বাস্তু-ক্ষুদ্রতাকে সংগত করিয়া আনিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই জন্য ‘প্রেরিত মহাপুরুষবাদ’ ও ‘ঈশ্বর আদেশবাদ’ প্রভৃতি প্রচারিত ধর্মমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, “সমস্তায়” দল সেই নির্জন যুক্তিবাদ ও বাস্তুক্ষুদ্রতাকে আদেশ করে ব্রাহ্মসমাজে রক্ষা করিবার জন্য প্রাপ্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যেও একটা রক্ষণশীলতা ছিল। এই রক্ষণশীলতার প্রকৃতিয় তিনি ধর্মনীতির নামে মানবপ্রকৃতির সহজ যাবতীয়কে কোনও কোনও দিকে আটকাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও একটা যাবতীয় সংগ্রাম বাধ্য উঠে। কুচবিহারের অপরাধবাদক মহারাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জোয়ার বিবাহ হইলে এই বিরোধ গুটিয়া উঠে; এবং মহর্ষির নেতৃত্বধারীকে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ একদিন যেমন ভাবিয়া দুই ভাগ হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বধারী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ ভাবিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। কেশবচন্দ্র যাবতীয় সংগ্রামের সেনানায়কথেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় দেশের শিক্ষিত সাধারণের সহায়তা পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের একাধিক প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিলে,
বিশেষতঃ তিনি যে পরিমাণ ধর্মসাধনে ও ধর্মশাস্ত্র-গঠনে যুক্তিকে বর্ণ করিয়া বিশ্বাসকে আশ্রয় করিতেছিলেন, সেই কারণে ও সেই পরিমাণে দেশের শিক্ষিত সাধারণের উপরে তাহার প্রভাব হৃদয় হইতে ছিল। ভ্রান্তি মতবাদ সম্পর্কে এই না করিয়াও সেকালে নাবিক-গভীর সম্প্রদায়ের শান্তি ও সহায়তা ভ্রান্তিমাঝের দিকে অর্কুট হইয়াছিল। তাহার ভ্রান্তিমাঝের সাধীনতার সাধক রূপে গভীর শান্তি করিতেন। ত্রিক্কে ভারতবর্ষীয় ভ্রান্তিমাঝে সে শান্তি হারাইয়া ফেলেন। এই জন্য খাতে বিবাহের পরে ভ্রান্তিমাঝে যখন আবার একটা সাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া। উঠিল, তখন দেশের শিক্ষিত লোকমত সাধীনতার পক্ষপাতী সাধারণ ভ্রান্তিমাঝের দিকে তুকিরা পড়িল। এই নৃতন ভ্রান্তিমাঝে পুনরায় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-সাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে লাগিল।

(৩)

ভ্রান্তিমাঝে যখন এই রূপে ভাঙ্গাভাঙ্গি ও ভাগাভাগি হইতেছিল, তখন ভ্রান্তিমাঝের বাহিরে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা সাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। ভ্রান্তিমাঝে ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার লইয়াই বাস্ত ছিল। এই সংস্কার-কার্যে ভ্রান্তির দেশের রাজপ্রকৃষ্টদের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু-সামাজের সঙ্গেই এ বিষয়ে ভ্রান্তিমাঝের বিরোধ ছিল। হিন্দুসামাজ যখন ভ্রান্তিমাঝের নির্ভারতত্ব করিতে চাহিলে সাহায্য নাই। ভ্রান্তির দেখিলেন যে হিন্দু যাবত দেশের রাজো দিকে, তাহা হইলে খুঁষ্ট-খর্শের অভাবায়কালে রোমাঞ্চ সাহারাজ্য খৃষ্টীয়াদিগের যে দশা হইয়াছিল, এই হিন্দুরাজ্যে ভ্রান্তিদের সই দশা হইত। ইংরাজরাজ এ দেশ প্রায় এক প্রজাকে তাহার
ধর্মের সম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতা দিয়াছে বলিয়াই ভ্রমের। নিজের বিশ্বাস অন্যের চিন্তায় পারিতেন যে ইংরাজ-রাজপুরুষের প্রকাশের ভাবে তাহার এই সংস্কার-ব্যেতর প্রশংসা করিতেন। এই সকল কারণে রাজ্যসমাজ রাজ্যীয় স্বাধীনতার প্রেরণা প্রথম প্রথম ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু রাজ্যসমাজের নেতৃত্ব যখন কেবল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার লইয়াই ব্যতি ছিলেন, সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মাথা অর্জনে অর্জন একটি রাজ্যীয় স্বাধীনতার প্রেরণা ও জাগিয়া উঠিতে ছিল। ভারতবর্ষীয় রাজ্যসমাজে কেশবচন্দ্রের একান্যুক্তের প্রতিশ্রুতিগত অনেকেই একটি সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় মাত্রী। উঠিয়াছিলেন। ইংরাজ কেহ কেহ সেকলের রাজ্যীয় আন্দোলনেরও নায়কবলিত করেন।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বন্ধু মহাশয় ভারতসভার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েন। কুচবিহার বিবাহের প্রায় একসময়ে ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বর্গীয় দারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজতন্ত্র ভারত-সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্তী মহাশয় ভারত-সভার কার্যাল্যনির্বাহক সমিতির সভা নির্বাচিত হন। ইংরাজ সকলেই ভারতবর্ষীয় রাজ্যসমাজে কেশবচন্দ্রের একান্যুক্তের বিরোধী ছিলেন। বাঙালি সাধারণ রাজ্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, ইংরাজ তাহার অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে নূতন স্বাধীনতার আদর্শ স্থটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সাধারণ রাজ্যমাজে তারা তদপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। আনন্দমোহন বন্ধু এবং শিবনাথ শাস্তী উভয়ের মধ্যেই একটি গভীর সত্যের প্রেরণা ছিল। শাস্তী মহাশয় রাজ্যসমাজের উপাসনাতে সর্বস্থায়ম স্থানের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত উপাসনা প্রণালীতে জগতের
কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার প্রথা প্রশংসিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে প্রথম প্রথম সামাজিক উপাসনাতে স্বদেশের উদ্দেশের জন্য প্রার্থনা করিবার রীতি প্রবর্তিত করেন। এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কামনায় যে সংঘীত রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজের সংঘীত পুস্তকে বোধ হয় সেইটাই একমাত্র স্বদেশী সংঘীত। এখনকার ব্রাহ্মেরা সেই সংঘীতটি প্রায় ব্যবহার করেন না। বলিয়া লেখে তার কথা তুলিয়া গিয়াছে। এইজন্য সেই সংঘীতটি তুলিয়া দিলাম।

বিংশটি খামার--ঢংরি।

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আরাধ্যের প্রিয় ভূমি
সাধনের ভারত ভূমি
অবসর আছে অচেতন হে;
একবার দয়া করি,
তোল করে ধরি,
দুর্দশা-জ্ঞাতার তার করহ মোচন।
কোটি কোটি নরনারী,
ফেলিছে নয়নবারি
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে;
তাই প্রাণ কাঁদে,
ক্ষম অপরাধে
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন
অচেতন পরাধীন
কুপো করি অনিলে স্বদরন হে;
সেই কুপান্তরে
. দেখি শুভঙ্গে
সাধনের ভারতে পুন আন হে জীবন।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী
প্রত্য করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কথাই ভাবি
নাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের ছবিটাই আমাদিগের চিন্তায় অধিকার করিয়াছিল। নতুন ব্রাহ্মসমাজে আমারা আনন্দ-মোহন বন্ধু মহাশয়ের নেতৃত্বধীনে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের একটা সর্ববাস্তব নমুনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম।

ইংলণ্ডের, আমেরিকার এবং ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া তাহারই ছাঁচে আমাদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের Constitution (কনস্টিউটিউশন) গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা কেবল একটা সংকীর্ণ ধর্মসমাজই গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ যে ভবিষ্যৎ সাধীন ভারতের রাষ্ট্রশিক্ষার বা স্টেটের আসনে যাইয়া বসিবে গোটা দেশটা ব্রাহ্ম হইয়া। যাইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্র ও ধর্মসমাজ এক হইয়া। উঠিবে এরূপ অন্তর্ব্রহ্মাণ্ড করিব নাই।

কিন্তু সাধীনতার এবং শান্তির সাধনাপথে ব্রাহ্মসমাজ যেমন একটা আদর্শ-পরিবার ও একটা আদর্শ-সমাজের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্খা লইয়া। কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ হইয়াছিল, সেই সাধীনতার ও শান্তির আদর্শের পুটাইয়া। তুলিয়া। একটা আদর্শ রাষ্ট্রশিক্ষা বা রাষ্ট্রশিক্ষা গড়িয়া। তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। এই ভাবের প্রতিষ্ঠাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কনস্টিউশনের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনস্টিউশনের একটা ছোট ছাঁচ নমুনা। দাড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মের গণতন্ত্র মঙ্গল করিবেন। দেশের লোকেও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর ভিত্তর এই গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও নৈতিকশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অতি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রীয় শিক্ষার বিষয়ে করিয়া পরিচিতি। নিজেদের
ফলতঃ স্বাক্ষর সমূহের ধর্মাচারান্তরের মধ্যে শান্ত মহাশয়ের ভিতর স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শ না থাকা ছিল। দুঃখ। উঠিয়াছিল, আর কাহারও মধ্যে থাকা ছিল। ফোটায় নাই। প্রথম যৌবনাবধি এই স্বাধীনতা এবং মানবতাই তাহার ধর্মের মূল উপাদান হইয়া ছিল। দরিদ্র স্বাক্ষর-পণ্ডিতের গৃহে জমিয়া, পরায়ণগ্রহে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া, শিবনাথ শান্তিতে সেই শিক্ষাকে কোনও দিন, নিজের সাংসারিক উন্নতিসাধনে নিয়োগ করেন নাই। মহিষী এবং ব্রাহ্মণদের উভয়ই ধনসম্পদের মধ্যে জমিয়া বাড়িতে উঠিয়াছিলেন, জীবনে 'গুরুপ্রার্থ-নাশী' দারিদ্র-দুঃখ যে কি ইহা ভোগ করেন নাই। শিবনাথ শান্তি ইচ্ছা করিলে ধনক্ষেত্রে না হউন কিন্তু সাংসারিক উন্নতিসাধনের মধ্যে অনায়াসে দিন কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে কোনও দিন তাহার লাভ ছিল না। তাহার নিকটে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা। তাহার নিকটে এই স্বাধীনতা ইচ্ছা ছিল। প্রথম বয়সে তিনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম শুরু করেন; হয়র স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বেশীদিন বহুক্তে হয়র স্কুলে পড়িয়া থাকিতে হইত না। প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্থাতের অধ্যাপক স্বাক্ষর রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন ধর্মসম্পদে পড়িয়াছেন, অবন্দি মধ্যেই তাহার অবসর লইবার কথা। তিনি অবসর লইলে প্রেসিডেন্সী কলেজের সহকারী সংস্থাতে অধ্যাপকের পদে শিবনাথ শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। আর সেখান হইতে ক্রমে তিনি যে সংস্কৃত কলেজের ১৬
অধ্যাক্ষের পদে যাইয়া বসিতেন, একথাও ঠিক। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী এই লোকে পড়িলেন না।

স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই তিনি ছুটিয়া করিতেছিলেন। সে সময়ে আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের বাগমিত্যায়, শিশিরকুমারের 'অমৃতবাসী', বিহাড়ুষণের 'সোমপ্রকাশ', এবং অক্ষয়-চন্দ্রের 'সাধারণীর লেখায়, 'বঙ্গদর্শনের' ও 'আর্য্দর্শনের' আলোচনায়, রঞ্জলাল, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের কবিতায়, দীনবন্ধু এবং উপেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের নাটকে এবং কলিকাতার হাসিমাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে একটা প্রবল স্বদেশপ্রেমের বন্ধ। ছুটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের যে স্বাধীনতার আদেশকে ধর্মসাধনে ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা। করিতেছিলেন, তাহাই রাজ্য শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার সাধকেরা এই স্বদেশপ্রেমকে তাহাদের ধর্মজীবনের আদেশের অঙ্গভূত করিয়া রাখিয়াে স্বাধীনতার আদেশকে পরিপূর্ণ ও সর্বজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের এই স্বাধীনতার সাধকদিগের অগ্রণী হইয়া উঠেন।

এই সময়েই শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশ-চর্চার প্রথম দীক্ষাগ্রহণ হইয়াছিলেন। তাহার নামের অর্থে আমরা 'ক’জন মিলিয়া' একটা ছোটল দল গড়িয়া চেষ্টা করি। আমাদের প্রতিজ্জ্বা-পত্রের প্রথম কথা ছিল—"স্বাধীন-শাসনই (তখনও স্বরাজ-শাসনের প্রচার হয় নাই) আমরা একমাত্র বিধাতা-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া দেখিকার করি।" অর্থাৎ যে শাসন স্বাধীন-শাসন নহে, শাসিতের উপরে ধর্মতৎ তাহার কোনও অধিকার আছে বলিয়া আমরা মানি না। "তবে দেশের বর্তমান
অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মন্দিরের মুখ চাহিয়া আমার বর্তমান গভর্নমেন্টের আইন-কামনা মানিয়া চলিব—কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশার দ্বারা নিরীক্ষিত হইলেও কখনও এই গভর্নমেন্টের অধীনে দাস্ত স্বীকার করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল—"আমরা জাতিভেদ মানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্ণে এবং রমণীর পক্ষে যোনি বৎসরের পূর্ণে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাহে সাহায্য করিব না।" তৃতীয় কথা ছিল—"লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ সংস্কার করিব।" চতুর্থ কথা ছিল—"অস্থাভূত, বলুক ছোড়া তখনও অস্থ-আইন প্রচলিত হই নাই) প্রভূতি নিজের অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব।"

পঞ্চম কথা ছিল—"আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না, যে যাহার অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, এবং সেই সাধারণ ভাঙ্গার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া যেদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ করিব।"

শাস্ত্রী মহাশয় তখনও হেয়ার স্কুলে পাঠিত করেন। এইজায় প্রথম দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইহার ছয়মাস পরে সরকারের কর্ত্ত্বে ইস্তফা দিয়া। তিনি নিয়মমত দীক্ষা লইয়া এই দলভূক্ত হয়েন। দলটি যে খুব বড় ছিল তাহা নহে। স্বর্গীয় কালীশঙ্কর শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র, হেলোনা কাব্য, মিত্র কাব্য, ভারত-মঙ্গল প্রভৃতি রচয়িতা স্বর্গীয় অনন্দচন্দ্র মিত্র, সেকালের ব্রাহ্মীকারের স্থপতি এবং সকলের তখন ভালোবাসান নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায়, হাইকোটের ভূতপূর্ব প্রথিকৃ উকিল শ্রীযুক্ত তারকিশোর চৌধুরী, ( ইনি পরে বহুবিদেশী সন্ত দাস নামে ভারতবর্ষের বৈধব সমাজে পরিচিত ), শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং আমি—আমরা এই
নবযুগের বাংলা

কয়লাটিই প্রথমদিন এই দীর্ঘ গ্রন্থ লিখিত। ইহার পরে শাস্ত্রী
মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন সংস্কার হোম ও প্রাক্তন উমাপদ রায়,
ইঁহার। এই দলভূত হয়েন। ইহা ১৮৭৬-৭৭ ইঁরাজীর কথা।
আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলী যে রঙ। করিতে পারিয়াছি, একথা
বলিতে পারি না। যে কমিউনিজ্মের (Communism) আদর্শে
আমরা। এই দলট। বাঁধিতে গিয়াছিলা, অর্থাৎ বাক্যিতে সম্পর্ক
থাকিবে না, সাধারণ অভ্যাশারে নিজ নিজ উপাচ্ছিন্নত অর্থ দান
করিব, এবং সেই ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনপূর্ণী বৃত্তি লইয়া
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব,— এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারি
নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিজ্ঞাগুলি সকলই রঙ। করিয়া চলিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের দীর্ঘ গ্রন্থের কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মসমাজের
কুচবীহর বিবাহ হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সমাজের আচার্য
এবং প্রতারক নিযুক্ত হন। সমাজের কর্ম-বন্ধনে কাব্য হওয়াতে
আমাদের এই দল-গঠনের প্রতি তিনি আর মনোনিবেশ করিতে পারেন
নাই। আমরাও অনেকে অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থী যুবকমাত্র ছিলাম।
স্নেহে এই দলটি আর গড়িয়া উঠিল না। কিন্তু এই কুচ অনুষ্ঠানের
ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময় যে সরকারিত্য স্বাধীনতার
আদর্শের পানে চূঁটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সে মুক্ত্থাত্র। আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই
জন্যই দেশের উপরে তাহার প্রভাবও কমিয়া। গিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্ম-
সমাজ একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে
যুঠাইয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, ইতিহাস কখনই তাহা
তুলিতে পারিয়া না।
অষ্ঠম কথা

রাজনারায়ণ বস্বু ও স্বাদেশিকতার উল্লেখ

বাংলার নবযুগের কথায় স্মগীর রাজনারায়ণ বস্বু মহাশয়ের জীবন ও সাধন উপেক্ষা করে। সত্য নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র, এমন কি পঠিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও দেশবিদেশে যে প্রতিষ্ঠানাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বস্বুর সে প্রতিষ্ঠা ছিল না। মহর্ষি, ব্রজানন্দ এবং শাস্ত্রী মহাশয়, তিনজনই এক একটি সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। রাজনারায়ণ বস্বু মহাশয়ের পিছনে এরূপ কোনও দল ছিল না। স্বতরাং তাহার দশ ও ব্যাপ্তি ততটা পরিমাণে চারিদিকে ছড়াইয়াও পড়ে নাই।

রাজনারায়ণ বস্বুর বিশেষ প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে। আর এ ক্ষেত্রে তিনি যে অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তবে যে ছুটিন থান। বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই সে সময়ের বাংলা সাহিত্যে তাহার একটি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহার "একাল ও সেকাল" বাংলা সাহিত্যে একখানা ভেষণ গ্রন্থ। বস্তু মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের 'তংবোধিনী পত্রিকার' ও একজন লেখক ছিলেন। আধুনিকতাবে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ধর্মবিজ্ঞানের বা Science of Religionএর আলোচনা করেন। তাহার "ধর্মতত্ত্বদীপিকায়" বাংলা ভাষায় ধর্মতত্ত্বসমালোচনা প্রথম গ্রন্থ। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" রাজনারায়ণ বস্বুর আর একখানি উপাদায় গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থে বস্বু মহাশয়ের মনীষা এবং স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।
বিপ্লবী বাঙ্গালীর নবযুগের ইতিহাসে রাজনীতির বস্তু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা এই সময় প্রদূষণ দ্বারা হয় নাই। তাহার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব—
বিষয়ক বক্তব্য এবং বাঙ্গালীর ইংরেজীবিশ্বভাষা মধ্যে স্বজাত্য-ভিত্তিতে করিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করেন, তাহার দ্বারাই বাঙ্গালী নবযুগের ইতিহাসে রাজনীতির বস্তুর নাম চিহ্নিত হয়।
থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ যোগ তাহার দৌহিত্র। এই প্রসঙ্গে আমাদের গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় কেহ কেহ রাজনীতির বস্তুকে Grandfather of Indian Nationalism বা ভারতের জাতীয়তার পিতামহ এই উপাধি দিয়াছিলেন। অরবিন্দ যোগ তাহার দৌহিত্র না হইলেও এই কথাটা সর্বভৌমত্বের সত্য হইত। কারণ এই বাঙ্গালীর রাজনীতির বস্তু শিক্ষার্থীরকেই সর্বপ্রথমে স্বাধীনতার স্বীকার আনিয়াছিল। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই বস্তু স্বাধীনতার স্বষ্টি আবহাওয়াল। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই বস্তু স্বাধীনতার স্বর্গীর করেন। কিন্তু তিনি ‘আমার স্বাধীনতা’ লিখিতেছেন যে একজন তাহাকে Grand-father of Nationalism এই উপাধি দিয়াছিলেন।

সে কালের ইংরেজী বিশ্বভাষায় মত প্রথম যৌথন রাজনীতির বস্তু মহাশয়ঝং পাশ্চাত্য সাধনার প্রভাবে সংশয়বাদী হইয়া। উঠেন। তিনি নিজেই কহিয়াছেন,—

“কলেজ পরিষদের অব্যবহিত পূর্বে আমি সংশয়বাদী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার শ্রী এবং আমার পিতার মৃত্যু আমাকে প্রকৃতি করিল। পুনরায় ধর্মে আমার বিশ্বাস হইল; কিন্তু এবার আমার পৈতৃক ও সে সময়ের তত্ত্বাবধান সভার প্রচারিত বৈদাত্তিক ধর্মে বিশ্বাস হইল। লাল হাজারীলাল প্রথম আক্ষরিক প্রচারক ছিলেন। ইহার বাটী ইন্দোরে ছিল, ইহার একটি প্রশাসিত স্বর্গস্বরূপ ছিল।
তখন যে ব্রাহ্মণ হইত তাহাকে একটি ঐরূপ স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। প্রাণের নীচে পারস্য ভাষায় ‘ই’ হাম্নমাহাদ্ম মান্দ্র ’—‘এইরূপ রহিবে না’, এই বাক্য অক্ষিত ছিল। এই বাক্য দেখিয়ে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে, এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে—এই জন্য ঐ বাক্য অক্ষুরিতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। লালসাহেব প্রতিদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ গ্রহণের প্রতিষ্ঠা পত্র অনেক-গুলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাহির হইতেন, বিপ্রহরের পূর্বে সেগুলি স্বাক্ষর করিয়াই। আমিয়া হাজির করিতেন।

"যেদিন প্রতিষ্ঠা পত্র স্বাক্ষর করিয়া। (ইংরাজী ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মণ গ্রহণ করি, সেদিন আমি স্বামীর ছু একজন বয়স্ক ব্যক্তিদের সহিত তাহা করি। যেদিন আমরা ব্রাহ্মণ গ্রহণ করি সেদিন বিষকুট ও শরীর আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমর। মান না, উহা দেখাইবার জন্য উহা করা হয়। খানা খাওয়া ও মশলান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মণ গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। . . . . . . ব্রাহ্মণ গ্রহণ করাতে আমর কলেজের সাম্যায়ান্তার আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাহার আমাকে এক অদৃশু জীব মনে করিয়াছিলাম। তাহারা সকলেই সংশয়বাদী অথচ ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উক্ত ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে ইহা তাহাদিগের স্পর্শের অগোচর ছিল।"

কিন্তু ধর্মের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় বোধ হয় কোনও দিনই জাতীয়তা বা Nationality র আদর্শ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়াই মহাবি দেবেন্দ্রনাথকে তিনি এক পত্র লেখেন। এই পত্র তিনি মহাবি ব্রাহ্মণ প্রতিপাদক একধানি এই স্থান করিতে অনুরোধ করেন।
রাজনারায়ণ বন্ধুর পিতা। নন্দকিশোর বন্ধু মহাশয় রামমোহন রায়ের কুলে ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। বর্তমান হেদুয়া পুরকিশর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এক কুল ছিল। নন্দকিশোর বন্ধু মহাশয় কুল ছাড়িয়া কিছুদিন রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কাজ করেন। রাজনারায়ণ সংস্থাপনের পরে বাহারী সর্বপ্রথম রামমোহন রায়ের শিষ্যের গুরু করেন, নন্দকিশোর বন্ধু মহাশয় ঠাহারের মধ্যে একজন ছিলেন। নন্দকিশোর রামমোহন রায়ের শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া একদিকে যেমন বৈদার্শিক ব্রাহ্মণের এবং নিরাকার অপারানার অনুরাগী হয়েন, সেইরূপ অন্যদিক র্তাদের প্রতিস্থ অহংকৃত অনুরাগী হইয়া উঠেন। রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয় পিতার নিকট হইতেই অজ্ঞানার্থের বৈজ্ঞানিক নিয়মাদি তাহার আমরণসাধ্য সরল ও সতর্ক স্বাধিকারীর প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই জন্মই তাহার সমসাময়িক বাঙালীরা ইংরাজী পণ্ডিত জন্তু পরিমাণে ইংরাজের অনুকরণের জন্ম বাহ্রণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বন্ধু সেরূপ বাহ্য হন নাই।

মহীরির সঙ্গে বন্ধুতাতও বন্ধু মহাশয়ের এই স্বাধিকারচুক্ত বিশেষভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। দেবেশ্বরনাথ ইংরাজদের সঙ্গে কিছুতেই
রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্য ১২৯
মেশামেশি করিতে চাহিতেন না। মিস কার্পেন্টার এদেশে আসিয়া
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। মিস কার্পেন্টারের
পরিবারবর্গের সঙ্গে বিলাতে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ আত্মীয়তা
জনিয়াছিল। সেই সুত্রেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া। মহর্ষির সঙ্গে
সাক্ষাৎ ভাবে আলাপ-পরিচয় করিবার জন্য লালমিত হইয়া উঠেন।
একথা শুনিয়া মহর্ষি কলিকাতা ছাড়িয়া। তাহার জমিদারীর নিকটস্থ
কুঠিয়া উপনগরে পলাইয়া। যান। রাজনারায়ণ বসু তাহার
“আত্মচরিতে” লিখিয়াছেন—

“দেবেন্দ্রবাবু ব্যভাবতই ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক।
যেহেতু ভারতবর্ষের সমকালীয় বিষয়ে তাহাদিগের সহিত তাহার মতের মিল
হয় না। ইংরাজের মতামুক্ত করিয়া চলিলে ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডে
প্রতিষ্ঠা পাওয়া। যায়, কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা
পাইবার জন্য আদেশ বাংলা নহেন। কুঠিয়ার লেব (Lobb) সাহেবে কোনও সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—“The proud
old man does not condescend to accept the praise of Europeans.”

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিগত স্বাজ্ঞাত্যাভিমান ও বোধ হয়
বসন্ত মহাশয়ের প্রকৃতিগত স্বাজ্ঞাত্যাভিমানকে বাড়াইয়া। তুলিয়াছিল।
পানাহার বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু সমাজের কোন আচার বিচারে
মানিতেন না। সমাজ-সংস্কার কার্যে তিনি কখনই পেছনপাড়ে হন নাই।
বিচারাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ সংস্কারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী
ছিলেন এবং বিধবাবিবাহ আইন পাশ হইবার পরে নিজের পরিবারে
ইহার অকুতোভেদে প্রচলিত করেন। এই আইন অনুসারে প্রথম বিবাহ
প্রীতিচন্দ্র বিচারাগর মহাশয়ের। বিচারাগর মহাশয় প্রথমে সংস্কৃতি
কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।

১৭
১৩০ নবযুগের বাংলা

রাজনারায়ণ বন্ধু লিখিয়াছেন :—

"যে দিন তাহার বিবাহ হয় সে দিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে যুগ উল্টনের নায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতিবিদ্যা লোক বরের পাক্ষিক সঙ্গে পদত্যাগে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ পাণিহাটির মধুমূনন ঘোষ করেন। তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জীবন তৃতীয় ভাই দুর্গানারায়ণ ও আমার সহোদর মদনমোহন বন্ধু করেন। এই বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুদা মহাশয় বোধাল হইতে আমাকে লেখেন যে ভোমার দ্বারা আমারা কায়স্কুল হইতে বহির্গত হইলাম। দুর্গানারায়ণ বন্ধু যখন বিধবাবিবাহ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুমুখে তাহার পাক্ষিক ভিতর মূখ দিয়া বলিয়ান—‘দুর্গায় তোমর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি’। বোধালের লোকে বলিয়াছিল যে ‘রাজনারায়ণ বন্ধু গ্রামে আসিলে আমরা ইত মারিব’। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, ‘তাহাতে আমি খুদা হইব, আমি বাঙালীকে উদাসীন জ্ঞাতি বলিয়া জানি। এইরূপ ঘটনা হইলে আমি স্বহস্ত করিব যে তাহাদিগের বিধবাবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবাল, তেমনি বিধবাবিবাহ যখন ভাল মনে করিবেন, তখন উহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ এইরূপ প্রবল হইবে’।"

রাজনারায়ণ বন্ধু তখন মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। মেদিনীপুরের এই লইয়া কম আন্দোলন হয় নাই। মেদিনীপুরের তখনকার উকীল-সরকার হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে রাজনারায়ণ বন্ধু জানেন না কি তিনি বাংলা ঘরে বাস করেন, অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে তাহা পড়িয়া দিতে পারি।’ সে সময় এই লইয়া একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে পারে, এই আশঙ্কাও হইয়াছিল। রাজ-
রাজনারায়ণ বন্ধু ও সাদেশিকতার উদ্ধেয় ১৩১

নারায়ণ বন্ধু লিখিয়াছেন যে এইজন্য তিনি ও তাহার স্কুলের দ্বিতীয়
শিক্ষক উত্তরপাড়াবাসী বাবু যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় ( যিনি পরে সংস্কৃত
বিষয়কের বোল্ড-মার্কিয় হইয়াছিলেন ) ইহার। জুনে মেদিনীপুরের
নিকটে জঙ্গলে যাইয়া দুইটি মোটা লাঠি কাটিয়া লাইয়া আসেন । ‘যদি
দাঙ্গা হয়, সেই সময় আমারকার জন্য বাবাহর করা যাইবে।’
রাজনারায়ণ বন্ধু এই কাটিভাবটা বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
গ্রস্থ ছিল। আমি যখন তাহার প্রথম দর্শনলাভ করি, তখন
রাজনারায়ণ বন্ধুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা
হইয়া উঠিয়াছে। শরীরটাও যে খুব নৃশিষ্ট বলিতে ছিল এমন নহে।
কিন্তু সেই বয়সে, সেই শরীরের লাইয়া, সেই প্রথম দেখার দিনেই কথা-
ঋণক্ষে কহিয়াছিলেন :— “আমি বেশী দিন বাচব এমন আশা ও করি
না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটি শাক্তের যদি নিজের
হাতে নিপাপ করিয়া যাইতে পারি, তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে
করিব।” ১

( ৩ )

রাজনারায়ণ বন্ধু সেকালের ইংরাজী-নবীণদিগের মতন প্রথম
যুক্তিবাদী ছিলেন। এই যুক্তিবাদই তাহাকে ব্রাহ্মসমাজে টানিয়া
আনে। কিন্তু এই যুক্তিবাদ তাহাকে নাটকিয়া করিতে পারে নাই
বা বিদেশের অমূল্যীকর্ষণে প্রণোদিত করিতেও সমর্থ হয় নাই।
ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের অগৌরবল-
গণ্য হইলেও রাজনারায়ণ বন্ধু যশগ্রের সভ্যতা এবং সাহিত্য প্রতি
কখনও শ্রদ্ধাহীন হয়েন নাই। দেশ-প্রাচীন প্রতিমা-পূজা বর্ণনা
করিয়াও তিনি বেদ ও উপনিষদের অঙ্গনীতে যে জগতের সকল
ধর্মধের্মের অপেক্ষা সেবের সাধের শ্রেষ্ঠত্বের অপেক্ষ। সর্বদাই ভাবে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, একথা সর্বদাই প্রচার
করিতেন। কিন্তু স্বদেশের ধর্মনির্দেশের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুসৃত তাহাকে অন্যান্য দেশের ধর্মনির্দেশের প্রতি অঙ্গাঙ্গীন করে নাই। রাজনারায়ণ বসু ইংরাজীতে বিশেষ কূটবিষ্টি ছিলেন। স্থতরাং গুহীভূত ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে প্রভূতি খুব ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন বাইবেলের সার-সংগ্রহ করিয়া Precepts of Jesus প্রচার করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বসুও সেইরূপ একথানি সার-সংগ্রহ করেন, এবং Hindu Theist’s Brotherly Gift to English Theists এই নামে উহা ছাপাইয়া প্রচার করিবার ভার তাহার জামাত। ‘সম্ভাবনী’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপরের অর্পণ করেন। রাজনারায়ণ বসু খুব ভাল ফার্সি জানিতেন। মুসলমান ধর্মশাস্ত্র হইতেও একথানি অনুরূপ গ্রন্থ সংকলন করিয়া-ছিলেন। সেখানি মুদ্রিত হইয়াছিল কিনা জানি না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে একটা গঠিত যোগ থাকা সত্ত্বেও রাজনারায়ণ বসু এদেশে হিন্দুর পক্ষে “স্মৃত্ত, বেদ-বেদান্ত অবলম্বন” করিয়াই ধর্মসাধন ও ধর্মপ্রচার করা উচিত, ইহা মনে করিতেন; এবং বস্মোগ ও ব্রহ্মসাধন বিষয়ে হিন্দুধর্মী জগতের সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বিশ্বাস করিতেন। সেই জন্য রাজনারায়ণ বসু কখনই নিজেকে কেবল Theist বা একেক্ষরবাদী করিতেন না; বিদেশীয়-দিগের সঙ্গে পত্র-ব্যাখ্যায় সর্বদাই নিজেকে Hindu Theist বলিয়া বর্ণনা করিতেন। রাজনারায়ণ বসু ভারতসমাজে প্রবেশ করিয়াও একদিনের জন্য নিজের হিন্দুত্বের গৌরব বিস্মৃত হন নাই।

তাহার স্মৃতিকর জীবনের পূর্ব বৎসর ১৮৯৮ ইংরাজীতে আমি বিলাতের ব্রিটিশ এবং ফরেন যুনিটেরিয়ান এসোসিয়েসনের (British & Foreign Unitarian Association) যুগফোড়ে যুনিটেরিয়ানদিগের নিউ মাঙ্কেটার কলেজে অক্ষিদিন ও
রাজনারায়ণ বন্ধু ও স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্য

হৃষ্টিয়ান ধর্ষে পড়িতে যাই। বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে দেওয়ার যাইয়া। রাজনারায়ণ বন্ধুর সঙ্গে দেখ। করিয়া আসি। একদিন মাত্র তাহার বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু সেদিনের কথা। জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই দিন সব্বের দেখা মহাশয়ের জীবনব্যাপী তৎসাধনের সঙ্গে ধরিতে পারিয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্বের একজন ধর্ষে প্রচারে শত এহেনচু রাঙ্গা যুবক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বন্ধু মহাশয় তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা। করেন, “তোমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে কি?” এখন শুনিয়াই বেচারী ধর্ষে যাইয়া যান। বন্ধু মহাশয় তখন কহেন, “ব্রহ্মদর্শন নাভ যাহার হয় নাই, সে আবার অঙ্গধর্ম প্রচার করিবে কি করিয়া?” কথাটা শুনিয়া আমি চক্ষুর তৃপ্তি। উঠিলাম। দেখিলাম, রাজনারায়ণ বন্ধুর ধর্ষে প্রচারের আদর্শ কতটা উচু। যে নিজে সিদ্ধ লাভ করে নাই, সে অপরকে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিবে কি করিয়া? কথাপ্রসঙ্গে বন্ধু মহাশয় আবার কহিলেন যে অঙ্গসাধনের সচরাচর যেভাবে ব্রহ্মকোপসনা হয়, তাহচতুর্থ লোকারণ। নহে। একটা ব্রাহ্মণের নাম করিয়া কহিলেন, “আমুককে জান ত? তিনি আমার এখানে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। আমার প্রতিদিন দুবেলা চোক চুলিয়া কত কি বিড়বিড় করিয়া কষ্টকেন। এই তাহার ব্রহ্মকোপসনা ছিল। আমি একদিন বিকট হইয়া। তাহাকে কহিয়াছিলাম, “এই বিড়বিড় করিয়া কি কেবল ব’কে ইহাতে কি ব্রহ্মের উপাসনা হয়? ব্রহ্মের উপাসনা যদি করিতে চাও তাহা হইলে ওই বাহিনা যাও, আর চোখ মেলিয়া। একবার এই আকাশপানে তাকাইয়া দেখ।” বুঝিলাম, এই বৃহৎ সাধক কোন পথে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিয়াছিলেন। আমার বিলাত যাইবার প্রসঙ্গে উঠিলে রাজনারায়ণ বন্ধু কহিলেন, “দেখ, আমি বিলাত গিয়া ধর্ষে প্রশিক্ষণ পাপনাতী নহি। তোমাদের শিবনাথের
মতন আমি বিলাতী শাস্ত্রী নহি। ইংরাজী ধর্মসম্পর্কে আমাদিগকে কিছু শিখাইতে পারে এ বিশ্বাস আমি করি না। লাভের মধ্যে তাহাদের সংসর্গে আমাদের প্রকৃতি বিগড়াইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তাহার যদি আমাদের ধর্মসম্বন্ধে কিছু শুনাইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে যাও। নতুনা তত্ত্বজ্ঞান বা ধর্মসম্বন্ধের আশায় সে দেশে যাইও না।”

আমরা ভারতবর্ষের লোক, বর্ষমানে যতই অধ্যাপিত হই না কেন, জগতের একটি শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী বলিয়া মানবসমাজে আচার্যের আসনে আমাদের অধিকার আছে, চিরদিন রাজনীতিবিদ বস্ত্র এই বিশ্বাস ও অভিমান ছিল। এই বিশ্বাসের বশবৃত্তি হইল তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ-প্রতিপাদক বস্তুতঃ প্রদান করেন। রাজনীতিবিদ বস্তু নিজে কহিয়াছেন যে এই বস্তুতাতেই পরবর্তী হিন্দু পুনরুদ্ধারের বা Hindu Revivalএর ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। যেকালে এদেশের ইংরাজী-নবীনের। হিন্দুধর্মকে ভয় ও কুসংস্কারাচ্ছাদিত বলিয়া ঘোষণা করিতেন, নূতন কৃতিত্ব সমাজে হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই উপেক্ষার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে একজন ইংরাজী-নবীনের পক্ষে একদিকে প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করিয়াও অন্যদিকে হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচার করাতে কথা সংসাহস এবং স্থলপ্রধীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর এই স্বাজাত্যাতিহিতের প্রথম পুরোহিত ও প্রতারকরূপেই রাজনীতিবিদ বস্তু মহাশয় বাংলার নবরাজ্যের ইতিহাসে চিরকালীন হইয়া রহিলেন।

এখন কলিকাতা। বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত বাংলা। ভাষা। ও বাংলা। সাহিত্যকে এই বিচা-মন্দিরের ভিত্তরে বরণ করিয়া তুলিয়া। লইয়াছেন। কিছু একদিন ছিল যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব সম্প্রদায়
রাজনারায়ণ বসু ও স্বাদেশিকতার উদ্দেশ্য

বাংলা ভাষায় পরম্পরাগত মধ্যে কথাবার্তাও কহিতেন না, পত্রবাহারও করিতেন না। অথচ সেই যুগেই কৃতবিজ্ঞ রাজনারায়ণ বসু শিক্ষিত বাঙালী সমাজে বাংলা ভাষাটি চালাইবার জন্য ব্যর্থ হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরে তাহাদের এক সভা ছিল। এই সভার মঞ্জুলিসে সভাধিকারকে বাঙালিতে কথাবার্তা কহিতে হইত। এই কথাবার্তায় ইংরাজী শব্দের বুক্তমোলা দেওয়া। একবারই নিষিদ্ধ ছিল। যদি কোনও সভাকে কোনও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার জন্য তাহার অর্থাত হইত। প্রতিটে ইংরাজী শব্দের জন্য বুঝিতে এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইত। এই উপায়ে সভার অর্থাত মেরে দ্বিপয়সা সঞ্চিত হইত। এই সকলই রাজনারায়ণ বসুর আঘোনোধোনো স্বাদেশিকতার প্রমাণ।

(৪)

রাজনারায়ণ বসু কেবল ধর্মে বা তত্ত্বজ্ঞানেই নিজের দেশকে জগতে বরণ করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে সকল জ্ঞান এবং সাধন। তাইলে একটি জাতি সর্বত্র পরিস্ফুট করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এদেশে স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন ছিল না। বলিলেও চলে। কৃতবিদ্বেষ। নিজেদের হীনতাবোধে সর্বদাই অবনত হইয়া থাকিতেন। বিদেশীয়েরা তাহাদের অপেক্ষা যে কত বড় ইহা ভাবিয়া তাহাদের মুখে স্বদেশের গৌরবের কথা ফুটিবার অবসর পাইত না। জন- সাধারণের গতানুগতিকভাবে দেশে প্যাহা চলিয়া। আসিয়াছিল তাহাদের অনুভবন করিলেও জানের দ্বারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বা গৌরবের কোনও হেতু আছে ইহা ধরিতে পারিত না। কৃতবিদ্বেষ।
ইংরেজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। জনসাধারণের
ইংরেজের অভ্যাস ও প্রবল প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া
পড়িয়াছিল। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কাহারও মধ্যে ঐতিহা-
স্তাগোপাল মিত্র হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কলা, এবং অন্যদিকে “জাতীয় গৌরব সম্প্রদানী” সভার
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি “আত্মচরিতে” লিখিয়াছেনঃ—

“এই সভার কার্যাবিষ্কার হইতে ‘Prospectus of a Society
for the promotion of National Feeling among the
educated natives of Bengal’ রচিত হয়। হাইকোর্টের
জন শক্তিকার্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে যদি উক্ত সভা সংস্থাপিত হয়,
তাহা হইলে তিনি তাহার সহাপতি হইবেন। ঐ পুস্তিকা হইতে
বাঙ্গলাবিষ্কার নবগোপাল মিত্র হিন্দুধর্মের ভাব পান। তিনি ঐ মেলা
এবং তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। “জাতীয় গৌরব সম্প্রদানী”
সভার সভ্যেরা ‘good night’ না বলিয়া ‘স্ব-জন্ম’ বলিতেন।
১লা জানুয়ারী দিবসে পরম্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখ
করিতেন; আর ইংরাজী বাঙ্গালা না মিশাইয়া। কেবল বিশ্বাস বাঙ্গালাতে
কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন।”

রাজনারায়ণ বঙ্গ বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাহার সময়ের উপরে
তাহার বক্তব্য হইতে উক্ত এই কথাগুলি যেন অক্ষিত থাকে।

“প্রেতি অধ্যাত্মোগাের জীবন, প্রেতি সৎকার্যের জীবন, প্রেতি
ধর্মপ্রচারের একমাত্র উপায়।

“শব্দেশযায় লোকের মন বিদ্যা দ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে,
অনুমতি ও অস্বস্ত হইতে নিকুঞ্জ পাইবে, জ্ঞানমূল্য পান ও স্বাধীন
ধর্মশুদ্ধিন করিবে এবং জাতীয় ভাব লতাপূর্বক সভা ও সংস্কৃত
হইয়া মন্মথায়তি সমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে। এই মহৎ কল্পনা সুসংস্কার করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আবৃত্তি থাকেন!”

এই কয়টি কথার ভিত্তিকেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেই আমরা তাহার গভীর এবং আমরণসাধ্য ব্যক্তিপ্রাপ্তির এবং ব্যক্তিত্বাভিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই। আমাদের আধুনিক কৃত্বিদ্যামাঙ্কে এ বিষয়ে তিনিই প্রথম গুরু ছিলেন। তাহার Grand-father of Indian Nationalism উপাধি সর্বোপরি সার্থক ছিল।
নবম কথা

হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

আজিকালিকার বাঙ্গালী বোধ হয় অনেকেই নবগোপাল মিত্রের নাম জানেন না, কিন্তু বাংলার নবযুগের কথ্য তাহার জীবন ও কর্মের উপেক্ষা করা সম্ভব নহে; করিলে এই যুগের একটা প্রধান অধ্যায় অপূর্ণ দাঁড়ায় যায়। পক্ষাঙ্গ বৎসর পূর্বে নবগোপাল মিত্র কলিকাতা সমাজে স্থপরিচিত ছিলেন। মহাশিব দেবেন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। কলিকাতা বা আদি-ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট যোগ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র যখন মহাশিবের ছাড়িয়া আসিয়া নূতন দ্রাক্ষ সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে উচ্চুত হন, সে সময়ে মহাশিব ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নবগোপাল মিত্র মহাশিব তাহার কর্মের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার করিবার মানসে কেশবচন্দ্র দ্বিতীয়ের যে সাধারণ সভা আহ্বান করেন, সে সভায় নবগোপাল মিত্র মহাশিব উপস্থিত হইয়া কেশবচন্দ্রকে পড়ি পড়ি বাধা দিবার চেষ্টা করেন। এই সময়েই সর্বপ্রথমে নবগোপালবাবু, সেকালের শিক্ষিত সমাজের নিকট স্থপরিচিত হ'ন। ইহার দুই তিন বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় ভারত গভর্নমেন্ট যখন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন করিতে উচ্চুত হয়েন, তখনও নবগোপাল মিত্র মহাশিব কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষকৃপে এই আইন বাহাতে পাশ না হয় তাহার জন্য বিশেষ আশ্চর্য আন্দোলন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত হিন্দু
বিবাহের পৌন্তুলিক অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম-বর্জিত অপৌন্তুলিক ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি নিজের পরিবারে প্রবর্তিত করেন। এই পদ্ধতি শালগ্রামুন্নাদিত, মহর্ষি ইহাই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। শালগ্রাম হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের মূখ্য অঙ্গ নহেন। বিবাহ-কালে শালগ্রাম সাক্ষীগোপালের মতন উপস্থিত থাকেন বটে, কিন্তু পূজা অচর্চনা প্রাপ্ত হ'ন না। হিন্দু বিবাহের মূখ্য অঙ্গ হোম বা কৃষিগণ্ডা এবং সমপদীগমন। মহর্ষি তাহার বিবাহ-পদ্ধতিতে এই দুইটি অঙ্গকেই রক্ষা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহার ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতিকে তিনি সংস্কৃত এবং পৌন্তুলিকতাবিশিষ্টতা সত্য হিন্দু-বিবাহ-পদ্ধতিরপেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ বিবাহ যে সর্বত্রে অভাবেই আইন-সঙ্গত নহে, মহর্ষি একথা ধীরাকর করেন নাই। এইজন্য পৌন্তুলিকতাবিশিষ্ট ব্রাহ্মবিবাহকে আইন-সংক্রান্ত করিবার জন্য মহর্ষি ইঞ্জারের ধারে উপস্থিত হন নাই। ইঞ্জার বিদেশী রাজা। ইঞ্জার রাজপত্তায় হইয়াছে বটে, কিন্তু সমাজ-পতি হয় নাই; কখনও হইতেও পারিবে না। ধর্ম-সাধনী ও সামাজিক জীবনে বিদেশী ইঞ্জার-রাজের কোনও প্রকারের অধিকার যুক্তিকারে প্রবেশ করিতে দিলে, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ত গিয়াছে বটেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-সাধনীর ও সামাজিক শাসনের স্বাধীনতাটুকুও লোপ পাইবার অশ্লীল উপস্থিত হইবে। এইজন্য মহর্ষি এবং কলিকাতা ব্রাহ্ম-সামাজের সভাগণ কেশবচন্দ্রের নূতন আইনের যোগ্যতার বিরোধী হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধে নবগোপাল মিত্র মহাশয় একজন অগ্রী পূর্বক ছিলেন। আর যদিও একটা বিশেষ আইন লইয়া এই বিরোধের উৎপত্তি হয়, ইহার মূলে একদিকে স্বাধীনতা ও অন্যদিকে স্বদেশের বৈশিষ্ট্যা ও জ্ঞানগরিয়ার প্রতি উপেক্ষা, এই দুইটি ভাব লুকাইয়া ছিল। মহর্ষি এবং তাহার সঙ্গীগণ স্বাধীনতার
প্রেরণাতেই কেশবচন্দ্রের এই প্রয়াসের প্রতিবাদী হন। এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সহির্ষ কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ গতির ক্ষেনাপরের নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করেন। এই আবেদনে তাহারা বলেন যে—(১) ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের বহিষ্কৃত নহেন; এই আইন পাশ হইলে তাহাদিগকে হিন্দু-সমাজ-বহিষ্কৃত হইতে হইবে, এবং এইরূপে বহিষ্কৃত হইলে তাহাদের অধোগতি অবশ্যামী; (২) হিন্দুসমাজের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহাদিগের বিবাহ-প্রণালী স্বতন্ত্র, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এরূপবলে ব্রাহ্মসমাজ পৌরাণিকতা পরিত্যাগ করিয়া যে প্রণালী নিবন্ধ করিয়াছেন, তাহার বিধিনিদর্শক করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? (৩) নূতন ব্যবস্থাতে ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে কোনও বৈধান্তিক নিয়ম না থাকাতে হইলে ব্রাহ্মণের দুঃখের অভাব উৎপাদন করিয়াছে। এই আবেদনে আরও অনেক কথা ছিল। কিন্তু উপরিভাগ নিত্য অপনি হইতেই মহর্ষি এবং উহার অনুচররা যে ন্যায়শিকিত্বের প্রেরণাতেই বিশেষভাবে কেশবচন্দ্রের এই চেষ্টার প্রতিবাদ করেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। নবগোপাল মিত্র মহাশয় সেকালের এই ন্যায়শিকিত্বের একজন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আর এই জন্যই তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে এই বিরোধে প্রবৃত্ত হন।

(২)
আজ্ঞাকালি আমরা ন্যায়শিকিতা বলিয়া কেবল হিন্দুমানী বুঝি না। কিন্তু চলিয়াগলে বংশ পূর্বে এদেশের ন্যায়শিকিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা কুটিয়া উঠিয়া নাই। সেকালে এই ভারতবর্ষে কেবল হিন্দুই দেশ, মুসলমান প্রভৃতি এদেশের উপর কোনও বিশেষ দাওয়াদারী আছে, ইহা শিক্ষিত-সমাজের মনে উদয় হয় নাই।
হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

ইংরাজ যেমন পরদেশী, পকাশ বৎসর পূর্বে এদেশের নবাশিক্ষিত লোকেরা এদেশের মুসলমান এবং বৃহিত্যানকেও সেইরূপ পরদেশী বলিয়া মনে করিতেন। সেকালের বাংলা সাহিত্য ইহার বিশেষ প্রমাণ। সে কথা ভগবদ্গুৰ্ব্বয় সময় ও শক্তি পাইলে ক্রমে খুলিয়া বলিব। আর এই সদ্ভাবনা স্বাদেশিকতার প্রকাশিতেই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দু ধর্মের শাস্ত্র প্রতিপাদক বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়। সৈয় সদ্ভাবনা স্বাদেশিকতার প্রকাশিতেই মহবি দেবনৃনাথ রায়সমাজের হিন্দুবেল গাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাহারই জন্য কেশবচন্দ্রের রাজ্য বিবাহ-বিধির প্রতিষ্ঠার করণ। আর সৈয় স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রকাশিতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নামের বারাই তাহার স্বাদেশিকতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সে সময়ে অন্য আদর্শের অন্যস্রষ্টা একন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলিলেও হয়। ইংরাজীরা এদেশে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করেন, তাহারই ফলে আমরা বহু শতাধিক ঘোর নিজায় অবসানে আধুনিক চিন্তা ও কর্ম জগতে জাগিয়া। উঠিয়াছি। ইংরাজী শিক্ষার শত প্রকারের ক্রটি ও অপূর্ণতা সত্বপ্রস্ত এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে। আর হিন্দুরাও সব প্রথমে এই নূতন শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হয়েন। মুসলমানেরা বহুদিন পর্যন্ত এই নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাহারা তাহাদের বল্পে গৌরবের ও হৃত তত্ত্বাবধারের মূলত বুকে দরিয়া। বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের অনুশীলন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্তত্রাং তাহারা প্রথম হইতে ভারতের এই নব-জগৎকে নারায়ণ আসিয়া পড়িতে পারেন নাই। শিক্ষিত হিন্দুদের সঙ্গে সাধারণ স্বাদেশিকবিজ্ঞানের ভূমিতে আসিয়া। মিলিত হন নাই। এই সকল কারণে আমাদের প্রথম যুগের স্বাদেশিকতা।
নবযুগের বাংলা

যে হিন্দুদের অভিমানকেই আত্মরূপ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই জন্মই আধুনিক বাংলার প্রথম স্বাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহামেলার নামে অভিহিত না হইয়া। হিন্দু মেলা নামে অভিহিত হয়।

( যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কাজেও ইহা হিন্দু মেলাই হইয়াছিল। ইহার অম্লাতৃত্ত সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে সকল বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, তাহা সকলই হিন্দু ভাষার দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ-গরিমায় পরিপূর্ণ ছিল।

শ্রীযুক্ত সতেজনাথ ঠাকুরের স্বপ্রসিদ্ধ ভারত-গাথা—

জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়—

নবগোপাল বাবুর প্রথম হিন্দু মেলার জয় রচিত হয় এবং মেলার উদ্বোধনের দিনে গীত হইয়াছিল। স্বর্গীয় মনোমোহন বন্ধু মহাশয়ের—

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন
অন্বেষণ শীর্ষ, চিন্তাগ্রহণ জীর্ণ,
অন্ধেরে তমু কীণ।

ভীতি, কশ্মীরী করে হাহাকার, সূত্র জ্ঞাতা ঠেল অন্ন মেলা ভার, দেশী অন্স শশা বিকায় নাকে। আর,

হায়রে দেশের কি দূর্দিন।
চুঁচ সূত্র পর্যন্ত আসে তুষ্ণ হতে দিয়াশ্লাই কার্টো ভার আসে পোতে
দেখে শুরু যেতে প্রাদীপটা জালিতে

কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।
হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

আজ যদি এ রাজ্য চাড়ে তুষ্ণরাজ
কলের বসন বিনা কিনে রব লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগন্ধরের সাজ
বাকল-টেনা ডোর-কোপীন।

সত্যেন্দ্রনাথ “গাও ভারতের জয়” এবং চমনোমোহন বন্দ্র
“দিনের দিন সবে দীন” এই দুইটি সঙ্গীতের মধ্যেই নবগোপাল মিত্র
মহাশয়ের ও তাহার প্রবর্তিত হিন্দু মেলার অন্তরঙ্গ ভাবের ও
আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্যোতির্বাহু ভারতে প্রচার শৌর্য বীর্যের প্রবল জাগাইয়া।
নবদেবাসীগুকে এই নবযুগের নূতন শৌর্য বীর্য সাধনায়
প্রবৃদ্ধি করেন। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সাধনার একটা
নতুন পাঠশালা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে
কাহারে ক্যাভেল বাংলার চোট লাট ছিলেন। তাহার শাসন
কালেই আমাদের স্কুল-কলেজে ব্যায়ামচর্চা প্রবর্তিত হয়। ইংরাজী
নকমের ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং ধূলা বড় স্কুলে এক একজন
কীমতী মাস্টারাঁও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজী পার্লেলাল বার
(parallel bar), হরাইন্টাল বার (horizontal bar), টীকিও
প্রস্তুতি বিলাসী ব্যায়ামের উপকরণ লইয়া বাঙালী বালক ও
মিত্রকর্তৃক দিয়া বাঙালী বালিকা শিক্ষার উপকরণ উপস্থিত করেন।
নবগোপালবাবু একটি ব্যায়াম
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ষালিশ গৃহে শক্তর ঘোষের লেনের
মোঢ়ে নবগোপাল বাবুর পৈতৃক ভ্রাতৃসন্তান ছিল। ইংরাজী প্রবন্ধকে
পূর্ববর্তী শক্তর ঘোষের লেনের ভিতরে ১নং বাড়িতে নবগোপালবাবুর
এই “আঘড়া” ছিল। এই আঘড়াতে বিলাসী ব্যায়ামের সকল
সরঞ্জামই ছিল, কিন্তু নবগোপাল বাবু কেবল বিলাসী ব্যায়াম
নিভাইয়াই কষ্ট ছিলেন না। আঘড়ার বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে লাঠি
খেলা, তরোয়াল-খেলা, গুলিল-খেলা এবং বন্দুক-ছোঁড়া পর্যন্ত শেখান হইত। নবগোপালবাবু মহর্ষির ব্রিটিশ-বিদেশী ছিলেন, এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ অন্তঃবিদ্রোহে ব্রিটিশের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়, অহিংস তাহারই ধান করিতেন। ভারতবর্ষ বাহ্যবলে ইংরেজের নিকট হইতে গিয়াছে, তাহার এই ধারণা ছিল। স্বতরাং ইংরেজ তাড়াইতে হইলে এই বাহ্যবলেরই ভঙ্গ করিতে হইবে, ইহাই তাহার স্বাধীনতামূলক ছিল। কিন্তু অন্যবল ব্যতিরেকে বাহ্যবল লাভ সহ্য নহে। আবার ইংরেজ আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে করিয়া ভারতবর্ষকে নির্মল ও বিবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। স্বতরাং ইংরেজের কবল হইতে স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে না পারিলে দেশের লোকে গেট ভরিয়া খাইতে পারিব না, অল্পবলের অভাবে অন্ধকার ও রোগে শীঘ্র এবং নিদর্শন চিন্তাজ্ঞের জীবন হইয়া রহিবে। স্বততির বাহ্যবলের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নির্জনের আর্থিক অনিয়ম হইবে! স্বদেশের বিপদ হইতে বিদেশের পণ্যের বহিঃচর্িত করিয়া দিতে হইবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের চরম উন্নতি সাধন করিতে হইবে। এই সকলই—ব্যায়াম-চার্ট, অশ্রুরোগ-ব্যাধিশিক্ষা, স্বদেশের পণ্যজাতির পুনরুদ্ধার—নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের স্বদেশ-পূজার মূল্য উপকরণ হইয়াছিল। এই সকল ভাব ও আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা করেন।

(৩)

হিন্দু মেলাতে স্বদেশী পণ্যের প্রসারিত হইত। ব্যায়ামাধিক পরীক্ষা হইত, এবং স্বাধীনতাতে উদ্দৃত করিবার উপযোগী সঙ্গীত ও বক্তৃতার হইত; পণ্য ও ব্যায়াম প্রসারকর্তার প্রতিযোগ সভায় অভিনব হইত এবং ব্যায়ামের মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইত। বৎসরে
হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র

একবার করিয়া মেলা বসিত। কিন্তু বৎসর ধরিয়া নবগোপালবাবু এবং তুঁহার সহকারী ইহার আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। শশির ঘোষের লেনের আখড়ায় বায়াম-চর্চা হইত। তখনও অঞ্জ-আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। মসুরাং বন্দুক-ছোড়া বা তরামাল-খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু মেলার বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পাখি শিকারের ভান করিয়া বন্দুক-ছোড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন। এই হিন্দু মেলাতেই প্রথম নূতন রকমের উঠান প্রদর্শিত হইয়াছিল একুশ মনে পড়ে। ত্রিপুরা জেলার সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকঙ্কার খাটোনাম। ডাঃ মহেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতায় ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া—অথবা কলেজ হইতে বিভাজিত হইয়া—মহেশ্বরবাবু তখন পটুয়াটুলিলেন খাঁকিয়া একটা নূতন কলেজ উদ্বাস্তব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একটা উঠান তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে যেন মহেশ্বরবাবু এই নূতন উঠান হিন্দু মেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সঠিক কথিতে পারি না। কিন্তু এরূপ শুনিয়াছি যে শ্রীযুক্ত জ্যোতির্মিশ্বর নাথ ঠাকুর মহাশয় এই উঠানে তৈরী গামছা মাঠের বাঁধিরা হিন্দু মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন—লোকে বলে নাচিয়াছিলেন। তাহা অস্বীকার নহে; কারণ তখন নবগোপাল বাবু ও তুঁহার সঙ্গীরা নূতন ব্যবস্থাভাবে একবারে মাটোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহেশ্বরবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে এই সময়েই জ্যোতি বাবুরা নন্দী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া। রবিরাগে রবিরাগে ধাপার মাঠে 'শিকার' করিতে বাহিতেন।

( ৪ )

কয়বার এই মেলাট বসিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। শেষবারের মেলাতে একটা জাকালে। রকমের মারামারি হয়। তার পর হইতেই:

১৯"
হিন্দু-মেলা বন্ধ হইয়া যায়। এই মেলাতে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। চালায় রাজা বদনচাদের বাগানে এই মেলা বসে। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। স্রীমুঢ় স্বরেশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ৩০ আনন্দমোহন বন্ধু মহাশয়ের সহযোগে কলিকাতার ছাত্রমহলে একটি নূতন স্থান-প্রেরণের বন্ধু আনিয়াছিলেন। সে কথা সবিতারে আর একদিন কহিব। আমরা কেবল স্বরেশ্বরনাথেব বক্তৃতা শুনিয়াই ক্ষুদ্র রহি নাই। স্থানের উক্তারের জন্য যৌবন-স্ত্রী উৎসাহ ও কলনার প্রেরণায় যথাসম্ভব আয়োজন এবং উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। এই ভাবের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের “আখড়া”তে যাত্রা হই। এই সূত্রেই সেবারকার হিন্দু মেলাতেও আগমনেরকারে যোগদান করি। মনে পড়ে বেশ রাজ্যানিয়ন্ত্র বন্ধু মহাশয় এই মেলায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এবারে বোধ হয় তিনি কোনো বক্তৃতা করেন ‘নাই। কে কি বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা কিছুই মনে নাই। মনে আছে কেবল মারামারির কথা। আর একরূপ আমা হইতেই এই মারামারি হয় বলিয়া তাহার ইতিহাসটা আমার জীবনের স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। বিপ্রহরের পর ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন হয়। বাগানটা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল বাঙ্গালীরাই যে মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা নহে; চুদরমন্দীর ইংরাজ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ দর্শকদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের কেন্দ্রীয় অধ্যাপক পেড়ুলার সাহেব এবং ভারত গভর্মেন্টের রাজনীতি-সভার স্থলে আর জন গ্র্যাস্টি এই দুই জনের নাম মনে আছে। বক্তৃতাদি গরের ভিতরে হইয়াছিল। বাহিরের ময়দানে ব্যায়াম-প্রদর্শনের আয়োজন হয়। আমি একখানা চোক লইয়া ব্যায়াম দেখিবার জন্য
বাহিরে যাইয়া এক যায়গায় বসিলাম। কিছু মাত্র পরে একজন হাটকোটারী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমার পিছনে দাঁড়াইলেন। হঠাৎ ইংরেজ কি ইউরোপিয়ান ছিলেন, ঠিক বলিতে পারি না। পুরুষটি অতি রোডস্বভাব আমাকে চেয়ারটি হাড়িয়া দিতে হুকুম করিলেন। আমি সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না, যেমন বসিয়াছিলাম তেমনই বসিয়া রহিলাম। তখন সাহেবটি আমাকে চোখে হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহিলেন। আমি তখন উঠিয়া চোকিখানার সামনের পা দু'হাতে শক্ত করিয়া ধরিলাম ও নীরবে চেয়ারখানিকে তাহার হাতছাড়া। করিবার জন্য শরীরের সকল বল প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। আমি তখন চেয়ারের লাগি দাঁড়াইলেন। তাহার পর আমি চেয়ারের ছাড়িয়া দিয়া ফেলিয়া তাহার পঞ্চমের মাদক বাহিরে আসিয়া একটা ফাঁক জায়গায় দাঁড়াইলাম। তখন সাহেব-বাঙালীতে পুরুষদের মারামারি সরু হইয়াছে। তাহার পরে পুলিশ আসিয়া হাজির হইল। লাইথ্যাম নামে একজন ইংরেজ চিত্রপুর অঞ্চলের পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। মারামারি আরম্ভ হইলে সেখানে ছুটিয়া যান। ইহাতে কিছু আসিয়া বাইত না। কিন্তু তিনি সেখানে যাইয়াই সাহেবদের পক্ষ অবলম্বন করেন; এবং সুনিয়ালি যখনসাধা বাঙালীদেরকে মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করেন। বাঙালীরা তখন লাইথ্যাম সাহেবকেও শিক্ষা দিতে অগ্রসর হয়। সে সময়ে কলিকাতার বাঙালী পত্রিকার দলে একজন অসাধারণ শক্তিশালী পালোরান ছিলেন। তাহার হাতে লাইথ্যাম নিরতিষ্ঠ লাগিয। প্রাপ্ত হন; সুনিয়ালি তিনি লাইথ্যামের
ছুটি হাতে ধরিয়া কাঠিন্যার। যেমন করাত দিয়া কাঠ চারে, সেইরূপ ভাবে একটা আমাতে ঘটিয়াছিল। সামাজিক মারামারির জন্য বড় না হতেক, স্থানীয় পুলিস সাহেবের এই লাইনার দরুণই পুলিসের হল। হলুদান সিঁড়ির দল খালি গায়ে মালকোচা মারিয়া, কোমরে চাপারশ বাঁধিয়া বাগানে যাইয়া। উপস্থিত হন। শত্রুকের এই নূতন শক্তি সংগ্রহ দেখিয়া বাঙালী যোজ্যের একটা ইটের চিকির উপর যাইয়া দাড়াইলেন, এবং সেই ইট ছুড়িয়া। পুলিসের দলকে আটকাইতে চেষ্টা করিয়া লাগিলেন। বাগানের ফটকের কাছে কোনও ইট পাটকেল ছিল না। ফটকের সামনেই পুকুর। পুকুরের ওপারে বাঙালী যোজ্যেদের বৃহৎ। পুলিসের বড়ই মুক্তিলে পড়িলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ ধরিয়া লড়াইটা চলিল। শুনিয়াছিল সদ্যকাল পর্যন্ত নাকি ইহে চলিয়াছিল। শুনিয়াছি বলিয়া এই ইটে আমি এই যুদ্ধের প্রথমেই পুলিসের হাতে বন্ধী হই। আমা হইতেই মারামারির সূত্রপাত; মারামারির মূল কারণ চেয়ারখানি আমি হলার বাহারে আসিয়াও পাশ দিয়া ধরিয়া লড়াইয়াছিলাম। এমন সময় দেখিলাম যে একজন পুলিসের জমাদার ও দুর্ঘন্ন কনস্টেবল একটা যুবকের পিছনে ছুটিয়া। গিয়া তাহাকে মাটিতে পাড়িয়া বেদম মুখ্যাতি করিতেছে। আমার মনে হইল যে এই যুবকটি আমার বড়ু শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। আমি অমনি সহ চেয়ার লইয়া যাইয়া। সহ জমাদার ও কনস্টেবলদের আক্রমণ করিলাম। তাহারা তখন সহ যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে ধরিল; আর অমনি আরও পাঁচ হর্ষ পুলিস আসিয়া। আমাকে ঘেরাইবার বে যুবকটিকে পুলিস মারিতেছে দেখিয়া। আমি তাহার সাহায্যের ছুটিয়া গিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম সে সুন্দরীমোহন নহে। সুন্দরীমোহন তখন অক্ষম মারামারির বাহিরেই দাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে পুলিস
ষেরা করিয়া মারিতেছে দেখিয়া। তিনি ছুটিয়া আসিয়া। নিজের শরীর দিয়া আমার শরীরকে রক্ষা করিতে গেলেন। তখন পুলিস তাহাকেও গ্রেপ্তার করিল। এইসময়ে আমি হংসনে সকলের আগে বদনী হই। আমাদের দু’জনকে যখন পুলিস বাণিজ্য লইল। যাহা, তখনও দলে দলে হংসনাম সিংহের দলে বন্দরোদের বাগানের দিকে ছুটিয়া হাইতেছিল। তাহার পরেই লড়াইটে ভাল করিয়া জমাট বাধে। কাজেই সকল ব্যাপারটা ব্যক্তিকে দেখি নাই। লাইহামের লাঞ্জানও দেখি নাই; বাঙালী যুবকদের রণনীতিয় দেখি নাই। কি করিয়া যে তাহারা বহুক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহ সন্ধান ইল ছুড়িয়া। পুলিসের কটকের ফটকের মুখে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাও দেখি নাই। এ সকল পরে শুনিয়াছি।

এই মাজামারির সংবাদে মন্দরামোহন এবং আমি ছাড়া আরও হংসনে গ্রেপ্তার হন। তাহাদের একজন নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের কুটুম্ব; তাহার জামাতার সহায়। ইনি হাওড়া গভর্নমেন্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক বা জিম্মেন্টিক মাস্টার ছিলেন। শিয়ালদহ পুলিস আদালতে আমাদের বিচার হয়। শোভাবাজারের রাজা হরেশ্বরকুঞ্জ দেব বাহাদুর তখন শিয়ালদহের পুলিস মাজিস্ট্রেট ছিলেন। নবগোপাল বাবুর কুটুম্বের পৃষ্ঠায় টাকা ও আমার কুড়ি টাকা জরিয়ানা হয়। হুবচার হইয়াছিল কিনা সে কথা তুলিতে চাহিনি।

( ৫ )

নবগোপাল বাবুর একখানি ইংরেজী সাংবাদিক কাগজ ছিল; নাম—National Paper ( সাব্যসনাল পেপার)। কাগজদারির ইংরেজী প্রায় আগাগোড়াই ভূল থাকিত। ইহাও তাহার স্বাদেশিক-তার একটা লক্ষণ ছিল। বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্ম তাহার বিন্যাস।
অমৃতার ছিল না। এই স্মৃদেশিকায় নবগোপাল মিত্রের চরিত্রের বেশিক্তা ছিল। আর সে যুগের বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথমে হাতে কলমে এই স্মৃদেশিকায় আদর্শটাকে গড়ে তুলিবার চেষ্টা করেন। এইজন্য বাংলার নবযুগের ইতিহাসে নবগোপাল নিত্মাহাদিয়া এবং তাহার হিন্দু মেলাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।
দশম কথা

সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র

কোনও সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাবের প্রভাবে যখন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, কবিতা, নাট্যকলা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই নূতন জীবন আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এ সকলের দ্বারা সেই সমাজের নবচেতনা ও নূতন প্রাণতার প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্মতত্ত্ব, দর্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য-গাথা পর্যায় জাতির ভাব ও চিন্তা যে দিকেই নিজেকে ভাষার ভিত্তি দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তার সাক্ষ্যমাত্র সুখ। বাংলার নবযুগের সাহিত্য বলিতে এইরূপ সাক্ষ্যমাত্র সুখ। অক্ষরকূপের দলের বৈজ্ঞানিক প্রবক্ষ, বিজ্ঞানীদের তত্ত্ববিদ্যা, কালীপ্রস্ত সিংহের “হর্ষম পোঁচার নাঙ্কা,” পারীচাদের “আলালের ঘরের দুলাল,” ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা, মাইকেলের মহাকাব্য ও গীতিকাব্য, এসকলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মাধ্যমের আধুনিক গান পর্যায়ে সকলেই বাংলার নবযুগের নূতন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সকল নূতন সাহিত্য স্থষ্টির মধ্যে এই নবযুগের প্রাণ-বস্ত্র নিকৃত সাড়া থাকিলেও, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য স্থষ্টিতে এই প্রাণ-বস্ত্রের প্রকাশের ভাবতমা আছে। কোনও সাহিত্য স্থষ্টিতে এই প্রাণবস্ত্র বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা আঞ্চলিক প্রাকাশের অবসর পায় নাই। আর এই ভাবতমা আছে বলিয়াই যে সাহিত্য স্থষ্টির মধ্যে এই প্রাণবস্ত্র বিশেষভাবে ফুটিয়াছে, তাহাকে বিশেষ অর্থে বাংলার নবযুগের সাহিত্য কবিতে পারা যায়। এই অর্থেই
বাংলার নবযুগের সাহিত্যে বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই কারণেই বাংলার বর্তমান নবযুগের সাহিত্যের কথা কহিতে যাইয়া বিশেষভাবে প্রথমে বঙ্গদর্শনের কথাই কহিতে হয়।

( ২ )

কিন্তু বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আকর্ষক ব্যাপার নহে। সাহিত্য মাত্রেই চিন্তা ও ভাবের রাহন। বাংলার বর্তমান নবযুগের ইতিহাসে প্রথমে যুগপ্রবর্তকরূপে রাজ্য রামমোহনকে দেখিয়াছি। স্থতরাং রাজ্য রামমোহনই বাংলার নবযুগের সাহিত্যেরও প্রথম প্রবর্তক, একথা বলা বাঙ্গা মত। রাজ্য রামমোহন যে চিন্তা ও সাধনার ধারা প্রবর্তিত করেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেশ, কাল এবং পাদের উপযোগী করিয়া তাহার তৃষ্ণামাঝে সেই ধারাকেই সংস্কৃতির রঞ্জ করেন; এবং কেনও কেনও দিকে তাহাকে নূতন খাতে চালাইয়া গভীর এবং প্রশস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বাংলার নবযুগের সাহিত্যের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথের ত্রাস্মাৰ্কেরও একটি বিশেষ স্থান এবং মর্যাদা আছে। সে কালের সাহিত্যের কিছু মধ্যে প্রায় সকলেই তাহার ত্রাস্মাকে বিশেষ করিয়া তৃষ্ণামাঝে সকলের সঙ্গে সম্প্রদায় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অক্ষয়কুমারের ত কথাই নাই, তাহারই হাতে তৎ-বোধিনীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বিভাগের মহাশয়ের সঙ্গেও একসময় কলিকাতা ত্রাস্মাকের ও তৎবোধিনী সভার নিকট সন্ন্যাস ছিল। কলীপ্রসন্ন সিংহ এবং প্যারীচাদ মিত্র, ইহাদেরও ত্রাস্মাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্নায় তাহার ত্রাস্মাকের ব্যাধিত এবং তথ্যবিদ্যালয়ে বক্তৃতাদি দ্বারা বাংলার নবযুগের সাহিত্যে যে
অসাধারণ শক্তিসঙ্গার করিয়াছিলেন, লোকে একথা এখন মনে না করিলেও ইতিহাস একথা কখনই ভুলিতে পারিবে না। রাজনৈতিক বস্তু মহাশয় একদিকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অস্থির মৃত্যু সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন, অন্যদিকে সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।<br><br>এইরূপে মহিরি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে বাঙ্গালার নবীনগের সাহিত্যায় ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা এবং আদর্শ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তার পর কেশবচন্দ্রও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার অলক-সামাজ্য বাংলাতে প্রভাবে অসাধারণ শক্তিসঙ্গার করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজনৈতিক পর্যায়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ বাঙ্গালার নবীনগের সাহিত্যে একটা উচ্চ স্তর অধিকার করিয়া আছেন। যে স্বাধীনতা ও মানবতা এই যুগের মূল সৃষ্টি হইয়া। আছে, সেই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শ প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।<br><br>কিন্তু ইহা সমগ্র জাতির চিন্তা ও ভাবের ভাল করিয়া অধিকার করিতে পারিতে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই আদর্শ অনেকটা সামর্থ্যমূলক সমতার ভিত্তি দিয়াছিল। দানাহীন অন্তব্যে ধর্মী-জ্ঞানীর উদয় হইয়াছিল, তাহারাই এই আদর্শের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। দানাহীন অন্তর্যে এই ধর্মী-জ্ঞানীর উদয় হয় নাই, তাহারা ইহার সাহা পাইলেও ভাল করিয়া এই আদর্শটাকে ধরিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার আদর্শ দেশের সাধারণ লোকের ধর্মীবিশ্বাস এবং সামাজিক রীতিনীতির সংস্কারে সাধনেই বিশেষভাবে প্রকৃত হইয়াছিল। দানাহীন এই ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে যোগ দিলেন না বা দিতে পারিলেন না, তাহারা বাঙ্গালার নবীনগের নোতন সাধন। হইতে স্বল্পবিদ্যা বিকিত রহিয়া গেলেন।<br><br>নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে পঞ্জাব বৎসর পূর্বে দানাহীনের সংখ্যা ২০।
সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। আর এই সকল শিক্ষিত বাঙালীর নিকট
'বঙ্গদর্শন'ই সর্বপ্রথমে বাংলার নবীন সাধনার পূর্বাভিষিক্তপথে
আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

(৩)

'বঙ্গদর্শন' ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এক যুগান্তের প্রবর্তিত
করে। 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্বে নব্যশিক্ষিত বাঙালী বাঙ্লা বই
পড়িতেন না বলিলেও চলে। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিচারসাগর
মহাশয়ের গ্রন্থাবলী স্কুলে পড়া হইত। রাজনালের কবিতার অধুন কুলপাঠ
কবিতাবলীতে কিছু কিছু সঙ্গৃহীত হইয়াছিল। এ সকল কুলপাঠ
বাঙালী সাহিত্য শিক্ষিত বাঙালীর বাঙ্লা সাহিত্যের সঙ্কে বিশেষ কোন
পরিচয় ছিল না। বালকের স্কুল বুকে সোসাইটির প্রচারিত
“চীনদেশীয় রাজকুমার কথা” প্রভৃতি “গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীর হুপাচার্য
কথন ও কথনও পড়িত। যারা গলা পড়িতে ভালবাসিত তাহার
“গুলে বকওয়ালা” “কামিনীকুমার” প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকট
জাতীয় উপমন্তার অগ্রহ সহকারে গিলিত। আরো উপমন্তারের বাঙ্লা
অনুষ্ঠানও তখন হইয়াছে। অনেকে এখানিতে আসিয়া পড়িতেন।
মাইকেলের কবিরধীভাব তখন বাঙ্লা। সাহিত্যের মধ্যবর্তী গায়ি
উঠিয়াছে। “মেহনাদ বধ” এবং “ব্রজঞ্জন” এলুমধ্যায়ই সেকালের
বাঙ্লা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রত্নমূলে শিক্ষিত সমাজের
অভিশয় আদের বস্ত্র হইয়া। উঠিয়াছিল। তবে সকলে মেহনাদবধের
গুণকীর্তন করিলেও ততটা পঞ্চমিন করিতেন না। সেকালের
সাধারণ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে মাইকেলের অমিত্রাঙ্ক
পড়া সেজার ছিল না, পুরুষ কথিত ছিল। কিন্তু এ সকলেও মাইকেলের
প্রভাব শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল।
‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ‘চতুর্থপেঁচাটি’ ও ‘আলাবের ঘরের খুলাই’ প্রকাশিত হয়। এবং এ দু’খানাটি শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হইয়া উঠে। এছাড়া দীর্ঘবাসূ মিত্রের “নীলদর্পণ”, “নবীন তপস্বী”, “জুয়াই বারিক” এবং “সহবার একাদশী”ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীর্ঘবাসূর নাটকে সেকালের সমাজ-চিত্র বেশ কুটিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের উপরে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দীর্ঘবাসূর প্রস্তাবনাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ‘বঙ্গদর্শনের’ পূর্বকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপরে ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতা সাধন এবং ব্যক্তিগত ব্যাবহারের প্রকাশে সমাজ-সংস্কার, ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল। এই দুইটি লক্ষণই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্ম-যুগ, আর এক ব্যক্তিমত-যুগ। ‘বঙ্গদর্শন’ এই ব্যক্তিমত- যুগের সূচনা করে।

রাজ্যের রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ যুরোপীয় চিন্তার প্রভাবে অনেকটা বদলাইয়া যায়। স্বতরাং রাজ্যের পরবর্তী ব্রাহ্মসাহিত্যের যুরোপের আক্ষরিকাদিতের প্রভাবেই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিত। অক্ষর-কুমারের ত কথাই নাই, বিচারাগার মহাশয়ের মধ্যেও বিচারের প্রভাব অন্তঃসরিলের মত প্রবাহিত। ব্রাহ্মযুগের বাংলা সাহিত্যে কাজেই তেমন একটা মৌলিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ষমান নবজুরার বাংলা সাহিত্যে এই মৌলিকতাটা প্রথম ফুটিয়া আরম্ভ করে ‘বঙ্গদর্শনে’। এই জগতে বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলার চিন্তায় এবং ভাবে এক যুগান্তের উপস্থিতি করিয়াছিল। ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হইলে সর্বপ্রথমই ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী আগ্রহসহকারে বাংলা সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ
করেন। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন ও উজ্জ্বল জ্যোতিষমূলকের উদ্ধে হইয়াছিল। বক্ষিমচন্দ্র ছিলেন এই জ্যোতিষমূলকের সূর্য্যতরযুক্ত। তার তাহাকে ঘিরিয়া অক্ষয়চন্দ্র, ভারীপ্রসাদ, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নবীন সাহিত্যারথী সকল 'বঙ্গদর্শনের' আশ্রয় করিয়া বাংলার বর্তমান নবশোচের সাহিত্যে এক নূতন অভিব্যক্তিক্ষেত্র সৃষ্টি করেন।

(৪)

অর্থাদেশ খৃষ্ট শাটাহীর ফরাসীস্ চিন্তার এবং সাধনার ইতিহাসে Encyclopaedistsদের যে স্থান, আধুনিক বাংলার সাধনা এবং চিন্তার ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন' কর্তব্য। সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজি কালি বাংলার ইতিহাসের চর্চা অনেকেই করিতেছেন। অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত বাংলার বৈশিষ্ট্যের খোঁজ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও অনেক স্থান হইতেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইংরাজেরা বাংলার এবং ভারতবর্ষের যে কলিতা ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া-ছিলাম; এবং সেই ইতিহাসের আলো লইয়াই নিজেদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম। 'বঙ্গদর্শন'ই সর্বপ্রথমে ইংরাজ বাংলার যে ইতিহাস গড়িয়াছেন, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর একটা সত্য ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসে বাংলার চরিত্র ও সাধনার যে চর্চা ফুটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের ও স্বদেশের বিষয়ে বিষ্ট্র আছে, একথাটা প্রচার করে। এই প্রথমে বাংলার আধুনিক স্বাধীনতাকে 'বঙ্গদর্শন'ই সর্ব-প্রথমে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই কাজটা আরম্ভ করেন, স্বাধীন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহেশ্বর। তাহার
অকাল-মুভতাতে 'বঙ্গদর্শনের' একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নষ্ট হয়; এবং তিনি
যে গবেষণার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের সিদ্ধিপথে যথাসাধ্য
অঞ্চল হইতে পারে নাই। তবে বঙ্গমন্ডল নিজে যথাসাধ্য একরূপ
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কাজটা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।
তাহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ইহার কতকটা প্রমাণ পরিচয় পাওয়া
যায়।

(৫)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গোটা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে নির্জন অবস্থায়
পড়িয়াছিল। জনসাধারণের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে একটা স্থানীয়
শক্তির সামরিক সাহা পাইল, সেই গোলমালের নিঃশেষ হইলে পরদীশের
প্রভূশক্তির অন্তর্গত প্রতাপে একান্তভাবে অভিতৃপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।
ইংরাজের দুর্দঃখের ভয়ে দেশটা একবার জড়ুঝড় হইয়া পড়িয়াছিল।
বাঙ্গালা দেশে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকোপ বেশী দেখা যায় নাই।
স্থানীয় এই বিপ্লবের অভিযানে ইংরাজ যে নৃশংস মৃত্যুধারণ করিয়া-
ছিল, বাঙ্গালা লোকে তাহা দেখে নাই। বিহার, প্রয়াগ, অযোধ্য
অঞ্চলের এই মৃত্যু বিকট ভাবে একটি হইয়াছিল। একটি শক্তি-
শালী লোক দেখিলেই, এরূপ শুন। যায়, ইংরাজ তাহাকে পলায়ন
বিদ্রোহী বলিয়া। গুলি করিয়া মারিয়াছে, পথের লোক ধরিয়া গাছের
ডালে ফাঁসি দিয়াছে, এবং এইরূপে তাহার লোক-সংঘারের অপরিস্ফুট
করণ। করিয়া, দেশের লোকের একোবারে দমাইয়া রাধিয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। বিষ বৎসর পূর্বের বিহার,
কাশী, প্রয়াগ এবং অযোধ্যা অঞ্চলে ইংরাজী শিখিত লোকের
পর্যন্ত এ সকল কাহিনী প্রশস্ত করিয়া একোবারে কাপিয়া। উঠিতেন।
বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমরা যখন এই দেশব্যাপী জুড়ুর
ভয়টা নষ্ট করিয়া। দিবার জন্য ইংরাজের পণ্য এবং ইংরাজের স্কুল কলেজ, আইন-আদালত এবং ব্যবস্থাপক সভাদি ব্যবহার করিয়া প্রস্তাব করি, তখন কংগ্রেসের বিচার ও অনৌধ্যার প্রতিনিধিরা বাণিজ্য একটা করিয়াছিলেন যে ইংরাজ কি বন্দ বাঙালী তাহা জানে না। ইংরাজের ভীষণ মূর্তি ও অনুরূপ প্রকৃতির যে পরিচয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা পাইয়াছিল, তাহা চালুশ-পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যেও তাহারা ভুলিয়া উঠিতে পারে নাই। সেই যুদ্ধ বাহাদুরের অন্তরে এক্ষণে জ্জগিয়া আছে, তাহারা কিন্তু তাই ইংরাজের আর ঘটাইতে রাজ্য হইবে না। সুতরাং বাংলার স্বাধীনতা ও ব্যবহারের কথা সে সকল অঞ্চলে চালান অসম্ভব। বিশ বৎসর পূর্বেও যখন দেশের লোকের মনোগতি এরূপ ছিল, তখন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহাদের অবস্থা কি ছিল, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জনসাধারণের যে রূপ ইংরাজের ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই রূপ ইংরাজ-ভক্তি ধারায় অভিভূত হইয়াছিলেন। বাঙালী ইংরাজকে ভীম ভয় করিত না, কিন্তু সহায় ইংরাজকে ভালবাসিতে এবং ভক্তি করিতে। পঞ্চাশ-স্তোত্র বৎসর পূর্বে পল্লীবাসী নিরক্ষর বাঙালীর। প্রবলের ধীর। সে প্রদিপ্ত হইলে রোম্পানী বহাদুরের দোহাই দিয়া আম্বরকার চেষ্টা করিত। ইংরাজদেশে শাস্তি আনিয়াছে। চোর ডাকাতের ভয় নষ্ট করিয়াছে, ধর্মাধিকারের সকলের দ্বারা ও নির্ধারণ, আগাছাও চাপা, প্রবল ও দুর্বলকে এক করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বাঙালী ইংরাজকে ভালবাসিতে এবং ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। দেবতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে তত্ত্বাবধান ভয় মিশিয়া থাকে, বাঙালীর ভয় ডাকাতের তত্ত্বাবধান ছিল। ধর্মাধিকারের সকলের দ্বারা নির্ধারণ, আগাছাও চাপা, প্রবল ও দুর্বলকে এক করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বাঙালী ইংরাজকে ভালবাসিতে এবং ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। দেবতার প্রতি ভক্তির সঙ্গে তত্ত্বাবধান ভয় মিশিয়া থাকে, বাঙালীও ইংরাজকে তত্ত্বাবধান ছিল।
সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্গচন্দ্র ১৫৯

রাজের ভয়েও বাঙ্গালী অড়ুগড় হইয়া যায় নাই। এ গেল জন-সাধারণের কথা।

দেশের নূতন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজের ভাবের ভাবুক হইয়া, ইংরাজের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাশতঃ তাহার নিকট অপবিত্র আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সত্যকাম ও সত্যবাদ, এ ধারণাটা তাহাদের অন্তরে বক্তমুল হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ যে মিছামিছা কহিতে পারে, পঞ্চাশ ঘণ্টা বৎসর পূর্বেকার শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহা কল্পনাতে করিতে পারিতেন না। এইজন্য ইংরাজ এদেশের সমস্ত যখন যাহা কহিত, তাহাকেই তাহারা বেদ-বাক্যরূপে মানিয়া লইতেন। সমুদায় শক্তি (hypnotism) ধারা অবিভূত হইয়া, সমুদায়-কর্তব্য আদেশে যুগ্ম মায়ুষ যেমন মুখে নুব লইয়া কহি তিনি খাইতেছি, সেইরূপ নবাঙ্গলিত বাঙ্গালী তাহার সমস্ত ইংরাজ যাহা কহিত তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন।

ইংরাজ কহিল, ভারতবর্ষ একটা মহাপ্রদেশ মাত্র, কখনও ভারতবর্ষের একটা জাতি বা নেশন গড়িয়া। উঠে নাই। ভারতবর্ষ কখনও জাতীয় একতা বা রাষ্ট্র ইউনিট (national unity) ছিল না, এখনও নাই। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহাই মানিয়া লইলেন। জাতি বা নেশন গড়িয়া। উঠে নাই বলিয়া ভারতবর্ষীয়ের কখনও কোন প্রকারের স্বাধীন রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ভারত-বাসীর দেশ আছে কিন্তু রাষ্ট্ৰ নাই, সমাজ ছিল কিন্তু কখনও সাত্রাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে সকল গুণে যুরোপের শক্তিশালী জাতিতে কল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের কদাপি সে সকল গুণের অমুখিলন হয় নাই। যতদূর ভারতবর্ষীয়ের কখনও যুরোপের সমকক্ষ ছিল না, এখনও নাই, কোন দিনই হইতে পারিবে কিনা কে জানে?
এই রূপে ইংরাজ পঞ্চাশ ঘাট বৎসর পূর্বের আমাদিগকে অত্যুচ্ছ সমৃদ্ধ মন্দিরের দ্বার। মূর্তি করিয়া রাখিয়াছিল ।

( ৬ )

এই সাংখ্যালিক মোটা প্রথমে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, "বঙ্গদর্শন"। বঙ্কিমচন্দ্রই বর্তমান যুগের ইংরাজী-নবীনিগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী সাহিত্যে বাঙ্গালীর অন্যতম একটা সাহিত্যতাত্ত্বিক জগাইবার চেষ্টা করেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টার বিশেষত এই যে বঙ্কিমচন্দ্র মিথ্যা। বলম্বনের উপরে নেহ, কিন্তু সত্যের উপরে সঞ্জ্ঞাতির এই আত্ম-প্রায়শ্চিত্তি তিনি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এ সকল বিষয়ের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদাই যুক্তি ও বিজ্ঞানের হাত ধরিয়া চলিতেন। অযৌক্তিক বা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের বিরোধী কোনও হেতু বা মতবাদ অবলম্বন করিয়া নিজের ঈশ্বর মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন নাই। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাহার "বিবিধ প্রবন্ধের" "বাঙ্গালীর বাহুবল" শীর্ষক প্রস্তাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—বাঙ্গালীর কোনও উল্লেখিত ভরসা আছে কি৷ অনেক এবিষয়ে সন্দেহহান। কেন না বাঙ্গালীর বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উল্লভ নাই, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই মানিয়া লইয়াছেন, যে বাঙ্গালীর বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। বাঙ্গালীর বাহুবল কখনও ছিল না। তদানীন্তন কালের ইতিহাসের যুগটা যে বুঝি পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা বাঙ্গালীর বহুকাল হইতেই যে খর্ববৃত্ত ও দূর্বল-গঠন ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালির জলবায়ু প্রভূতিতে বাঙ্গালীর এই দূর্বলতার অন্য বিশেষভাবে দায়ী। বাঙ্গালীর আহার-বিভাগের ব্যবস্থা এবং
বাল্য-বিবাহ প্রাপ্তি সামাজিক রীতি এই দুর্বলতাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এ সকল আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কহিতেছেন যে „বাঙালীর শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা একরূপ সিদ্ধ। কেন না, দুর্বলতার নির্বাহ করণ কিছু দেখা যায় না।”
তবে কি বাঙালীর ভরসা নাই? এই প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কহিয়াছেন তাহ। আজি বাঙালীর পক্ষে বিশেষ প্রধানকর্তা। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। প্রথম উত্তর হঃ—

“শারীরিক বলই অত্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে; কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অত্যাপি অনেক অংশ পশু-প্রকৃতি সম্পন্ন; এজন্য শারীরিক বলের আক্ষিণ এতটা প্রাকৃতিক। শারীরিক বল উন্নতি নহে...”

কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক বলকে উপেক্ষা করিলেও চলিবেন। কারণ শারীরিক বল মানুষের উন্নতির মূল নাহ। হইলেও যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপরে হইতে অঞ্চলক। করিবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োজন। যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে অন্তরাশাঙ্করণ শারীরিক বল ব্যতীত উন্নতি ঘটে।

তাপের বঙ্কিমচন্দ্র যাহা কহিতেছেন তাহার সাক্ষ্যটাই এখানে তুলিয়া। দিবার লোভ স্বরূপ করিতে পারিলাম না।

“দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিয়াছি, বাংলার সবকুল, সবর্বগর, সবর্বগর্মে, সকল বাঙালীর হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া। উচিত। বাঙালী শারীরিক বলে দুর্বল—তাহাদের বাহ্যবল হইবার সঞ্চারন। নাই, তবে কি বাঙালীর ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহ্যবল নহে। মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্চ, তথাপি হস্তি, অথা প্রাপ্তি মনুষ্যের বাহ্যবল সাধিত হইতেছে। মনুষ্যে ২১
মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্বত্য বন্ধ-জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান কে? এক একজন মেওয়াওয়ালার চেপালায়তে অনেক সেলর-গোরাকে ঘূর্ণমান হইয়া আলুর পেন্ডার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্রপার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল,—কারুলীর সঙ্গে ভারতের কেবল ফল-বিফলনের সম্ভাব্য রহিল কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরাজের। শারীরিক বলে লুষ। শারীরিক বলে শিখরে ইংরাজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শিখ
ইংরাজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।"

তারপর বক্ষিমচন্দ্র কহিয়েছেন যে বাঙালীর ঐতিহাসিক অপ্রতিষ্ঠার মূল কারণ বাঙালীর উদ্ভব নাই, ঐক্য নাই, সাহস নাই এবং অধ্যায়ন নাই। বাঙালী যদি এই সাধন-চক্রের অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইলে বাঙালী জগতের ইতিহাসে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে। এই সাধনার ভিত্তি উন্নতির অভিলাষ।

"বেগবৎ অভিলাষ হস্তমধ্যে থাকিলে উদ্ভব জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্ভব জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ করে হয়, তখন অভিলাষের প্রারম্ভের জন্য উদ্ভব জন্মে। অভিলাষের অপূর্তি জন্য যে ক্রেশ, তাহার এমন গ্রবলতা চাই যে, নিশ্চিততা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহ তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ বেগমুক্ত কোনো অভিলাষ বাঙালীর হস্তমধ্যে স্থান পাইলে উদ্ভব জন্মে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোনো বেগমুক্ত অভিলাষ বাঙালীর হস্তমধ্যে স্থান পাইয়া নাই।"

"যখন বাঙালীর হস্তমধ্যে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙালী মাত্রেই হস্তমধ্যে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ
গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙালীই তত্ত্বাবধায় স্বীকার যুগল বোধ করিবে, তখন উচ্চমুখের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।”

“সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় স্বত্বের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তত্ত্বাবধায় প্রাণ বিসর্জনও শেয়াল বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।”

“যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায়

“অতএব যদি কখনও (১) বাঙালীর কোনও জাতীয় স্বত্বের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙালী মাত্রেরই হদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোক প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি এই অভিলাষের বল স্বাভাবিক হয়, তবে বাঙালীর অবশ্য বাহুবল হইবে।”

“বাঙালীর এইরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একবার বলিতে পারা যাই না। যে কোন সময় ঘটিতে পারে।”

সতের বৎসর পূর্বে* বক্ষিরচন্দ্রের এই কথ্যগুলি সকল হইয়াছিল। সকল বাঙালীর অন্তরে না হউক, কতকগুলি বাঙালীর প্রাণে স্বাধীনতা স্বত্বের অভিলাষ অত্যন্ত প্রবল হয়। উঠিয়াছিল। আর এই অভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল যে ইহার জন্য কতকগুলি বাঙালী প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন বাঙালীর সাহস এবং বাহুবলেরও কতকটা পরিচয় পাওয়া। গিয়াছিল। আধুনিক বাঙালীর ইতিহাসের এই অধ্যাবসায়ের দোষ-গুণের কথা আর যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা ধরা বক্ষিরচন্দ্রের ত্রিশ-পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বাংকের সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হইয়াছিল, একথা অবৈধা করা অসত্ত্ব। আর যে স্বাধীনতা স্বত্বের অভিলাষের প্রেরণায় বাঙালীর

* এই প্রবন্ধ বাংলা ১৩২২, ইং ১৯২২ সালে লিখিত।
আধুনিক ইতিহাসের এ অধ্যায়টি রচিত হয়, বস্মিমচন্দ্র স্যাং বাঙালীর অস্তরে নানাদিক দিয়া সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আলাদিয়া ছিলেন।

( ৭ )

প্রথমতঃ বস্মিমচন্দ্রই বোধ হয় সর্বপ্রথমে এদেশের লোকের মনে ইংরাজের প্রভুত্ব, প্রতাপ ও জ্ঞান-গৌরব যে একটি গভীর হীনতা বোধ জন্মাইয়াছিল, তাহ। দূর করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি কখনও মিথ্যা বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারের শূন্যগর্ভ আত্মাভিমান বা স্বাজ্ঞাত্য্যভিমান অভাবে চেষ্টা করেন নাই। বস্মিমচন্দ্রের বিচারের একটি অপূর্ব ভঙ্গী এই ছিল যে তিনি বিভক্ত কথার মধ্যে যেটুকু অতি অপ্রীত-কর সত্য ধারিয়া, তাহা আত্মার বদনে মানিয়া লইতেন। বাঙালী শারীরিক বল সম্পন্ন অজ্ঞাত জাতি অপেক্ষা হীন, বাঙালীর বাহ্যিকর বিচার করিতে যাইয়া একথাটা অপ্রীত করেন নাই। এই সত্য কথাটা মানিয়া লইয়া তিনি কহিলেন—

শারীরিক বল বাহ্যিক নহে।

"ভারত কলঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে, ভারতবর্ষ পরাধীন কেন, এই প্রখ্যাতের আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি সত্যের যুক্তির ধারাল অন্ত্রে প্রখ্যাতে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় বহুকাল প্রাধীন হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের শক্তি ও শৌর্যের অভাব বা হীনতা এই পরাধীনতার কারণ নহে। হিন্দুর কাপুরুষ, যুরোপীয়দিগের মুখ্যতে সর্বদাই একথাটা আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার যুরোপীয়দিগের মুখ্যই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই শ্রী-বক্তব্য হিন্দুদিগের বাহ্যিকতে কাবুল
জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাহারা ভারতবর্ষের জয় করিয়াছেন। তাহারা শুকিয়া করুন আর নাই করুন, সেই স্ত্রী-স্বভাব হিন্দুদিগের কাছে, মহারাষ্ট্র এবং শিখের কাছে, অনেক রণক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ, বিদেশীদিগের মুখে যে সভ্যতাগত এই কলকার কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল, বক্ষিমচন্দ্র ইহার তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, হিন্দুদিগের ইতিহাস নাই।

“আপনার গুণগান আপনি না গাহিলে কে গায়……রোমারিগের রণ-প্রাঙ্গনের প্রমাণ রোমক-লিখিত ইতিহাস। এই রোমারিগের যোদ্ধা-গুণের পরিচয় এই কলকার তৃতীয় কারণ, হিন্দুরা মোটের উপর পরাজিতহারা ছিল না। “যে সকল জাতি পরাজিত হইতেছে পহারী, প্রায় তাহারাই রণপদ্ধতি বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষাতে সত্রত হইয়া, পরাজিত লাভে কখনই ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীর গৌরব লাভ করে নাই।” আর এই কলকার তৃতীয় কারণ, হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। পরাধীন কেন? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা করিতে যাইয়া বক্ষিমচন্দ্র দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথম, ভারতবর্ষের যুদ্ধবট্টার প্রাচীন কাল হইতে যাহীনতা-আকাঙ্ক্ষা রহিত ছিল। স্বতন্ত্র অনন্য হিন্দুজাতির চির যুদ্ধ।

“সংক্ষেপ সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় নাই যে, তাহা হইতে পূর্বের হিন্দুগণের যাহীনতা-প্রায়সী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণবুপুরাণ, কাব্য, নাটকাদিতে কোথাও যাহীনতার
গুপ্তগান নাই। মীরাবর ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না। যে, কোন হিন্দুসমাজ
সাহিত্যের আকাঙ্খায় কোন কার্যের প্রোত্ত হইয়াছে। রাজ্যের রাজ্য-
সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্শ, কর্মদেশের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের
ভূরিভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাহিত্যের নাতালাভকায় সে
সকলের মধ্যে নহে। সাহিত্য, নাতালাভ এ সকল নূতন কথা।"

"কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার ভাব, ভালই হউক বা
মন্দই হউক, কোনও দিন প্রবল হইয়া উঠে নাই। ইহাই ভারতবর্ষের
রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার মূল কারণ। কিন্তু ভগবানের বিধানে ইঞ্জিও
আমাদিগের এই উপকার করিতেছে, যে, যাহা আমরা কখনও জানিতাম
না তাহা জানাইতেছে; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, তাহা
দেখাইতেছে, শোনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখন চলি নাই,
সে পথে কখন করিয়া চলিত হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই
সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা আমুল। যে সকল আমুল রহন
আমরা ইঞ্জিও চিন্ত-ভাবের হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে
দুইটি আমার এই প্রবন্ধে ("ভারত কলঙ্ক") উল্লেখ করিলাম—সাহিত্য-
প্রশ্নে এবং জাতি-প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহারু বলে তাহা হিন্দু জানিত
না। এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে nationality বা nation বুঝিতে
হইবে।"

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে বক্সিমচন্দ্রই এই জাতি-প্রতিষ্ঠা বন্দরের
একরণ প্রথমে অসাধারণ। চক্ষু-সমাজ প্রতিষ্ঠাগামে ব্যক্তি-
সাহিত্যের এবং ব্যক্তিগত সাহিত্যার আদর্শকে গড়িয়া তোলেন।
বক্সিমচন্দ্র জাতি-সাহিত্যের আদর্শের দিকে বাঙালীর চিত্তে বিশেষ
ভাবে প্রেরিত করেন। তাহার অপূর্ব সাহিত্য-শক্তির মধ্যে এই
কথাটাই সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই বক্সিম-যুগের বাংলা
সাহিত্যের মূল কথা।
একাদশ কথা

বঙ্কিম-সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এখনও বাংলার শিক্ষিত লোকেরা পাঠ করিয়া থাকেন। রসমৃদ্ধির হিসাবে তাহার উপম্যাসগুলির আদর ও অলোচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থও সাহিত্যের হিসাবেই আজিকালকালের লোকে পড়িয়া থাকেন। কিন্তু এসকল গ্রন্থের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন দিকে কতটা পরিমাণে যে বাংলার বর্তমান মুগকে ফুটাইয়া ও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একটাটা সকলে জানেন না; অতি অলোকেই ইহার অমূল্যতাকে বিজ্ঞান থাকেন।

পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে অভ্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজিকালকার শিক্ষিত বাঙালী শ্রুতিতের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষদের মতন ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা করেন বলিয়া মনে হয় না। স্কুল-কলেজে যতটুকু ইংরেজী পড়া হয়, অনেকে ইংরেজী সাহিত্যের ততটুকু পরিচয়ই পাইয়া থাকেন। বিশ্ব-বিভ্রান্তিয়ের পাঠে সাঙ্গ করির অর্থ অন্ত লোকেই এখন ইংরেজী সাহিত্যের সবিশেষ চর্চা করির। অর্থ অন্তের যে তাৎক্ষণিক বাংলা সাহিত্যের প্রভাব তখনও তেমন হয় নাই। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে যাহারা লিখিতে পড়িয়া জানিতেন, তাহারা সকলেই অবসরকালে কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন। ইতিহাস এবং মন্ত্রদের দিকে। তখনও এসকল পুরাতন পুঁথির বিচার-আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। কথা ও কাহিনীরূপেই লোকে
কাশীরামের ও কৃষ্ণভাস্করের প্রাস্থ পাঠ করিতেন। অজিকাল আমরা বাঙালীর জাতীয় জীবন ও চরিত্রের ক্রমান্বয়ক্তির ইতিহাসে কাশী-রাম ও কৃষ্ণভাস্করকে যে গৌরবের আসন দিতে আরম্ভ করিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহাদের সে মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেকালের বা মিষ্টনের কথাই নাই, চসার প্রভূতি প্রাচীন ইংরেজী কবিয়ে সঙ্গে এক আসনে বসিতে পারেন, এমন কোনও বাঙালী কবি আছেন, সেকালে আমারা ইহা করলাই করিতে পারিতাম না। বঙ্গমধ্যের পূর্বে বন্যাশিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যের চতুর্থ শতাব্দী প্রভূতি হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কুমারসত্য, পঞ্চাশ, ভাটকাব্য, কাদমী, শকুন্তলা এবং উত্তরায়-চরিত পাঠ্যরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বটে। কিছু কেবল পরীক্ষা পাশ দিবার জন্যই অধিকাংশ লোকের লেখা পড়িতেন। রসস্থিত দিক দিয়া। আমাদের মধ্যে তখনও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। বঙ্গমধ্যের সর্বপ্রথম “বঙ্গদর্শন” সেকালের বা কালিদাসের তুলনায় সমালোচনা করেন, এবং উত্তরায়-চরিতের অপূর্ব বিশ্লেষণ করিয়া। রসস্থিত দিক দিয়া। ভবভূতির একটি অতি উচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী সাহিত্যেই ডাউডেন প্রকৃতি সমালোচকদিগের প্রায় এক এক ঘটাঙ্গের সমালোচনা পাঠ করিতেন। সেই কথার কথার সংস্কৃত বা বাঙালী সাহিত্যকে কনিতা বিশ্ব-সাহিত্যে তার প্রায় ও মূলা নিক্ষিপ্ত করিয়ে কেহ চেষ্টা করেন নাই। বিশ্ব- সাহিত্যের দরবারে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে উচ্চ আসন পাইবার অধিকারী, ইহা তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর কল্পনাতেও আসে নাই। বঙ্গমধ্যের সর্বপ্রথম ভারতের সাহিত্যকে অধুনার বিশ্ব-সাহিত্যের পরিষদে লাইয়া যান। আর তখন হইতেই বাঙালী স্বদেশের সাহিত্যের আদর করিতে আরম্ভ করেন।
সেক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজি-নবীশেরা ইংরেজি সাহিত্য মসনদল হইয়াছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের কষ্টপাল্লের কষ্টযাত্রা তাহার নাবভাজি সাহিত্য-সম্প্রদায়ের মূল্য নিষ্কাশন করিতেন। সেক্সপিয়ার এবং মিল্টন তাহাদের চক্ষে অগ্নিতে শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন। ইংহাদের পদপ্রাপ্ত বসতি পারেন, বাংলা দেশে কোনও কবি তাহারা খুঁজিয়া পান নাই। বৈষ্ণব কবিগণ তথ্যও বুদ্ধিমান আচার্য্যগণ করিল। বাস করিতেছিলেন। বৈষ্ণব কাঙ্ক্ষীরা। দ্বারবিট মহাজন-পদাবলীর কীর্তি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী তখনও যুরোপের আমাদানী বুঝিয়া ethicsএর বা ধর্মরোধিত আরও বড় পড়িয়াছিলেন। মহাজন-পদাবলীর অলোচনায় তাহার অধিকার অম্বশ্বের নাই। ইন্টার্যাক্টিভিরার বাণিজ্য বৈষ্ণব পদকল্যাণ সাহিত্য বিকারের যে অপূর্ব হিন্দু তাহাদের বাঙালীতে ফুটাইয়াছে হুলিয়াছে, তাহার থেকে এথেনস বা কুঁজে রাখেন? তখন আমাদের ইংরেজি-নবীশ ethics-বাণীর। তাহার যে কোন সাহিত্য পান নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। একটি বক্সমূল পর্যটন একটি মহাজন-পদাবলীর প্রতি ধর্মরোধ সমাপ্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সাধারণ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী এসকল অপূর্ব রসময় তাহারা সৃষ্টি করিয়া অথেনস পান নাই। বাংলা ভাষাতে যে বয়স্ক ও সুবিস্ত দৃষ্টিজ্ঞ একটি পাঠাগুলো কোনও পুস্তক আছে, একথা অনেকের ধারণাতেই আসে নাই।

এইরূপ অবস্থায় প্রথম যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেছানাদ-বধ’ প্রকাশিত হইল, তখন ইংরেজি-নবীশ বাঙালী একটি নূতন গোরবে ভরিয়া উঠিলেন। ঐশবচন্দ্র গৃহের কবি-প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। বক্সমূল পর্যন্ত কতো শীর্ষ এবং প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত বাঙালী গুণ্ডকবিকে কোনও শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবির ২২
সঙ্গে তুলনা করিতে পারিতেন না বলিয়া তাহার যথাযোগ্য সমান করিতে পারেন নাই। ‘মেহনাদ-বধ’ প্রকাশ হইবার মাত্র শিক্ষিত বাঙ্গালী মাইকেলকে মিলনের সঙ্গে তুলনা করিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালী কবি মধুসূদনের কবি-প্রতিভাকে মিলনের কবি-প্রতিভার এক পঙ্ক্তিতে বসাইয়া একটি অভিনব যাজকত্যাভিমানে কাপিয়া উঠিলেন। এবং ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী একখানি পাঠোপাদ্যের স্বীয় বাঙ্গালী কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু মেহনাদ-বধের গৌরব স্বত্ব লোকে করিতে লাগিলেন, তত লোকে তাহা পড়িতে পারিলেন না। বাঙ্গালীর অমিতার্চন ছাড়া পড়া সহজ ছিল না। ইহার ছাড়া। মেহনাদ-বধের অলোকসামাজ্য শব্দ-সম্পদের উপরেও তখন পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিকার জন্মে নাই। অভিধান না খুলিয়া অনেক স্ত্রী মেহনাদ-বধের অর্থগুহ্য অসাধ্য ছিল। সত্ত্বেও পড়াশুনা। করিতে যাই। মুহূর্তে মুহূর্তে অভিধান খুলিয়া দেখাও সম্ভব ছিল না। এই সকল কারণে মাইকেলের কবি-বাণ্ড পত্তট। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ততটা পরিমাণে তাহার কাব্যের পথন-পাঠন শিক্ষিত বাঙ্গালী-মাজ্জে পরিণাম হয় নাই। মেহনাদ-বধে বাঙ্গালী এইমাত্র বুঝিল যে বাংলা ভাষার এবং বাঙ্গালী মনোভাবে বিভ্র-সাহিত্যে যাইয়া বিতার শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা ইহার সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা নহে; কিন্তু আপনার অপূর্ব সাহিত্য-স্থিতি দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অমূল্যত্বে এই কথা। উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

(২)

বোধ হয় ‘মেহনাদ-বধ’ প্রকাশিত হইবার আলোচনা পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দূর্গেশ-নন্দিনী’ প্রকাশিত হইয়া। ‘দূর্গেশ-নন্দিনী’ পড়িয়া ইংল্যাডে-নবীশ বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালার ন্যায় ওয়ান্টার স্ত্রী বলিয়া
বক্ষিম-সাহিত্য

সন্ত্রমে অভিবাদন করিলেন। যাবে যেমন সেক্সপিয়র এবং মিল্টন
ইংরাজী-নবীশ বাঙালীর অভিযান প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, উপহাসে
ওয়ার্নার্টার স্কট তাহাদের চিত্তকে সেইরূপ অধিকার করিয়াছিলেন।
স্নতরাং দুরগ্ন-নল্লিনীর সঙ্গে স্কটের উপহাসের সমালোচনা করিয়া
বাঙালী একটা অভিনব আত্মাভিমান বা স্বাধীনতা ভিন্ন অমুভব
করিতে লাগিল। মেহরাব-খাল সংক্ষেপ কোষের সাহায্য ব্যতিরেকে
বোঝা অসাধ্য ছিল। বক্ষিমচন্দ্র যদিও তখনও পর্যন্ত শক্তির
প্রকাশের লোভ একবারে পরিষ্কার করিতে পারেন নাই, তথাপি
মোটের উপরে তিনি যে নূতন বাংলা এবারের স্থায়ি করিলেন, তাহা
সহজেই বুঝিতে পারি যাহীত। স্নতরাং উল্লিখিত বাঙালী মাত্রেই
বক্ষিমচন্দ্রের উপহাস পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে বক্ষিমচন্দ্র পঞ্জাব
বৎসর পূর্বে নব্যশিক্ষিত বাঙালী সমাজের চিত্তকে বিদ্যুশীয় সাহিত্যের
ও বিজ্ঞানীয় ভাবের মোহ হইতে আরে অর্জ মুক্তি করিয়া। আধুনিক
বাংলার সাহিত্যের এবং স্বাধীনতার গোড়া পতন করিয়াছিলেন।

(৩)

মোটামোটি বক্ষিম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—(১) উপহাস,
(২) ধর্মজন্ম, (৩) রঞ্জনীতি; আর এই তিন ভাগেই বক্ষিমচন্দ্র
আমাদিগের মধ্যে নূতন স্বাধীনতা এবং মানবতার প্রেমণ ভাঙাইতে
চেষ্টা করেন। কপালকুলুলা, দুরগ্ন-নল্লিনী এবং মৃণালিনী এক শ্রেণীর;
বিষ্ণুক্ষ, চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকাংশের উইল আর এক শ্রেণীর; এবং
আনন্দময়, দীপী চৌধুরাণী এবং সীতারাম অপর শ্রেণীভুক্ত। প্রথম
তিনধারিকে রোমান্স (romance) বলা যায়। সকল দেশেই নর্মনীর
চিতে কতকগুলি স্বাধীন প্ররূপিত হইয়া থাকে। এই সার্বজনীন
মানুষের প্ররূপ্তর খেলার উপরেই রোমান্স গড়িয়া উঠে। এই প্ররূপির
বক্ষিমচন্দ্রের প্রথম অভ্যাসকালে শিক্ষিত বাঙালী নিজের জাতকে বড় হীন বলিয়া মনে করিতেন। যুরোপীয়দের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করিয়া সর্বদাই মাঝে হেট করিয়া ধাকিতেন। তখনও সাক্ষাৎ ভাবে তাহারা যুরোপের কেবল জ্ঞানলাভ করেন নাই। ইংরাজী ও যুরোপীয় সাহিত্য-স্থিতির সাহায্যেই সেকালে তাহাদের যুরোপের মন্দমুখের এবং যুরোপীয় সমাজের যাক-কিছু জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। যুরোপের এই ছবির সমৃদ্ধিঃ মুদ্র হইয়া। সেকালের শিক্ষিত বাঙালী অন্ততঃ অন্তর্গত আত্মার অমূল্য করিতেন। বক্ষিমচন্দ্র তাহার প্রথম তিন দিকি উপন্যাসে এদেশের চিত্রপটেও যে যুরোপের সাহিত্য-স্থিতির
বক্ষিম-সাহিত্য

মন্তন উৎকৃষ্ট রসমূর্তি গড়িয়া তোলা। সত্য, ইহা দেখাইয়া। বাঙালীর অন্তর্বে এই অজ্ঞানান্ত। নফ্ট করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্গোষ্ঠনদ্যান, কপালকুণ্ডল এবং মৃণালিণী স্থিতি করিয়া। বক্ষিমচন্দ্র এই একটা অতি বড় কাজ করিয়াছিলেন। আর কেনও কিছু না করিলেও এই তিনবাণী উপস্থাপনের দ্বারা তিনি বাঙালার নবমৃৃঃগ ইতিহাসে একটা শ্যামায় আসন অধিকার করিয়া থাকিতেন। কি ত্রী, কি পুরুষ,—সকলেরই যে যথাযোগ্য পথে আত্ম-চরিতরূপে সাহায্যের অধিকার আছে, এই তিনবাণী উপস্থাপনে বক্ষিমচন্দ্র বাঙালী সমাজে এই সত্যটা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন। তাঙ্কসমাজ ধর্মের নামে প্রকাশভাবে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম যোগ্য করেন, বক্ষিমচন্দ্র সাহারণ মানব-প্রকৃতির নামে পরোক্ষভাবে সেই সংগ্রামেই অসাধারণ শক্তি আধান করিয়াছিলেন।

(৪)

বিষয়বস্তু, চৌধুরীশ্বর এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে বক্ষিমচন্দ্র তাহার রসস্থলিতকে কেবল আরও উন্নত এবং পরিস্ফুট করিয়া। তোলেন তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষরজেন মানবতার তুমি হইতে এগুলিকে পৃথক করিয়া। বাঙালী চরিত্রের এবং বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাঙ্কায় তোলেন। সুর্যামুখী ও কুন্দনন্দিনী, গুম্বীরী এবং শৈবলিনীতে, ভরমে এবং রোহিণীতে আমরা। কেবল সাধারণ নারীতের সাক্ষরজনী মুক্তিই দেখি না, কিন্তু সাক্ষরজেন নারীতে কোনো আকারে কৃষিতে বাঙালার মাটি, বাঙালার জলবায়ু, বাঙালার ঘাট মাঠ, বাঙালার নৈসার্গিক প্রকৃতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দ্বারা। বিশিষ্ট হইয়া কোন কোন মুক্তিতে ফুটিয়া উঠে, ইহাও প্রত্যাশ করি। প্রত্যেক যে পথে-যাতে বেড়াইয়া, যে নদী-তরঙ্গ এবং সংঘের আকাশ
দেখি, তাহাই যখন আলোক-ছবিতে কিন্তু নভিপুণ চিত্রকরের
tুলিকায় ফুটিয়া উঠে, তখন তাহার মধ্যে যে রূপ দেখিতে পাই, পূর্বে
তাহ। দেখি নাই। আর দেখি নাই এইজন্য যে, সেদিকে কোনোদিন
লক্ষ করি নাই। এত সৌন্দর্য্যের ভিতরে যে প্রাতঃসন্ধ্যায় ঘুরিয়া
বেড়াইল, ছবি দেখিলাম পূর্বে ইহ। রূপ নাই। রূপ নাই বলিয়া
তাহার মর্যাদা। করি নাই। কিন্তু সেদিন ইহার ছবি দেখিলাম, সেদিন
হইতে এই চিত্রপরিচিত পথ-ঘাটের দাম যেন বাড়িয়া গেল। ঠিক
এইরূপে বিবর্ণক, চন্দ্রশেখর এবং রুষকন্তুর উইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর
নিকটে তাহার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের মূলট। বাড়ীয়া
দিল। এতদিন বাঙ্গালী ভাবিত যে যুরোপীয় সমাজে এবং পাশ্চাত্য
জাতীয় লোকদিগের পারিবারিক জীবনে যে রস ও আনন্দের উৎস
উৎসাহিত হইয়া। উঠে, হতভাগ্য বাঙ্গালী-জীবনে তাহ। সম্ভব না।
বিবর্ণ প্রভূতি উপাসন প্রচার করিয়া বক্সিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর
চোখে আকুল দিয়া। দেখাইয়া দিলেন—বিবিধ রসের উৎস ও রসমূর্তির
উৎপত্তি কেবল যুরোপীয় যে আছে তাহ। নহে, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে
তাহা আছে। বাঙ্গালীর চোখ নাই বা প্রাণ নাই বলিয়া দেখিতে
পাই না। বক্সিমচন্দ্র এইভাবে বাঙ্গালীর সমাজ বাঙ্গালীর ঘরকে আধুনিক
শিক্ষিত রস-পিরাস্ত বাঙ্গালীর নিকটে আদরের বহন করিয়া তুলিলেন।
এই ভাবে এই ভিন্নহীন উপাসনের সাহায্যে বক্সিমচন্দ্র বাঙ্গালীর
নবযুগের নবীন সাধনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলেন।

(৫)

দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীতে সার্বজনীন মানব-
প্রভূতির সামাজিক ভূগোলিক প্রতিষ্ঠা করিয়া বক্সিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে
ব্যক্তি-সাহিত্য

অন্তর-চরিতার্থতার পথে বাহিরের বন্ধন-মুক্তি করিতে চেষ্টা করেন।
এই ভোগের পথে সোজা পথ নয়, বাহিরের বন্ধন ছিল তবে যে এই
ভোগের পথে যাওয়া মানুষ সম্পর্কে অন্তর-চরিতার্থতা লাভ করিতে
পারে না, এ পথে পদে-পদে কত বিপ্লব হয় বাধা, অন্তর-চরিতার্থতা
লাভ করা দূরে থাকে, অন্তরহত্যার যে কত আশঙ্কা,—বিষ্কৃত্তে, চক্ষু-
শক্তির এবং রূপান্তরের উইলে তিনি ইহা বিশেষভাবে ফুটাইয়া
তুলিতে চেষ্টা করেন।
অধুনিক যুগের evolution বা অভিব্যক্তিবাদের ভাবায় দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিকে রসরাজ্যে মানবের অন্তর-
চরিতার্থতার অভিব্যক্তিধারার তথ্য এর অবস্থা বলা যায়।
বিষ্কৃত প্রভৃতিতে এই অভিব্যক্তিধারার antithesis এর অবস্থা বলা
যায়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতিতে সহজ রসবিলাসের ছবি দেখিতে
পাই। এখানকার কথা সহজ ভোগ। বিষ্কৃত, চক্ষুশক্তির এবং
রূপান্তরের উইলে ভোগের প্রভূতির সঙ্গে সম্পর্কে ও সমাজ-শাসনের
কেল ও বিদ্যাধর উইল। উঠিয়াছে। প্রভূতি এবং নিরুতি—এই
সংগ্রামের ভিতর দিয়াই এই তিনাই ছবি পরিস্ফুট হইয়া।
উঠিয়াছে। কিন্তু এখানে কোনও সজ্জির কথা বা সমষ্টির সঙ্গে নাই।
ব্যক্তি-চক্ষু উইলার শেষ তিনাই উপযোগে এই সজ্জি বা সমষ্টির
প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই আনন্দময়, দৌবী-চৌধুরাণী এবং
সীমারামের বিশেষত।
কেবল রসমূর্তির স্থষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে
ব্যক্তিগত আনন্দময়, দৌবী-চৌধুরাণী বা সীমারামের রচনায় প্রকৃত হন
নাই। এই তিনাই উপদেশ ছিল সৃষ্টিবাণীগত ভারতের
উচ্চাঙ্গের কর্মের দায়িত্ব হিসাবে দায়িত্ব করা।
কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত
সমাজের আন্তরাত্মী ইহসরবর্ষায় প্রভাব নষ্ট করিয়া স্রষ্টায় ও
সমাজভিতর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিবার জন্যই এই কর্মসূচি প্রচারের
প্রয়োজন ছিল।
(৬)

ইংরেজী শিক্ষা ও যুরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের অত্যন্ত ইহসাবমধ্য এবং পরমার্থবিমূখ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ের বাহাদুর ভিতরে মানাতিক অস্তিক্যুরুক্তি বলতী ছিল, কারণ তাঁহাদের ভহিন সার্কামাঝের আশ্রয়ে যাইয়া নিজেদের ধর্মপ্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ সাধনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ইংরেজদের সম্বন্ধে অত্যন্ত অন্য ছিল। দেশের অধিকাংশ ইংরেজী-বাণিজ্যের বেশ অধিক না। ইংরেজী ছিল সঞ্চার সঙ্গে সঙ্গে চুলীযান নীতিবাদ বা ethics এর প্রভাবও ইংরেজের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। যদিও প্রাকৃতিক ধর্মপ্রতিষ্ঠার ধারায় ধরিতে পারিতেন না। সুতরাং ভোগেতে আত্মমর্পণ করিয়া চরমে গোষ্ঠীবিশেষে যোগ ধরিয়া ভক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেন্দ্রে চলিবার প্রভাবও অধিকাংশ লোকের মধ্যে আসিত না। এইভাবে শিক্ষিত সাধারণে বাহিয়া কেতক নীতি বা morality র বদন মানিয়া চলিয়াও ভিতরে ভিতরে ইহসাবরোধী বা secularist এবং materialist হইয়া পড়িয়েছিলেন। যুরোপের ইহসাবরোধী একটা তাজা জিনিস। যুরোপীয় প্রকৃতি হইতেই তাহ। আমাদের শক্তির আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে বলা। আর প্রকৃতির ভিতরের প্রশাসন যে বস্তু ফুটিয়া উঠে, তাহ। আপাততঃ দৃষ্টিতে ভালই হউক আর মলন্দু হউক, তাহার মধ্যে সর্বদাই একটা কল্যাণের শক্তি লুকাইয়া থাকে। আমাদের দেশের ইংরেজী-বাণিজ্যিক ইহসাবরোধ অনেকটা ধার
করা জিনিষ ছিল। ইহাতে যুরোপের ইহসাবর্ভবাদের প্রাণতা ছিল না। অথচ সেকালের ইংরাজী শিক্ষা ইহার ধারা। আমাদের দেশের প্রকৃতিনিহিত অধ্যায়িকতাকে টাকিয়া ও চাপিয়া রাখিতেছিল। যুরোপীয়দেরের ইহসাবর্ভবাদ তাহাদের অর্থনীতি ছিল। আমাদের এই ধার করা ইহসাবর্ভবাদকে নষ্ট করিতে না পারিলে, হিন্দু হিন্দু, বাঙ্গালীর বাঙ্গালী, আমাদের স্বদেশের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে।--এই দেখিয়াই বিভিন্নচর্চ সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে, ভোগের এবং বৈরাগ্যের মধ্যে, প্রবৃত্তিধর্ম এবং নির্বোধ্যভেদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এবং সমষ্টি প্রতিষ্ঠা করিয়া সমসাময়িক শিক্ষিত-সমাজের ইহসাবর্ভবত্তা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, কর্মশোকের প্রতিষ্ঠাকল্পে, অনন্দবল, দেবী-চৌধুরাণী এবং সাতীরাম রচনা করেন।

( ৭ )

ভগবদ-গীতায় নিকাম কর্মযোগেতেই ভারতের সনাতন সাধন। প্রবৃত্তি বা ভোগ এবং নির্বোধ্য বা বৈরাগ্য এই দুইই একটা অপূর্ব সমষ্টি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই নিকাম কর্মের উপরে মানুষের সহজ ভোগ-প্রবৃত্তির সঙ্গে বৈরাগ্য-ধর্মের সময় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্নচর্চা অনন্দবল, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারামের শক্তি করেন। আর এই কাজটি করিতে যাইয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের প্রাচীন গীতাধ্যক্ষ কর্মযোগ বা কর্ম-মায়াদের একটা নূতন ও উল্লেখনীয় সৌন্দর্য তুলিয়া লয়েন। প্রথমে বাগাবাগিনাড়ে কর্ম ছিল। তারপরে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রবণ, মনন, নিদ্যাসন প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সাধন কর্মযোগের নূতন অভিব্যক্তিতে প্রাচীতিত হয়। তার পর ভক্তিপথে ইন্দ্রিয়তায় প্রবণ-কার্তিতানী এবং তাহার লীলার অনুসরণ শ্রেষ্ঠতম কর্মযোগ
বলিয়া বিহিত হয়। ভগবদ্গীতার কর্ষ্যোগ এই ধাপে পর্যন্তই উটিয়াছিল। রাজা রামমোহন ভারতের কর্ষ্যোগের অভিব্যক্তিকে আর একটা অভিনব এবং উদার সোপানে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন। তিনি লোকশিত্যের শ্রেষ্ঠতম কর্ষ্যোগ বলিয়া প্রচার করেন। ইহাই আধুনিক যুগের কর্ষ্যোগ। বক্সমচন্দ্র এই পথেই গীতোত্তর কর্ষ্যোগসমূহের অধীনে, বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া, আনন্দময়, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারামের অভ্যুত্তে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু লোকশিত্যের কথাটা অত্যন্ত বিষয়। সাধারণ লোকের পক্ষে এই লোকশিত্যের কেবল একটা ভাবো অথবা ভাবুকভাবেই পর্যবসিত হয়। বাস্তব জীবনে প্রতিদিনের কর্ষ্যাবক্রমের মধ্যে ইহা আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে না। সর্বভূতে আত্মুদ্ধব বা. ব্যাপ্তীলাভ হইলেই কেবল এই বিশ্বনাটুকু আদর্শের অনুসরণ কার্যত সম্ভব হয়। যতক্ষণ এই বিশ্বনাটুকু সাধন না হইয়াছে, ততক্ষণ বিশ্ব-সেবার বা বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধন চেষ্টা। কখনও সত্যোপেত এবং বস্তুতঃ হইয়া উঠিতে পারে না, ভাবুকভাবেই আবন্ধ হইয়া রহে। কোনও একটা সত্যের প্রেরণা জাগাইতে না পারিলে মানুষ নিক্ষম কর্ষ্যোগের পথে পা ফেলিতে পারে না। কখনও কখনও মানুষের মানুষের ভালবাশিয়া নিক্ষম প্রেরের উদ্বোধন করিতে পারে। কিন্তু এ বড় বটিন পথ; শান্তিকৃত কুরাকের মতন সূক্ষ্ম ও দুর্গম। কিন্তু এই নিক্ষম প্রেরের এবং নিক্ষম কর্ষ্যের একটা লগ্ন এবং প্রাসঙ্গিক পথ বদেশ-প্রতি। বদেশের প্রতি মানুষের মহন্ত-বুদ্ধি জমিতে পারে। এই মহন্ত-বুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ বদেশের সেবা করিতে যাইবে। কোনও প্রকারের নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের অধেশে না করিতেও পারে—করাটা দুর্গতির্পার্থক্যে না অপরিহার্য নহে। ইহা দেখিয়াই বক্সমচন্দ্র আনন্দমঠে, দেবী-
বক্ষিম-সাহিত্য

চৌধুরাণীতে এবং সীতারাম দেশমাত্রকর প্রতি নিশ্লেষ্ট ভয়ের উপরে আধুনিক নিকাশ কর্ম্যোগের ভিত্তি গড়ায়। তুলিতে চেষ্টা করেন। এই দেশ-প্রীতিতে এই তিনবারি উপন্যাসের মূলসূত্র। আর এই জ্ঞানই আনন্দমো, দেবী-চৌধুরাণী এবং সীতারাম বাংলার নূতন আদেশিকতার শাস্ত্র হইয়া আছে।

(৮)

বক্ষিমচন্দ্রের স্রষ্টা-প্রীতির আদর্শ কেনও প্রাচীরের সঙ্কীর্ণতা ছিল না; থাকিলে এই স্রষ্টা-প্রীতির উপরে তিনি লোকশ্রেষ্ঠের এবং লোকশ্রেষ্ঠের উপরে শৈশার নিকাশ কর্ম্যোগ সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। আনন্দমোহন তিনি দেশ-মাত্রককে মহাবিজ্ঞান বা নারায়ণের অংশ স্থাপন করিয়া। আমাদের দেশপ্রীতি ও স্রষ্টা সেরা-ব্যক্তকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্ব-মানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিজ্ঞানকে বা নারায়ণকে বা বিশ্ব-মানবকে ছাড়িয়া দেশ-মাত্রকের পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দমোহনের একটা অতি প্রধান কথা। একদিকে আনন্দমোহন একটা অতি প্রবল স্রষ্টা-প্রীতি ও স্রষ্টাভিত্তিক জগাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাই সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে এই স্রষ্টা-প্রীতি এবং স্রষ্টাভিত্তিক বিশ্ব-প্রীতি এবং বিশ্ব-কল্যাণ কামনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে আপনার সফলতা বিচ্ছিন্ন আহরণ করিতে পারে না, আনন্দমোহন বক্ষিমচন্দ্র আশ্চর্য কুশলতা সহকারে সম্ভাব্য বিদ্রোহের পরিণাম দেখাইয়া। এই কথাটাতেও প্রচার করিয়া গিয়াছে। বক্ষিমচন্দ্রের এই সময় এখনও দেশ ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। কিন্তু যতদিন না বাঙ্গালী স্রষ্টা-প্রীতির পথে আধুনিক যুগের উপযোগী নিকাশ কর্ম্যোগ সাধনের এই সংক্ষেতর ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবে, ততদিন সে নিজের সভ্যতা এবং সাধনার
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিব। বর্তমান যুগের বিশ্ব-ধর্মকে আপনার সাধনা এবং সিদ্ধি দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না। এখনও বাঙালী সে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আর যতদিন ভাষা শেষ না হইয়াছে ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্চর্য শক্তি বাঙালীদের মধ্যে সজীব থাকিবেই থাকিবে।
বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যা

কহিয়াছি যে বঙ্কিম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম উপন্যাস, দ্বিতীয় ধর্ম-ব্যাখ্যা, তৃতীয় রাষ্ট-রথা বা politics। এই তিন বিভাগেই বঙ্কিমচন্দ্র একটা সময়ে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ভোগ এবং তাঙার মধ্যে একটা সময় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে শিক্ষিত বাঙালীর ভোগ-লিপ্সা বাড়াইয়া দৃষ্টেশনশিদ্রী, কপালকুলা, মুণালিনী, চন্দ্রমেধের প্রভূতি উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু এই ভোগের রস বা রোমান্সের রসায়ন দিয়া উন্নত এবং স্নেহ করিয়া তুলিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাসেই রস-রসায়নবর্জিত ভোগের লোভনীয় ছবি প্রকট হয় নাই। যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজধর্ম বিগমির ভোগ-লিপ্সার ছবি আকিয়াছেন, সেখানেও তাঙাকে অলকিতে রসের ভূমিতে লইয়া গিয়াছেন। বিষরুপের রস-স্থায়ির কুশলতার দিক দিয়া বিচার নিজে হীরার ছবি সরবাপেক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিয়া বলিতেই হইবে। হীরা দাসী, অশিক্ষিতা, রুচি তার অমর্জিত, ভাষা তার প্রাণ; কিন্তু একক比利时র আবরণ ও আবর্জনার ভিতরেও হীরার মধ্যে একটা তাঙা রসের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইরূপে যে সকল চিত্র সমাজধর্ম-বিগমির বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের চক্ষু ঘুণনীয় করিয়া। তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ভিতরেও এক একটা তাঙা রসের ছবি আভাস পাওয়া যায়। এই ভোগের সঙ্গে তাঙার বা বৈরাগ্যের একটা সময়ে প্রতিষ্ঠাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসখলার
মূল ও অন্তর্গত উদেশ্য হইয়া আছে। দুর্গেশনন্দিনী প্রভূতিতে এ উদেশ্যটা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই; ফুটিয়া উঠিয়াছে—আনন্দ-মণ্ডল, সীতারামে এবং দেবী-চৌধুরাজিতে।

সমষ্টি অথবা পূর্ববর্ত্তী প্রতিপক্ষের মধ্যে একটা রক্ষা। উভয় পক্ষের মধ্যে দাবীদাওয়া যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমষ্টির ভূমি প্রকাশ্য হয় না। ভোগের এবং ত্যাগের মধ্যে সমষ্টি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রথমে ভোগকে এবং ত্যাগকে উভয়কেই আপনার সরূপে যথাস্বভাব্য পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া তুলিতে হয়। ভোগ যতক্ষণ না আপনার পরিকৃতির জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া। ইসিতের দিকে ছুটিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভোগের সত্য সর্বোচ্চ প্রকট হয় না। ততক্ষণ পর্যন্ত ভোগ আপনার সত্য পথে খুঁজিয়া পায় না। দেবেন্দ্র দত্তের চরিত্রে ভোগ মাঙ্কপথে মারা যায়। স্বতরাং এখানে ভোগের সত্য সরূপ ফুটিয়া উঠি নাই। অতি দিকে গোবিন্দলালের মধ্যে ইহা দেখিতে পাই। গোবিন্দলাল ভোগে বসিয়া একাকীভাবে আওত সং করিতে যাইয়াই তাহাকে হরাইয়া ফেলেন। গোবিন্দলালের ভোগ বিকৃত্ত আত্মচরিতাবর্ত্তি করিতে যাইয়াই পরিণামে আত্মোত্তর করিয়া যায়। এবং নিঃশেষ নিক্ষত্ত আহরণ করিয়া ত্যাগ ভিন্ন যে ভোগ অস্ত্র ইহা দেখিয়া ত্যাগের পথে ফিরিয়া আসে। বিষ্কৃত, চক্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্তের উইলে ভোগ এবং ত্যাগের সংগ্রামটা পাকিয়া উঠিয়াছে মাত্র; কিন্তু রক্ষা বা সমষ্টির পথ তখনও খোলা নাই। আনন্দমণ্ডল এই সমষ্টির প্রথম সূচনা। তাই বলিয়া আনন্দমণ্ডল ভোগ এবং ত্যাগের কোলাকুলিটা সেখানে সেখানে কোলাকুলির মতন “মুঠোম হাত ফরাক” রহিয়া গিয়াছে। আনন্দমণ্ডল ভোগ ত্যাগের ভিতরেই আপনাকে ফিরিয়া পায় নাই। এই জন্য জীবানন্দের
বক্ষিমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যা । ১৮৩

বৈবার ভঙ্গ হইল। জীবানন্দ ভোগের লোভে ত্যাগকে অবলম্বন
করেন নাই। জীবানন্দের সম্প্রদায় সত্য সরলার ছিল না। দেশের রূপের একটা অবাক্তর উদ্দেশ্যের প্রশ্নায় জীবানন্দ সম্প্রদায়ী সাধক ছিলেন। ইহার ফলে শাস্তি যখন তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া সরলারী সাধীর। তাহার বৰ্ত্তে সহাস্ত্রনী হইবার জন্য উপাসনাত হইল, তখন তাহার রূপের আঁখে সম্প্রদায়ের খণ্ডের ত্যাগের ঘর নিমিন্দের মধ্যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আমাদের ত্যাগ-ধর্ম ভোগের ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়া সম্প্রদায়ের দল চত্র ভঙ্গ হইয়া গেল।

সীতারামে ও দেবী-চৌধুরাণীতেই ভোগের ও ত্যাগের সত্য
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এখানে ভোগ আপনাকে পরিপূর্ণ মাত্রায়
পাইবার জন্যই আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। যোগবৃত্ত কহিয়াছেন—
যদি জীবন পাইতে চাও, তবে জীবন পাত কর। আমাদের প্রাচীনের
ইহার বহুপুরুষের কহিয়াছিলেন—ত্যাগেরহেকৰ অমৃতবস্মনাং। অর্থাৎ
একমাত্র ত্যাগের ধরাই অমৃত লাভ হয়। ভোগের লোভ ছাড়িয়াই
ভোগের পরিতৃপ্তি লাভ করিতে হয়। ভোগের অমূল্যতার অতিরিক্ত
জ্ঞানার আছে উপরের শাস্তি মেলে না। ত্যাগের ধরাই ভোগ
সত্যভাবে আপনাকে পায়। এই ত্যাগের পথ নিক্ষেপের পথ নয়,
ফের কর্ষের পথ। কর্ম-সম্প্রদায়ের ধরাই, অর্থাৎ ভগবানে সকল
কর্ষ সম্পর্কে করিয়াই প্রকৃত ত্যাগের সাধন করিতে হয়। ইহাই
গীতোত্তক নিক্ষম কর্ষ-সাধনার সঙ্কেত।

সর্বকর্ষর পরিত্যাগ্য নামেক স্মরণী ঋষি

ইহাই গীতোত্তক কর্ষযোগের মূলমন্ত্র। সীতারামে ও দেবী-
চৌধুরাণীতে বক্ষিমচন্দ্র ভগবদ্গীতায় ভোগ এবং ত্যাগের মধ্যে, কর্ষ
এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবান যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,
তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। দুর্গেশনন্দিনী হইতে আরম্ভ করিয়া দেবী-চৌধুরাণী পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপাস্যাবলীর ভিতরে নিগুঢ় সূত্রপাতে এই সময় চেষ্টাটাই দেখিতে পাই।

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মবাঙ্গালাতেও এই সময়-চেষ্টাটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সময়ে ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে নান্দকবাদ, অজেয়তাবাদ এবং ইহসরবসুবাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ কিয়ৎপরিমাণে এই সকলের মধ্যে সংগ্রাম করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কেবল মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষমতা রহেন না; ব্রাহ্মধর্মের মত ও আদর্শ অনুষ্ঠানী একটা নূতন ধর্ম্মসমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হয়েন। সর্বপ্রাকারের ভয়-কুসংস্কারবর্জিত ধর্ম্মচরণ যেমন তখনকার ব্রাহ্ম-সমাজের লক্ষ্য হইয়াছিল, সেই সময় সর্ববিষয়ে সাধু-চরিত্র লাভে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রচুর সমাজের সৌন্দর্যে এঁকে ভালে ভালে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল।

অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রচুর সমাজের পৌরহিত্য এবং জাতিভেদে অভ্যুত্তি সংস্কার বর্জন করিয়া চলিতে হইত। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতালীলা কোন কালে কোনও সৌন্দর্য মহে। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি প্রাকাশভাবে অঞ্চল করিয়া সমাজচুতি হইবার ভয় জয় করাও সহজ মহে। সেকালে খাইব ব্রাহ্মসমাজে অসিলেন, একদিকে উঠিয়াছিল নূতন সমাজের কঠোার শাসনাধীনে বাস করিতে হইত; অন্যদিকে পিতা, মাতা, পবিবার ও ব্যজনবর্গ হইতেও বিচ্ছেদ হইয়া ধারিতে হইত। এইজন্য খাইবা মনে মনে ব্রাহ্মসমাজের মতবাদে বিশ্বস্ততর ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনিতন, উত্তাদের পক্ষে প্রাকাশভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করা সহজ ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নবশিক্ষিত বাঙ্গালী এই দোষানোপণ পড়িয়া।
বক্ষিমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যাকে। ১৮৫

ছিলেন। মানুষ যাহা ভাল মনে করে, দুর্বলতাবশতঃ তাহার
অমূল্যধরণ করিতে না পারিলে বড়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। শিক্ষিত
বাঙ্গালীসমাজ পঞ্চায় বৎসর পূর্বে এইরূপ অধোগতির পরস্পরেই
ঠাঁড়াইয়াছিলেন। তুহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রথান্বে এড়াইয়েও
পারিতেছিলেন না; সাহস করিয়া সেই ন্যায়ের মার্খানে ঝাপাইয়াও
p্রড়তে পারিতেছিলেন না। একদিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস মতবাদ
ও জীবন আদর্শ, অন্যদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজের কোমল স্নেহের
বক্ষন এবং কঠোর শাসনদুঃখী, এই দুই প্রতিফলন শক্তির মাঝখানে
পড়িয়া নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী অতাস্ত বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।
বাজিয়ের এই সংগ্রাম তাহার ভিতরেও বাজিয়াছিল। বক্ষিমচন্দ্র তাহার
ধর্ম-ব্যাখ্যা দ্বারা এই দুই পরমপরবিরোধী শক্তির মধ্যে একটি সমন্বয়ের
চেষ্টা করেন। ইহাই বক্ষিমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যা ও ধর্ম প্রচারের মূল
কথা। এই কথাটা না বুঝিলে বাঙ্গালী নবযুগের ইতিহাসে বক্ষিম-
চন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যার প্রথা কোথায় এবং মূল্য ও মহিমাদারই বা কি, ইহা
বুঝিতে পারা যাইবে না।

বক্ষিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের
মধ্যে একটি সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাহার অমূল্যবিশিষ্ট
ধর্মসমাজ ই নামান্তর মাত্র। বক্ষিমচন্দ্র “কৃষ্ণচরিতৈর” দ্বিতীয়
সংকলনের উপক্রমিকায় তাহার “ধর্মতত্ত্বে” যে কয়টি কথা। বুঝিবার
চেষ্টা করিয়াছেন, সংকলনে নিজেই তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। সে
কয়টি কথা এই ও—

(১) “মানুষের কতবার্গুলি শক্তি আছে। আমি তাহার ‘মৃত্য’
নাম দিয়াছি। সেইগুলির অমূল্য, প্রকৃতিগত ও চরিতার্থতায় মানুষ।

(২) তাহাই মানুষের ধর্ম।

২৪
(৩) সেই অনুশীলনের সীমায়, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ।

(৪) তাহাই সুখ ।”

এই অনুশীলনবিন্দুরে একটা সার সংগ্রহ করিয়া, বক্ষিমচন্দ্র কহিয়াছেন ।

“জ্ঞানে পাঙ্কিতে, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিন্তায় ধর্মায়তা এবং সুরে রসিকতা, এই সকল হইলে তবে মানসিক সর্বাঙ্গীন পরিগতি হইবে । আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীন পরিগতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিল্ট, সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুখ হওয়ায় চাই ।”

সংক্ষেপে ইহাই বক্ষিমচন্দ্রের অনুশীলনবিন্দুর সাধ্য । সেকালের ব্রাহ্মসমাজেরও ইহাই আদর্শ ছিল ।

বক্ষিমচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম যুগে এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । সেকালে মার্কিন চিন্তানায়ক বিখ্যাতের পার্কারের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়িয়াছিল । পার্কারের নিয়ম মতগতার নবীন ভাষায় শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন । পার্কারের চতুরঙ্গ ভক্তি বা four-fold piety এই অনুশীলন ধর্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । বক্ষিমচন্দ্র এই আদর্শের প্রেরণাভেষেই তাহার “ধর্মতত্ত্ব” রচনা করেন ।

তাহার “অনুশীলন” গ্রন্থে আধুনিক যুগোপীত জ্ঞান বিজ্ঞানের এবং ধর্মচিন্তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের একটা সমীচীন সময়ের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় । যুক্তি এবং জ্ঞানের সুমিষ্টতাই বক্ষিমচন্দ্র এই সময়ের সাধনের চেষ্টা করেন । ব্রাহ্মসমাজ মহাকাশের নেতৃত্বাধীনে খেদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র উপনিষদের বিচারযোগ্য বলিয়া গ্রন্থ করিয়াছিলেন । পুরাণাদিকে সৃষ্টি কুসংস্কার-
সকল বিলুপ্ত একবারেই বর্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা ইহা তলায়। দেখেন না যে বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশে যেমন উপনিষদের প্রাকাশ হইয়াছিল, সেই রূপ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশেই হিন্দু পুরাণের ও পৌরাণিক ধর্মেরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। বেদে ভূল ভ্রান্তি আছে; বেদে দেববাদ্য আছে; বেদে যজ্ঞবাচ্ছা আছে।

উপনিষদ এই বৈদিক দেববাদ্যের এবং ক্রিয়াকাণ্ডের সমস্ত করিয়া ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মদার্শন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানে মানুষের সকল জ্ঞানার নিঃসৃতি হইল না। উপনিষদ তিন প্রকারের উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন—এক স্রুতি উপাসনা; সমাধির অবস্থাতেই এই স্রুতিপূর্ণ উপাসনা সত্যব হয়। সকল প্রকার বহির্ভিত্র চেষ্টায় নিরুক্তি হইলে আর যখন আপনার বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে অবস্থান করে, তখনই এই সমাধির অবস্থা লাভ হয়। গুরুফটি মুখে শুনিয়াছি যে এই সমাধির অবস্থাতে সাধক ব্রহ্মরূপের অপারোক্ষ অমূল্য লাভ করেন। এই অনুভবেরই নাম ব্রহ্মাত্মৈকতাত্ত্বিক। ইহাকে স্রুতি উপাসনা কহিয়াছেন। এই সমাধির অধিকার নাহি লাভ হয় নাই, তিনি স্রুতিপূর্ণ উপাসনার অধিকারী নহেন। তাহার জ্ঞান ব্যতিরেকেই এবং অষ্টী এই ছুই প্রকারের ব্রহ্মপূজা বিহিত হইয়াছে। “নেতি, নেতি”—ইহা ব্রহ্ম, ইহা ব্রহ্ম নহ, ইহা ব্রহ্ম নহ, ইহাই ব্যতিরেকী উপাসনার সূত্র। “ন সন্ন্যাসে তিথিতি রূপমস্ত”—এই চক্ষুপ্রায় জগতে ইহার রূপ নাই; অর্থাৎ চক্ষে যাহা কিছু দেখি তাহা ব্রহ্ম নহে; কর্ণে যাহা কিছু শুনি তাহা ব্রহ্ম নহে; মন এই ইন্দ্রিয়মূলকতির পথচার্য যাইয়াই যাবতীয় মনোন্ত বিষয়ের স্থাপি করে, এ সকলকে ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মকে মনের ধারা। মনন করা যায় না। বাক্যের ধারা। ব্যক্তি করা যায় না।

এই রূপে ব্রহ্মের মনোন্ত, বাক্যাতীত, অজগাতীত সত্তার চিন্তাহই ব্যতিরেকী উপাসনা। এই উপাসনার শেষ কথা—
অষ্টাদশ কথ্য অশ্চ্যাশ্বতভেতে
অষ্টাদশ কথ্য অশ্চ্যাশ্বতভেতে
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা

শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের শ্রোতাদের
অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য অষ্টাদশ কথ্য
নবুয়ের বাংলা
বক্ষিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা

এই কথাটার ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই একটা বিরোধের মাঝখানে দাড়াইয়া রহিয়াছিলেন; কোনও উদার সমভঙ্গের ভূমিতে উঠিতে পারেন নাই। বক্ষিমচন্দ্র এই চেষ্টাটা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের কর্মে যাহা অপূর্ণ ছিল তাহা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বক্ষিমচন্দ্র তাহার ধর্ম্মব্যাখ্যাতে উপনিষদ-ধর্মের সঙ্গে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের একটা সম্পর্কের চেষ্টা করিয়া। সম্ভব করিতে গেলেই পূর্ববর্তক ও উত্তরবর্তক উভয় পক্ষকেই একটা সাধারণ ভূমিতে তুলিয়া লইতে হয়; উভয়েরই পাশ্চাত্যকে একটা পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিতে হয়; এবং সেই পূর্ণতর জ্ঞানের কর্ষণাধিকে উদ্ভয়কে কষ্টিয়া উভয়ের খাদ বা মিথ্যা কিংবা সত্যভাসকে নষ্ট করিয়া উভয়ের মধ্যে পূর্বকার বিরোধ ভঙ্গন করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত সম্পর্কের পদ্ধতি। বক্ষিমচন্দ্র এই পদ্ধতির অমূল্য করিয়াই উপনিষদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের একটা রূপ করিতে চেষ্টা করেন।

(৩)

বক্ষিমচন্দ্রের এই সমভঙ্গে চেষ্টার প্রথম সূত্র মানবপ্রকৃতির উপরেই মানবধর্ম গঠিত। যে যাহা নয়, সে তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। জ্ঞান মাত্রই এইজন্ত আহ্বায়। মানুষের মধ্যে যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে মানুষ কখনওই ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। মানুষের এবং ঈশ্বরের মধ্যে সামান্য ধর্ম আছে বলিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে, ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে পারে, ঈশ্বরের পূজা করিতে পারে। এই কথাই। উপনিষদে আংশিক- ভাবে প্রকাশিত। উপনিষদ মানুষকে কেবল আত্মারূপেই দেখিয়াছেন। মানবাত্মার সঙ্গে মানব দেহের যে নিয়ূড় অঞ্চলী যোগ হইয়া প্রত্যক্ষ মানবের উৎপন্ন হইয়াছে; মানুষ কেবল বিদেহী আত্মা।
নহে, কিন্তু দেহের অত্যাসম্পন্ন জীব, এ কথাটা উপনিষদ উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য উপনিষদ-ধর্ম মনুষ্যের পূর্ণ ধর্ম নহে; অন্ত্যের ধর্ম মাত্র। এই অন্ত্যের ধর্মে হিন্দু স্থিতিলাভ করিতে পারিল না। এবং এইজন্যই উপনিষদ-ধর্মের দেহ এবং অত্যাচার মধ্যে বিরোধের সমস্ত কবর চেষ্টায় পৌরাণিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হয়। পুরাণে ব্রাহ্মণ বজ্রিত হয় নাই; পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা মানব প্রকৃতির উপরে। বক্ষঃচতুষ্ক কবিতেছেন যে আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্মসংরক্ষণ বিষয়ে এই সাধারণ মানবতায় আদর্শের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

“হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবাদ চর্চা বা বলবান কার্যকেই নিহিত হয় নাই; বুদ্ধির বৃহস্পতি বা জানি ক্রান্ত অপিত হয় নাই; রসসম গন্ধর্বভাঙ্গ বা বাগদেবীতে নাই। কেবল সেই সর্বনাশ্বসেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞান পরিত্যাগ বিশিষ্ট যজ্ঞেশ্বরিণী বিষ্ণুতে নিহিত আছে।”

যজ্ঞেশ্বরিণী বিষ্ণুই হিন্দুর সকল অবতারের মূল। এই বিষ্ণু হইতেই বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু জগৎ-কারণ। এই জগৎ কারণ-রূপী বিষ্ণুরই বিকার বা বিষ্ণু বা বিশ্বের পরিবার পরিভাষায় পরিভাষায় পরিপূর্ণ। কারণে যাহা নাই, কার্যের তাহা ধাকিতে পারে না। কার্যের সর্বজ্ঞান পরিত্যাগ কারণেও নিত্যসিদ্ধরূপে বিষ্ণুমান রহে। চিত্তের যে ছবিটি তৃণিকামূলের তিলে তিলে ফুটিয়া উঠে, চিত্রকুরের অন্তরে তাহা পরিপূর্ণরূপে পূর্বকই বিষ্ণুমান রহে। ইহাই চিত্রের নিত্যসিদ্ধরূপে। এই জগতের নিত্যসিদ্ধরূপে বিষ্ণুতে নিতা বিষ্ণুমান। এইসিদ্ধে মানুষেরও নিত্যসিদ্ধ সর্বজ্ঞানরূপ বিষ্ণুতে নিতা বিষ্ণুমান। এইসিদ্ধেই হিন্দুর সার্বজ্ঞানীয় ও সর্বব্যাপী পূজনীয়
দেবতা বিষ্ণু। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

( ৪ )

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল প্রাচীন উপনিষদ-ধর্ম অথবা আধুনিক আন্তর্জাতিক মূল তত্ত্বের সঙ্গে দেশ-প্রচলিত হিন্দুধর্মের মূল সত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াই কৃত্তি রহেন নাই; আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ইহার একটা যুক্তিসঙ্গত সম্পর্কের প্রয়াস পাইয়াছেন।

ফলতঃ তিনি যে অনুশীলনধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহ। এক দিকে ইউরোপের কোমত প্রতিষ্ঠিত ধর্মের এবং অন্যদিকে ভারতের গীতায়ত ধর্মের সমন্বয় করিবার প্রয়াস মাত্র। কোমত প্রত্যক্ষ মানুষকেই বা মানুষবর্গে মানবের একমাত্র সাধারণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোমত সিদ্ধান্তে ইশ্বর নাই; পরলোক নাই; ধর্মের অতি-প্রাকৃত প্রামাণ্য বা প্রতিষ্ঠা নাই। কিন্তু আছে এই প্রত্যক্ষ মানুষ এবং এই প্রত্যক্ষ মানুষ আপনার অপূর্ণতার ভিত্তির দিয়াই যে পরিপূর্ণতার আদর্শের দিকে আমাদিগের চিন্তাকে প্রেরিত করে সেই আদর্শ। এইজন্যই ইহাকে বিশ্বমানব ধর্ম বা Religion of Humanity বল। হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই কোমত ধর্মের সঙ্গে গীতায়ত ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া। তাহার অনুশীলন-ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোমত-ধর্মে যাহ। অপূর্ণ ছিল, গীতায় তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কোমত-ধর্ম প্রাকৃত মানুষ এবং অতি-প্রাকৃত ইশ্বরের মধ্যে একটা বিশাল ব্যাখান প্রত্যক্ষ করিয়া। অপ্রামাণ্য বলিয়া। ইশ্বরতত্ত্বকে বর্জন করিয়া। কেবল সাধারণ ও প্রত্যক্ষ মানবতার উপরেই আপনাকে গড়িয়া। তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। গীতার ঈশ্বর-বাদ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উপনিষদ মানুষের আত্মাকে মাত্র সংক্রান্ত ধরিয়াছিল। গীতা বিশ্বাসিতোপে এবং
বিশেষ করে রসায়ন এবং মানুষের সঙ্গে কাজের একাদশতা প্রতিষ্ঠা করিয়া উপলব্ধিদের বিরোধ নষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। গীতায় ভগবান আপনাকে কেবল নিরকার মহাশ্রম্পর বলিয়া। প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, কিন্তু যাবতীয় ইক্সিয়া-গ্রাহ বস্ত্রকেই আপনার প্রকাশ বা বিশৃঙ্খলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনিই মানুষের অন্তর। তিনিই মানুষের মন; তিনিই মানুষের বুদ্ধি; তিনিই মানুষের ইক্সিয়ামেরও প্রতিষ্ঠা। এই মানুষের দেহ ক্রমবিকাশ ধারাতে যে সর্ববৃহৎ সম্পর্ক রূপের ইঙ্গিত করে, সেই সর্ববৃহৎ সম্পর্ক মানুষের রূপ, যাহাই একাদারে প্রায়ুক্ত ও অপ্রায়ুক্ত, যার চাঁচে মানুষের রূপ ফুটিয়া উঠে,—এই মহাবিদ্যায়ন মানুষের রূপ ভগবানে নিঃসিদ্ধ। পরিপূর্ণ বিশ্বকর্মা মানব প্রকৃতির এ সকল ভগবানে নিঃসিদ্ধ। হুতরাং কোমর বাদ এবং অাধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ মানুষ এবং ইস্থারের মাঝখানে যে ব্যবধানের কর্ন। করিয়াছে গীতার ধর্মে তাহার চুড়ান্ত মৌলিক হইয়াছে। কোমর-ধর্ম এবং অাধুনিক ইউরোপীয় যুক্তিবাদ উভয়ই ইস্থারতত্ত্বের বর্জন করিয়া। পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শের উপর অাধুনিক সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। গীতা ইস্থারকে রাখিয়াও এই চেষ্টাই করিয়াছেন। এই জন্ম গীতা ধর্মে অাধুনিক যুগের ইউরোপীয় অনুশীলনধর্ম পূর্ণতর এবং পূর্ণতম হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের পঞ্জাব ভঙ্গ পূর্বক ইরাজাতিয় বোধের। সকলেই অাধুনিক ইউরোপীয় সাধনার প্রভাবে অভিপ্রুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ বা স্বাক্ষরগানের আশ্রয়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের সঙ্গে মানবের সাহায্যিক ধর্মপ্রবর্তন একটা সময়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অনেকেই ভিতরে ভিতরে এই যুক্তিবাদকে অগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ বাহিরে দেশপ্রাচীত ধর্মের অসংহত এবং অনুশীলন অসত্য জানিয়াও বর্জন করিতে পারিতেছিলেন না; এইজন্য।
বাঙ্গলচন্দ্রের ধর্মীয় ব্যাখ্যা ১৯৩

তাহাদের ধর্মের জীবন এবং চরিত্র উভয়ই পদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থায় বাঙ্গলচন্দ্র তাহার ‘অনুস্থিতন-ধর্ম’ প্রচার করিয়া এই সাংঘাতিক বিরোধের একটা মীমাংসার চেষ্টা করেন। বাঙ্গলচন্দ্রের ধর্মীয়-ব্যাখ্যার ইহাই প্রধান কথা। ব্রাহ্মসমাজ যে কাজটা করিতে চাহিয়াছিলেন, অথচ পুরাতনতায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, বাঙ্গলচন্দ্র তাহার ধর্মীয়-ব্যাখ্যায় প্রকৃতপক্ষে সেই কাজটাই করিতে চাহিয়াছেন। মহব্যর্ধির নেতৃত্বাধীনে ব্রাহ্মসমাজ প্রাথমিক উপনিষদের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাকের উপরেই মোটামুটি আপনার ধর্মবিজ্ঞান এবং সাধন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। মহব্যর্ধি দেবসেনাতের প্রকৃতির ভিত্তিতে যে একটা রক্ষণশীলতা ছিল, তাহারই প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ তাহার নেতৃত্বাধীনে যুরোপীয় যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়াও একেবারে সেই যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে নাই। বিশেষতঃ মহব্যর্ধি ব্রাহ্মসমাজ অন্যতঃ তাহার বহিরাবরণে যথাসাধ্য স্থানের সাধনার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজকে একটা উদার বিশ্বজীবন আদর্শের উপরে গড়িয়া তুলিতে যাইয়া এই স্বাদেশিকতার আবরণটা একেবারে কাটিয়া ছাড়িয়া বর্জন করেন। মহব্যর্ধি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দু ভাবের ও হিন্দু সমাজের যে বিরোধ জাগে নাই, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সে বিরোধ কেবল জাগিয়া উঠিল তাহা নহে, অতি অল্পকাল মধ্যেই অত্যন্ত তীব্র হইয়া। উঠিল। এই বিরোধের মূখ যাহারা হিন্দু ভাবের ও হিন্দু সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারা কিছুটা এই ব্রাহ্মসমাজের সত্য মতবাদ এবং উন্নত আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতে-চিলেন না। ইহাতে বাংলার শিক্ষিত হিন্দুসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। বাঙ্গলচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের যথাস্থল বর্তমান ভারতের
উচ্চারের মূলমন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহাকেই তাহার ধর্ম-ব্যাখ্যায় দায়। দেশমধ্যে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ‘অষ্টুলেন-ধর্ম’ যুক্তিগীতিযুক্তিবাদ ও কোমতের মানবধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মসাধনের সমস্যা করিতে চেষ্টা করে। তাহার ব্যাখ্যায় তিনি আধুনিক ব্রাহ্মসাধনের ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভক্তিসাধনের সঙ্গে ভারতের সনাতন তত্ত্বভাবহিত এবং ভক্তিসাধনীর সময়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার “কৃষ্ণ-চরিত্রে” বসন্তচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে মূর্তিযুক্ত পরিপূর্ণ আদর্শ। প্রতিষ্ঠাত করিয়া সেকালের যুগের যুগের চিন্তাবাদ মানবতার আদর্শের একটা পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক মূর্তি গড়িয়া। তুলেন; এবং এইভাবে কোমত প্রচারিত আধুনিক বিশ্বমানবধর্মের ভারতীয় সাধারণ সনাতন ভক্তিপূর্ণ সঙ্গে মিলাইয়া দেন। সে সময়ে আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোমত-মতবাদের প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কলিকাতায় ওয়াগনাঁড়ে যোগ মহাশয় এই মতের একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। “ইংরাজী নেশন”—সম্পাদক ওয়াগনাঁড়ে যোগ এই মতবাদের চেয়ে এই মতবাদের চেয়ে অধিক ছিলেন। তারা অনেক কোমত-মতবাদের আশ্রয়ে হিন্দুসাধনের আশ্রয়ে সঙ্গে তাহাদের যুগের যুক্তিবাদসমূহের উপর প্রতিষ্ঠাত দত্ত ও বিশ্বাসের একটা কৃত্রিম সমাধিস্থ প্রতিষ্ঠাত চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরাজী প্রচারিত হিন্দুধর্মের কিছুই মানিতেন না; অথচ আমাদের মত নিজেদের মত ও বিশ্বাস অপুর্যায়ী অচার অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়া সমাজের বহির্ভূত হইতে চাহিতেন না। কোমতমতে সমাজ শুদ্ধ রক্ষা এবং সমাজ শাসনকে অব্যাহত রাখিবার জন্য যথানিয়োগে ত্যাগ স্বীকার করিয়াই মানবের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য বলিয়া প্রচার করে। এই মতবাদকে আশ্রয় করিয়া আমাদেরও একদল ইংরাজী শিক্ষিত লোক নিজেদের জীবনে ব্যক্তিগত
বক্ষমচন্দ্রের ধর্ম-ব্যাখ্যা

মতামতের সঙ্গে প্রচলিত হিন্দু সমাজের যে বিরোধ বাধিয়াছিল, তাহার একটি নিঃপত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইউরোপে এগুলো ব্যক্তি-ধর্মসাধনের সঙ্গে সমাজশাসনের একটি সময় সম্ভব; কারণ আধুনিক ইউরোপে সমাজশাসন এবং রাষ্ট্রশাসন একাংশ হইয়া গিয়াছে。 সমাজ-শক্তি রাষ্ট্রশক্তিকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই আলাপকে রস্তা করিতেছে। আর রাষ্ট্র-শাসনের সঙ্গে ধর্মসাধনের একটি ভাগ-বাচ্চাতোরাও হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্মসাধন উভয়ই নিজের নিজের এক একটি গণ্ড কার্য। নিজেদের একটি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য বা autonomy প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া। ইউরোপে এখন স্বাধীনভাবে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুষ্ঠানীয় ধর্মসাধন করিয়াও লোকে স্বচ্ছন্দে সমাজের প্রভূত মানীয় চলিতে পারে। ইহাতে তাহাদের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি হয় না, ধর্মবুদ্ধিতেও আঘাত লাগে না। ভারতবর্ষে এখনও জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এই স্বাতন্ত্র্য বা autonomy প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্বর্গে আমাদিগের মধ্যে কোমত-পষ্ঠার অমূলক করিয়া ব্যক্তির স্বাধীনতা বা ধর্মবুদ্ধিকে অকৃত রাখিয়া সমাজ-শাসন মানিয়া চলা সম্ভব নহে। সমাজ-শক্তির সঙ্গে ব্যক্তি-ধর্মসাধনের একটি সময় সাধন এখানে অত্যাবশ্যক। বক্ষমচন্দ্র এই সময় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন বাংলার নবমুগ্ধ সর্কশ্লথে সমাজ এবং ব্যক্তি, শাস্ত্র এবং সাহিত্য, সংক্ষেপে বিভিন্ন উপাদান,—এ সকলের মধ্যে একটি সময় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষের লোকে নানা ধর্ম বাজন করে দেখিয়া তিনি এইসকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মধ্যেও একটি সময় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কৃষকজানের উপরে রাজার সময়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বক্ষমচন্দ্র ও তাহার ধর্মবাধ্যাত্মে সেই চেষ্টাই
করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের উপরে নহে, ঈশ্বর-ভক্তির উপরে। রাজার সমভয়ের শীত ছিল বেদান্ত। ব্রক্ষিমচন্দ্রের সমভয়ের শীত হইল ভগবদ্গীতা। এই গীতা-ধর্মের উপরেই তিনি আধুনিক ইউরোপীয় ধর্ম এবং লোকশায়ের আদর্শকে হিন্দু ভারতের সনাতন ভক্তি-ধর্মের সঙ্গে মিলাইয়া। তাহার অনুশীলনের ধর্মতত্ত্বকে গড়িয়া তোলেন। ইহাই বসিকমচন্দ্রের ধর্মস্থায়্যায়ের বিশেষত। আধুনিক ইউরোপ প্রাচীন ধর্মের অতিপ্রাচুর ঈশ্বর-বাদকে উপেক্ষা করিয়া। পরিপূর্ণ মনুষ্যতের সঙ্কাপে চুটিয়াছে। মহাত্মারা। বীণাশ্চূটকেই ঈশ্বরের একমাত্র অবতার বলিয়া ভজন। করিয়া। আসিয়াছেন। আধুনিক মহাত্মারা। এই বীণাশ্চূটকেই মানবতার চরম আদর্শের ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্বাসবানীর জীবনে মানবের সকল রুক্ষতর অমূল্যতার হয় নাই। পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণ-চরিতে" বসিকমচন্দ্র ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শারীরির বলে আদর্শ বলবান। শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ের ক্ষুদ্র-সমাজে সৎপ্রধান অগ্রদূষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সেনাপতিবিশেষ শ্রীকৃষ্ণ অধিতাল ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী রুক্তিসকলও চরম ক্ষুদ্রতে পাইয়াছিল। মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া যতদূর সরবর্ধন হওয়ায় যায়, কৃষ্ণ ততদূর সরবর্ধন। অপূর্ব অধ্যাত্ম তব, ধর্মতত্ত্ব, যাহার উপরে অজ্ঞ ও মনুষ্য বুদ্ধি যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা ও সঙ্কীর্ণতায় এমন কি অখণ্ডতায়। পর্যাং তাহার আয়ত্ত ছিল কৃষ্ণের কার্যকারিণী রুক্তিসকলও চরম ক্ষুদ্রতি প্রাপ্য। তাহার ধর্ম এবং সত্য অবিচলিত। বলবলগুণের অপেক্ষা বলবান হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শাস্ত্রের জ্ঞান দৃঢ়তাত্ত ও দৃঢ়প্রতিকৃত। তিনি সর্বলোকহিতীয়, কেবল মনুষ্যের-সত্তে গো-বৎসাদি তর্কযোগীর প্রতি তাঁহার দয়া। তিনি আত্মীয়- স্বজন, জ্ঞাতি-গাথিত হিতীযী, অথচ আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি
তাহার শক্তি। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থ স্বজনের বিনাশের কুষ্টিত হইতেন না। এই সকল শ্রেষ্ঠমুখি কুঞ্জে চরম ক্ষুতি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিন্তবঞ্চিত বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অপরামুখ ছিলেন না; কেন না তিনি আদর্শ মমুষ্য।

“কুঞ্জ সর্বব্রত সর্বসময়ে সর্বব্যত্যের অভিযুক্তিতে উঞ্জন। তিনি অপরাজ্ঞেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরামূখ, ধার্মিক, নীতিহীন, धर्मजन, लोकहितवी, आकাশी, अकाशी, निरंप्रेक्ष शास्त्र, शिक्षित, निरंरहस्य, नष्ट, तপশी। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম নিবৃহত করেন, কিন্তু তাহার চরিত্র অমায়ী।”

বক্ষ্মচন্দ্র “কুঞ্জ-চরিত্র” পরিপূর্ণ মমুষ্যদের সঙ্গে ঐশ্বর-প্রকৃতির সময় প্রতিষ্ঠা। করিয়া আধুনিক সাহিত্যাদের বিশ্ব-ধর্মের গোড়াপত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রাজা রামমোহন যে কর্মের সুচনা করেন, বক্ষ্মচন্দ্র সেই কর্মকেই আধুনিক সময় ও সাহিত্যাদের উপযোগী করিয়া পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা নব্যসংগীতের মূল-দৃষ্টিক রাজা রামমোহন যে সময় ধরা। প্রবর্তিত করেন, বক্ষ্মচন্দ্র সেই ধরােকেই তাহার “ধর্মতত্ত্ব” ও “কুঞ্জ-চরিত্রে” ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।
ব্রহ্মাণ্ড কথা

ব্যক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতি

সাধারণ বাঙালী পাঠকের। ব্যক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম গুলাকে বলিয়াই জানেন। অপেক্ষাকৃত অল্ল লোকেই তাঁর ধর্মের প্রাণ। আলোচনা করিয়া থাকেন। যাঁরা করেন, তাঁরাও সকল ব্যক্তিসম্পন্ন ধর্মের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি, ইহা তলাইয়া দেখেন না। বহুদিন হইতেই এদেশে রাষ্ট্রসমাজের উপরে লোকের অন্ততঃ একটা বিবাদ জন্মিয়াছে। ব্যক্তিসম্পন্ন তাঁর “অনুশীলন,” “ভগবদ্গীতায়” এবং “কৃষ্ণ-চরিত্রে” ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে হিন্দুধর্মের প্রতি একটা নূতন অনুরাগ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি রাষ্ট্রসমাজের প্রভাবকে ক্ষুদ্র করিয়াছিলেন, অনেকেরই এই ধারণা। এই জগতের অনেকেই, ব্যক্তিসম্পন্ন ধর্মের আলোচনায় প্রভূত হইয়া যে একটা উদার সমাজের সন্ধানে গিয়াছিলেন, ইহা ধরিতে পারেন না। চলিত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙালিদেশে রাষ্ট্রসমাজের প্রতিকূলে একটা প্রবল আন্দোলন জাগিয়া উঠে। ফলতঃ এই আন্দোলনের ভিত্তিকর কথা ঠিক রাষ্ট্রসমাজের প্রভাব নষ্ট করিও ছিল না। ইহার মূলে একটা নূতন পরজাতিরন্তু, বিশেষতঃ ইংরেজ-বিদ্রোহকার জাগিরছিল। রাষ্ট্রসমাজ অনেকটা বিদেশী চং অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটা করিত সার্বজনীনতার সন্ধানে যাইয়া, রাষ্ট্রের সমাজ সাদেশকতাকে কেবল উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা।
নেহ, প্রকাশভাবে তাহার প্রতিকূলভাই করিতেছিলেন। এই কারণেই চলিষ পক্ষে বৎসর পূর্ববর্তী এই স্বাধিশিক্ষকতার ভাবনাতে ব্রাহ্ম-সমাজকে যাইয়া গুরুতর আঘাত করিতে আরম্ভ করে। এই আন্দোলনকে আমার সেকালে হিন্দু-পুনরুদ্ধস্থর বা Hindu Revival নাম দিয়াছিলাম। এই আন্দোলনও আমার বর্তমান চিন্তা, ভাব ও কর্মের ধারাকে নানাদিক দিয়া পুটু করিয়া তুলিয়াছে—সে কথা আর একদিন, ঈশ্বর ইচ্ছা হইলে, কহিব। বর্তমান প্রাচীন কেবল এই মাত্রই বলা প্রয়োজন যে অনেকে বস্ত্রমেচ্ছরকে এই পুনরুদ্ধস্থরের একজন প্রধান পুরোহিত বলিয়া মনে করেন। এই কথাটাই সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেকেই এই পুনরুদ্ধস্থরে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে নিজেও যে একজন একবার করেন নাই, এমন নহে। যুগীয় ধর্মের প্রতিপক্ষ করিতে যাইয়া ধীরীয়া ধীরীয়া পাট্টাদিগের প্রচারের ব্যাপার জমাইয়া, বাংলার হিন্দুসাধনকে ধীরীয়াৰ হাত হইতে বাঁচাইয়া। প্রথমে “বেদান্ত প্রতিপাদ” ব্রাহ্মসাঙ্গের প্রচার করিয়া। ব্রাহ্মসাঙ্গে সর্বপ্রথম আধুনিকনির্মাণ হিন্দুপুনরুদ্ধস্থর প্রবর্তিত করিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজা রামনাথ হিন্দু ধর্মৰ ও হিন্দু সাধনার সংস্কার ও পুনরুদ্ধস্থর করিতে যাইয়া, একটা সমীচীন সম্মিলনের পথে ধর্মৰ চলিয়াছিল। তিনি হিন্দুর ধর্মৰ ও সাধনারকে দৈশকাল পাটোপ- শোচী করিয়া সত্য ও সত্যের করিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর- ধর্মৰ ও বিদেশীয় সাধনার সংস্কার হিন্দুধর্মৰ ও হিন্দু সাধনার কোনও মারামাটর বিরোধ বাধাইতে যান নাই, কিন্তু একটা উচ্চতর জাতের ও সাবরণনী অভিজ্ঞতার ভূমিতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মৰ মধ্যে কোথায় মিল আছে, তাহা দেখাইয়া ধর্মৰ ধর্মৰ জগতে প্রাচীনকাল হইতে যে বিরোধ বাধিয়া আছে, তাহাই সিদ্ধান্তে চাহিয়াছিল। সময়ের ও সময়ের রাজার শিক্ষার ও সাধনার মূল কথা ছিল। ইহাই বস্ত্রম
চন্দ্রের ধর্মালোচনা ও ধর্মসাহিত্য তথা মূল কথা, পূর্ব প্রবন্ধে ইহা দেখিতে পাই। কিন্তু সাধারণ বাঙালী পাঠকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখেন না। অনেকেই এই জ্ঞান বস্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিতে পারে না। তথ্যর অনেকেই এই জ্ঞান বস্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিতে পারে না। ধর্মালোচনা ও ধর্মসাহিত্য, হিন্দু-পুরাতনাধিকারে একজন প্রধান পুনরুদ্ধিত বলিয়া মনে করেন। সে আন্দোলন প্রধান নায়ক ছিলেন, বন্ধিসফল নহেন। শাসন ভর তর্কচুড়ামণি মহাশয়। তার অনেকেই একাধিকারী জানেন না যে বন্ধিসফল তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের মতামতবাদী ছিলেন না। তর্কচুড়ামণি মহাশয় যে ভাবে ধর্মালোচনা করিয়েছিলেন সাধারণের বক্ষ দিতে পারেন না। তর্কচুড়ামণি মহাশয়ের পক্ষাত্তে আমরা সেকালে "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যা করিতাম। বস্ত্রস্ফূর্তি এই উপাধি তত্ত্ব ধরিয়া দেখা যায়। তাই অমূল্য আর রাখায় না। ভবনস্তস্তীতায় কিছু কৃপণ-চরিত্রের কথা ও এই "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যার নাম গণ্ড পাওয়া যায়। বর্ণমালা তার ধর্ম-ব্যাখ্যায় আধ্যাতিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। ফরাশীদের চিন্তা-নায়ক মসীদের রোহে (Renan) যে প্রতি ধরিয়া রীতি- চরিত্রের ও রীতিকীর্তির একটি যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, বস্ত্রস্ফূর্তি ছাড়াই বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রতি অবলম্বনেই হিন্দুধর্মের ও কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর এই জ্ঞান চন্দ্রের ধর্মসাহিত্যের অর্থকরণে বাংলায়। বিশেষের পথে ধরেন না, একটি উদ্দার সমাধানের পথে ধরিয়াছিলেন। এই জ্ঞান চন্দ্রের ধর্মসাহিত্য আধ্যাত্মিক বাংলার চিন্তার ও সাধনার ঐতিহাসিক ও বিশেষ স্থানের অধিকার করিয়া আছে। রাজা রাম-মোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রীতিকীর্তির পর্যন্ত নবযুগের বাংলার সাধনা ও সাহিত্যের মধ্যে যে একই ধারা নিরবচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহিত।
হইয়া আসিয়াছে, একথাটা অনেকেই ধরিতে পারেন না। এই ধারাতে বাংলার শান নাই, বাংলার নব্যাসের ইতিহাসেও তাহার বিশেষ শান ধারিতে পারেন না। বক্ষিমচন্দ্র এই ধারারই লোক বলিয়া, বাংলার নব্যাসের কথায় তাহার একটা অন্যতমাধারণ প্রতিষ্ঠা আছে।

( ২ )

রাজা রামমোহন যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, বক্ষিম-সাহিত্যে তাহাই অস্ত্রীয় ও পরলোক হইয়া উঠিয়াছে। রাজার পথ সময়ের পথ ছিল। কি রস-সাহিত্যে, কি ধর্ম-সাহিত্যে, সকল বিভাগেই বক্ষিমচন্দ্রও একটা উদার সময়-সূত্র ধরিয়া চলিয়াছেন। যেমন ধর্মবিচারে, সেইরূপ রাজ্যের সম্বন্ধে আলোচনাতেও রাজা রামমোহন এই সময়ের পথেই চলিয়াছিলেন। রাজার রাষ্ট্রনীতি বিরোধের উপর গড়া। উঠে নাই, একটা উদার সময়ের ভূমিকেই গড়া। যুগলী চেষ্টা করিয়াছিল। তখনও ব্রিটিশ-সিংহ এদেশে নিজের মৃত্তি ধারণ করিয়া নাই। তখনও দেশের লোক একেবারে হতবল হইয়া পড়ে নাই। তখনও, আর কিছু ধাক্কা আর না ধাক্কা, কামড়াইবার শক্তিত। দেশে ছিল। আর ধাক্কা বা না ধাক্কা, নূতন রাজপুরুষেরা দেশের লোকের নখদন্তের ভয়ে। তখনও করিয়ে।

ক্রমে ইংরেজের সঙ্গে দেশের লোকের যে তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে, রাজার সময়ে তাহার পূর্ববাসায় ফুটিয়া। উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ শাসন যে পরগাছা, ইহা রাজা দিবাসীতে দেখিয়ে পাইয়াছিলেন। এই পরগাছা যে চিরদিন বা বহুদিন দেশে বদ্ধমূল হইয়া ধারিতে পারিবেন,—ইহাও রাজা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজা বিলােতে যাইয়া। আরুনন্দ নামে একজন ইংরাজকে তাঁর লেখা-পড়ার কাজে নিযুক্ত করেন। এই আরুনন্দ। সাহেব লিখিয়াছেন।
যে রাজা মনে করিতেন যে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া নাম দিত দিয়া লাভবানই হইয়াছে । আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার প্রস্তুত মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া, ভারতের বৃহত্ততানুগত জড়তা নষ্ট হইয়া যাইবে । এই জন্ত তিনি ইংরাজ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজটা প্রয়োজন, ৩০৪০ বৎসরের মধ্যেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে; এবং চলিয়া যে বৎসর পর্যন্ত ইংরাজ ভারতের রাজা হইয়া থাকিবে, তার পরেই ভারতবর্ষের আধুনিক জগতের অপরাপর সভ্যতার মতন রাজ্য আধীনতালাভ করিবে,—ইহাই রাজা মনে করিয়াছিলেন । আর্ন্দ সাহেবের জবানীতে ইহাই জানিয়াছি । রাজা আধীনতার অর্থতম উপাধি ছিলেন । আধীনতাই তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল । আধীনতাই তাহার অভিধানে পরম পূর্ণিমা ছিল । এই জন্তই হিন্দুর সহ্যকর্তন উদ্দেশন-মন্ত্রটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল । রাজা বৈদিক্তিক ছিলেন । মানুষ নিজের সত্য স্বরূপে “নিতায়স্থ স্বভাববান”—ইহাই রাজার শিষ্যত্বের মূল কথা ছিল । এই “নিতায়স্থ স্বভাববান” যে মানুষ তাহাকে তাঁর এই স্থলের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, জীবনের সকল বিভাগে সরবরাহ সম্পর্কে এই আধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাই রাজার সমাজ-তত্ত্বের বনিয়াদ ছিল । এই বনিয়াদের উপরেই রাজা তাহার ধর্ম ও কর্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ।
এই গেল রাজার বৈদিক্তিক অন্তঃকরণের একদিক । ইহার আর এক দিক ছিল—“সর্বভূতে আত্মগুণতি।” আমার আত্মা যে অস্তর্যাঙ্গী পূর্ণিমা বিদ্যমান থাকিয়া আমার জীবনকে পরিচালিত করিতেছেন, সকল মানুষের আত্মাতেই সেই একই অস্তর্যাঙ্গী পূর্ণিমা বিদ্যমান রহিয়াছেম, এটি প্রত্যাক্ষ করিয়া মানুষধর্মীকেই শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ কর। বৈদিক্তিক সাহায্যের আর এক দিক । বেদান্ত বহিয়াছেন—
বক্ষিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

২০৩

যশোরে অশ্রুবাকাশে তেজোময়োহতৃতমপুরুষঃ সর্ববানন্দঃ
যশোরে অশ্রুবাকাশে তেজোময়োহতৃতমপুরুষঃ সর্ববানন্দঃ
তথেব বিদিতা অতিমূল্যমন্তি নায়পশাবিচ্ছিন্তেহয়নায়

অর্থাৎ এই রাব্হিদের আকাশ বা জড়বৃষ্টির মধ্যে যে তেজোময়
অমৃতময় পুরুষ বিদ্রামন থাকিয়া সকল অমুলভ করিতেছেন, এই
অন্তরের মধ্যে (সর্বজীবাক্ষারসীরুপে) যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্রামন
থাকিয়া সকল জানিতেছেন—কেবল তাত্তাহাকে জানিতে পারিলেই
জীব মৃত্তাকে বা সংসারকে অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে,
মুক্তির আর অন্য পথ নাই। এই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে রাজ্যতম
জীবন, সাধনা ও কর্ম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই জন্মই সমাজ-
সংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আর তারই জন্ম
সকল বিষয়েই রাজা একটা উদার সমন্ধের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন।
এই সর্বভুতে আত্মবৃত্তি বা প্রক্ষঢুপির প্রভাবেই রাজ্যের রাষ্ট্রীয় আদেশকে
বিরোধ ও বিদ্রোহের দ্বারা প্রেরিত হয় নাই, কিন্তু মিলান ও সমন্ধের
সমন্ধেই গিয়াছিল। লক্ষ্মচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় আদেশও এই সমন্ধের
পথেই চলিয়াছিল। কিন্তু অনেকেই এই কথাটা ধরিতে পারেন না।

( ৩ )

রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আসে, রাষ্ট্র-রক্ষার প্রয়োজন হইতে। যার রাষ্ট্র
নাই বা রাজ্য নাই তার রাষ্ট্রনীতি—মাথা নাই যার তার মথা বাধার
মতন। আর তাকে অর্থে নিজের অধিকারে থাকা। যে বস্ত্র
উপরে যার অধিকার নাই, যাহার সমন্ধে যার মমহ-বোধ নাই—এ
বস্ত্র আমার এই বুদ্ধি যে বস্ত্র সমন্ধে নাই, সে বস্ত্র প্রকৃতপক্ষে তার
নিকটে নাই বলিলেই চলে। রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা হয় রাষ্ট্র সমন্ধে

২৬
নবযুগের বাংলা

এই মাস্ত-বোধের উপরে। কঁদাতে কঁদাতে আমাদের দেশে এই রাইয়া
আজেরোধ বা মহয়েদ ছিল কেন, বলে, ফাঁড় সহজ মহে। সমাজ
সম্পর্কে আমাদের সুখ ও স্বাভাবিক চরিত্র প্রকল্প সমাজকে জাগাইয়াছিল। এই সমাজ আমার, আমি এই সমাজের—এই
সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ভুল যেমন মাতৃগর্ভ বা
জ্ঞানশাস্ত্রীয় বাস করে, আমার। প্রত্যেকে সেই সমাজ-মাতৃকার
গড়ে বাস করিতে ছিল। মায়ের শেষেরদার। যেমন গোধূল্য স্বপ্নের
dের গভীর। উঠে, মায়ের জীবন-শক্তির দ্বারা যেমন গোধূল্য সন্তানেরের
প্রাণ বীর্য্য থাকে ও শক্তিলাভ করে, ঠিক সেই সমাজের ধনবল,
আনবল, ধর্মবল, এ সকলই আমাদের প্রতোক ধন, আন্তর ও
ধর্মের আধার ও অশ্রু হইয়। আমাদের বাসিন্দার জীবনের সার্থকতা
সম্পাদনে সহায্য। করিতে ছে। গাছের ডাল। যেমন কাটিয়া। ফেলিলে
শুকাইয়া যায় ও যায়। সেই সময় সম্প্রসারণের মিল ছিল, যাহাতে ফুল
ফুল থরিতে পারিত, তাহ। কেরালা আগন। দিয়া জালাইবার উপযুক্ত
হয়, সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলে মানুষেরও ঠিক
সেই সময় দরজাই ঘটে। এই জন্য আমার। চিরদিনই সমাজের সঙ্গে
ব্যক্তির যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গ সম্পর্ক আছে, ইহ। জানিযাম
ও বুঝিযাম। এই জন্য আমাদের দেশে চিরদিনই সমাজ সম্পর্কে একটা
গভীর মহয়েদ ছিল। আর সমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্মে; অথবা ধর্মের
প্রতিষ্ঠা সমাজে। এইজন্য আমার। চিরদিনই সমাজমূহগতায় ধর্মের
বনিযায় বাল্য। প্রতিষ্ঠা করিয়া। আলিযাহি। “যদি যোগী ত্রিকোণিকাচারঃ
সমুদ্রলজ্জনকঃ দ্বারা লোকাচারঃ মনসাহি ন লজ্জেৎ” —এই
কথাটার নিগুঢ় মর্ম ইহাই। সমাজকে কখনও অতিক্রম করিয়া
চলিও না, ইহাই আমাদের দেশের চিরকালের অনুশাসন। সমাজকে
অতিক্রম করিয়া। চলিতে পার কেবল এক অবস্থায়——নিজের
বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

মোক্ষলাভের জন্য, পরমেশ্বরকে একান্তিকভাবে জীবনের কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া।

সর্বব্যবস্থান্ত পরিত্যাজ্য মানেক শরণ ব্রজ।
অহং হং সর্বব্যপেভো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

বর্ণালীমাদিতে সর্ববিধ সমাজ-ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেবল একমাত্র আমাই শরণাগত হও; আমি তোমাকে সমাজধর্ম্মবর্জনজনিত যে পাপ তাহ হইতে রক্ষা করিব। যে ঈশ্বরে একান্তভাবে আত্মাৰ্পণ করিতে পারিয়াছে, সে যে বিশ্বের সঙ্গে একান্ত হইয়া গিয়াছে, সে যে জীবনূক্ত পূর্ণ। তার হৃদয়-একৃষ্টসকল ছিল হইয়াছে, অর্থাৎ তার আত্ম-স্বর্ণবাসন। নিশ্চয় নিত্য হইয়াছে। তার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। তার সকল কষ্ট ক্ষণ হইয়া গিয়াছে। যার কষ্টক্ষয় হইয়াছে তার সমাজের সম্বন্ধে বিশিষ্ট মমত্ববোধও যুগ্ম। গিয়াছে। সে সর্বভুক্তে আত্মবুদ্ধিলাভ করিয়া, ইহা আমার ইহা পরের, এই অভিমান হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। যে এইভাবে বিশ্বাসবৈকুণ্ঠ সন্ন্যাসিলাভ করিতে পারিয়াছে সে যে সকল প্রকারের ভেদ বিরোধের সর্বাধিক ঘনীভূত হইয়াছে, সে মুক্ত। সমাজ তাহাকে বাধিতে কিনা? ইহা ইহা আমাদের প্রচুর সমাজতত্ত্বের ও ধর্মতত্ত্বের মূল কথা ছিল। এই পথেই আমাদের প্রাচীনদের। সমাজধর্ম্ ও মোক্ষধর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পথে আমাদের মধ্যে চিরদিনই আমাদের সমাজ সমন্বয়ে একটা প্রচার ও প্রবল মমত্ববোধ জন্মিয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্র সমন্বয়ে একাকীত্ব করা ও মমত্ববোধ জন্মে নাই।

ফলতঃ আমাদের এই চিরকাল সামাজিক একাত্মবোধে রাষ্ট্রীয় একাত্মবোধ ভাল করিয়া কেন, একরূপ একাত্মবোধই ফুটিয়া উঠিতে দেয় নাই। যতদিন সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি একাধারে নিহিত ছিল,
তত্ত্বাদি আমাদের এই সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক রাষ্ট্রীয় মনস্তাত্ত্বিকের
জ্ঞানার্থী। রাধিকানিত। রাষ্ট্রের উপরে হাত পড়িলে সমাজের উপরে
হাত পড়িল । সমাজের উপরে হাত পড়িলে ধর্মের উপরও হাত পড়িল।
এইভাবে তত্ত্বাদি আমারা রাষ্ট্রবৃদ্ধি বা পলিটিক্যাল কমন্সসনের
('political consciousness' এর ) প্রকাশের নেহ, কিন্তু ধর্মের
প্রকাশের রাষ্ট্রীয় জ্ঞানার্থী ও রাষ্ট্রীয় রক্ষণ। জ্ঞান প্রবর্দ্ধন করিয়াছি।
রাষ্ট্রীয় গেলে সমাজের জ্ঞানার্থী গেল, সমাজের জ্ঞানার্থী গেলে সামাজিক
বিশ্বাসী। অনিবার্য হইয়া উঠিয়া । সমাজের শৃঙ্খলা অর্থাৎ আমার
শাসনশীল্ক নষ্ট হইলে ধর্মের আশ্রয় আর ধারিবে না। ধর্ম গেলে
সকলই যাইবে। এইভাবেই মুসলমানাধিকার সময়ে রাজপুত্র সমাজে
একটা প্রবল দেশাত্মাবধ জাগিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে সত্যত্ত্বেব
নোন শাসনবোধ বলা যায় না। রাজপুত্রদিগের বলম্বীব শব্দেশ বা স্বরাষ্ট্রে
আশ্রয় করিব। ফুটিয়া উঠে নাই, নিজেদের সমাজে আশ্রয় করিয়া
সেই সমাজের জ্ঞানার্থী ও উষ্ণতা রক্ষা করিবার জন্য জাগিয়া
উঠিয়াছিল। রাজপুত বীর-কালী শরীরের ইতিহাসে তাহাদের সমাজ
ধর্মটাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন যাহাকে রাষ্ট্রধর্ম
বা পলিটিক্স বলিয়া বুঝি, তাহা তত্ত্বভাবে ফুটিয়া উঠে নাই।
যে পথে রাজপুত বীরশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই পথেই রাজপুতানার
রাষ্ট্রীয় জ্ঞানার্থী ও লোপ পাইয়াছিল। সমাজসেব রাষ্ট্রধর্ম’ অপেক্ষা
বড় হইয়াছিল বলিয়া, রাজপুতানার দেশকালপত্র বিবেচনায় নিজেদের
নীতিকে গড়িয়া। তুলিতে পারে নাই; রাষ্ট্রধর্মের খাতিরে রাষ্ট্রীয় জ্ঞান-
বাঁচার রক্ষার জন্য সমাজসেবকে বদলাইয়া, উদার করিয়া, প্রবলতর
বহিঃশক্তির ও পরবর্তীর রাষ্ট্র ও সমাজ-শক্তির সঙ্গে একট। সত্য ও স্বায়ত্ত
রক্ষা করিতে পারে নাই। এই জন্যই রাজপুতানার রাষ্ট্রশক্তির ও
রাষ্ট্রীয় জ্ঞানার্থীর সঙ্গে সঙ্গে সকলই হারাইয়া বসিল, আর এখনও
বস্ম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি ২০৭

সামাজিক মমতাভিমানের নিগড়ে বাঁধা পড়িয়া একটা মিথ্য। গৌরবের অভিনয় করিতেছে।

বস্তুতঃ একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের ঐকান্তিক সামাজিক আত্মবোধ বা মহবোধই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন ও ভারতের রাষ্ট্রশাসনকে চিরদিন পঞ্চ করিয়া। রাথিয়াছে, এখনও রাথিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজকে আমরা রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়া লইয়া রাষ্ট্রীয় পরামর্শতার মধ্যেই বহু শতাব্দী ধরিয়া একটা কৃত্রিম ও সন্তোষ সামাজিক সাত্ত্বিক রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। ইহার ফলে আমাদের মধ্যে চিরদিনই একটা অতি সত্ত্ব সামাজিক আত্মবোধ (social consciousness) ছিল, কিন্তু ইংরাজ আসিবার পূর্বে একটা সত্ত্বার রাষ্ট্রীয় আত্মবোধ বা political consciousness জাগে নাই। এইজন্য আমাদের সমাজ ছিল, কিন্তু আধুনিক জগতে যাহাকে nation কহে, তাহা ছিল না। আমাদের প্রাচীন সাধনায় চাহি বস্তু আমাদের চঞ্চল খুবই ফুটিয়া। উঠিয়াছিল—এক সমাজ, আর এক বিশ্ব।

ব্যক্তি

<table>
<thead>
<tr>
<th>সমাজ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>বিশ্বমানব</td>
</tr>
</tbody>
</table>

এই ত্রিপাদে আমাদের সামাজিক চিন্তা ও সমাজ-বিভিন্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহু ব্যক্তির সমাজ সমাজ। বহু সমাজের সমাজ বিশ্বমানব
বা মানবজগৎ। মাঝখানে যে বহু সমাজের সম্মেলনে ও সম্মিলনে এক একটা রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে ও নেশন প্রতিষ্ঠিত করে, এই কথাটা আমাদের প্রাচীন সামাজিক চিন্তাতে ধরা পড়ে নাই। আর পড়ে নাই বলিয়াই আমাদের সামাজিক জীবন যতটা ঘনিষ্কিত,
ষট্টা সতেজ সংহত হইয়া। উঠিয়াছিল, রাজ্যীয় জীবন বা পলিটিক্যাল লাইফ। তটটা সতেজ ও সংবৎসর হইয়া গড়িয়া উঠে নাই। সমাজের পরেই আমরা একেবারে বিশ্বাসনের সাধনা করিতে গিয়াছি।

ইহাই “ঝগড়াটিয়া হুলায়” মন্ত্রের অর্থ। এই ঝগড়াটিয়ার সঙ্গে গোস্বামন্ত্রিতায় চ—এই জন্মই অন্য অন্ধুত্তভাবে মিলিয়া গিয়াছিল। গো অর ব্রাহ্মণের ভারতের হিন্দুসমাজের মেরূদণ্ড ক্ষেত্র। গো অর ব্রাহ্মণের উপরে হিন্দুসমাজের ন্যাতন্ত্র ও বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠিত। গো মান্ত।

ইহার দ্বারা জগতের অহ্যাত সমাজের সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণব ও ও পার্থক্য নির্দিষ্ট হইল। অপর সমাজে গো-হত্যা বিদ্বঘন নহে।

হিন্দুর সমাজেই ইহা ব্রাহ্মণের এক পর্যায়ভূত। আর ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণের মূল্য নিদর্শন।

ব্রাহ্মণের উপরেই ব্রাহ্মণের মূল্য বস্ত। গোব্রাহ্মণছায়া অর্থে সমাজের হিত। সমাজের বৈষ্ণব রক্ষা, সমাজ জীবনের শুদ্ধতা ও স্বাতন্ত্র্যের বাচাইয়া রাখ।।

আর ইহার পরেই ঝগড়াটিয়া—বিশেষ কল্যাণাগত সাধন। হিন্দু এই চিন্তাধারাতে, হিন্দু এই সমাজ-বিজ্ঞানে সমাজ-তত্ত্বের মাঝখানে রাখি বা নেশন বলিয়া কোন তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে নাই। আর ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হিন্দুর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালগেও তার সামাজিক স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই।

বরং যেই হিন্দুর রাষ্ট্রলক্ষ্মী অপরের হাতে যাইয়া পড়িল, হিন্দু অমনি আরও দৃঢ়তর মূঢ়তে আপনার সমাজনিত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিল। রাষ্ট্রলক্ষ্মী গেছে যাক্ত না লক্ষ্মী ও চিরকালই চেকালা লক্ষ্মী ও চিরদিন এক ঘরে বাঁধা থাকেন না। রাষ্ট্রলক্ষ্মী গেছে যাক; সমাজটাকে বাচাইয়া রাখিতে পারিনেই হইল।

এইভাবে বাহিরে যতই পরাধীনতার শৃঙ্খল কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিল, হিন্দু ততই নিজের সমাজের বুকে প্রবেশ
বক্তিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

করিয়া। কঠোরতর আচার বিচারের বেড়া দিয়া। নিজস্ব ছুটিতে হইতে সরাইয়া। ও বাঁচাইয়া। রাজ্যবাস চেষ্টা। করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে এই সামাজিক আত্মাবাধ ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বলে বলীয়ান হইয়া, হিন্দু রাষ্ট্র সম্মুখে ক্রমে একেবারেই উদাসীন হইয়া পড়িল। এটি না হইলে মুসলমানের। এমনভাবে একরূপ অনেকটা নির্বিচারে এককাল ধরিয়া। হিন্দুর উপরে নিজেদের ব্যাখ্যাহীন প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিত না। আমাদের গভীর সামাজিক মমনবাদই বহুল পরিমাণে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য দায়ী।

(৪)

এই সামাজিক মমনবাদ বা social consciousness একটা অতি মহাব্যক্তিত্ব। এ বস্তু হারাইলে চলিবে না। আমাদের সাহায্যে যেমন ব্যক্তির পরে সমাজ, সমাজের পর একেবারেই বিশ্বমানে যাইয়া। পৌঁছিবার চেষ্টা। হইয়াছিল নেশন বা রাষ্ট্র যে একটা মাঝখানের ধাপে আছে, এদিকে 'আমরা ভাল করিয়া। লক্ষ্য করি নাই, যুগের প্রাণ তাই সাহায্য করিতে পারিয়া।

ব্যক্তি

<table>
<thead>
<tr>
<th>রাষ্ট্র</th>
<th>নেশন</th>
</tr>
</thead>
</table>

বিশ্বমানব

এই তিন ধাপেই সমাজ-বিজ্ঞানটা গড়িয়া। তুলিবার চেষ্টা। হইয়াছে। ব্যক্তির পরে যে একটা সামাজিক জীবনের সোপান আছে, ব্যক্তিগত individual consciousness’এর পরে যে একটা social consciousness আছে, এই কথাটা যুগের তুলিয়া গিয়াছে। আর তুলিবার কারণ এই যে যুগের বহুদিন হইতে এই social consciousness’এর সঙ্গে—সামাজিক আত্ম-
বোঝা রাষ্ট্রীয় আচরণের সঙ্গে মিশিয়া আছে। যুরোপে আমাদের দেশের মত বহু সমাজের সমাবেশ হয় নাই। সমগ্র যুরোপে ফলতঃ একটা মাত্র সমাজই গড়্ডিয়া উঠিয়াছে। যুরোপের লোকেরা সকলেই এক সমাজের অন্তর্গত। তাহাদের ধর্ম এক, রীতিনীতি এক, ক্রিয়াপদ্ধতি এক,—সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপারই মোটের উপরে এক নিয়মে শাসিত, এক ছাঁটে চালাই করা। সামাজিক জীবন সমস্তে ইংরাজে ফরাসী, অঁটিয়ানে ও জার্মানে, ইতালীয়ে ও স্পেনীয়ে কোন বিরোধ নাই, বিশেষ প্রভেদই আছে কি না সন্দেহ। এইজায় ইহাদের মধ্যে স্বাভাবে আদানপ্রদান চলে। যুরোপের এক দেশের লোক অন্য দেশে যাইতে। স্বল্পবিস্তরে সেই দেশের সমাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে। কেবলই ইহুদীরা যুরোপে আপনাদের সামাজিক স্বাতসরটা বথাসাগর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাও আর পারিতে না। যুরোপে একটা সমাজই গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বতরাং যুরোপে ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বাতসর ও বৈশিষ্ট্যাতঃ রাষ্ট্রীয় জীবনের আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠিয়ার ও আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। এই জন্য যুরোপের সামাজিক অভিব্যক্তি বাণ্ডি হইতে রাষ্ট্র হইতে বিশ্বাসবদ্ধ বাইয়া। পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সামাজিক অভিব্যক্তি পূর্ণ হয় নাই। যুরোপের সামাজিক অভিব্যক্তি পূর্ণ নহে। আমার সমাজকে আকডাইয়া ভরিয়া রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে হারাইয়াছি। যুরোপ একবারে ব্যক্তি-সাতন্ত্রের উপরে রাষ্ট্র-সাতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিতে যাইতে উচ্ছুললতা ও অরাজকতার পথে ছুটিয়া যাইতেছে; এবং স্যায়েলিজম, সিঝুয়েলিজম, বল-শেরিফেজম প্রভৃতি মুঠিয়ে প্রয়োগ করিয়া অসংখ্য ও সাংঘাতিক সমাজ-সম্বন্ধীয় মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছে।
বক্ষিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রনীতির জম্ম হয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রীয় অভ্যাসগুলোর চেষ্টা হইতে। এই চেষ্টার উৎপত্তি হয় রাষ্ট্রের প্রতি মনস্বিন্ন হইতে। পুরাকালে রাষ্ট্র ছিল রাজাদিগের; স্থতৃঙ্গ রাষ্ট্রের প্রতি সত্য মনস্বিন্ন কেবল রাষ্ট্রপতিদিগের অন্তরেই জমিত। সাধারণ প্রকৃতিপূর্ণের অন্ত্রে রাজভক্তির অবলম্বন কিছুই হয়ত হইত এবং এই রাজভক্তির আশ্রয় ইহাদের অপরোক্ষভাবে তাহাদের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তকা মনস্বিন্ন জমিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি সত্য মনস্বিন্ন প্রজাদিগের মধ্যে সেকালে ছিল না! সাধারণ লোকে নিজেদের সমাজটাকেই প্রত্যক্ষভাবে আপনার বলিয়া ভাবিত। বিভিন্ন সমাজের সমবায়ে আধুনিককালে যে সকল বিচিত্র রাষ্ট্র গড়ে উঠিয়াছে, তাহা তখনও গড়িয়া। উঠে নাই। এই জন্ত সেকালে আমরা আজকাল যাহাকে দেশাত্মোবধ কহিতে আরস্ত করিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া জন্মে নাই। দেশ আমার, আমি দেশের,—

দেশের জনসমষ্টির কল্যাণ ও অকল্যাণের উপরে আমার নিজের এবং আমার স্বজনবর্গের কল্যাণ ও অকল্যাণের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, এই ধারণা হইতেই সত্য দেশাত্মোবধের জম্ম হয়। আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় সাধনাতে এই দেশাত্মোবধ জাগানই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রথম কর্ম ছিল। রামনোহন হইতে আরস্ত করি। বাংলার নবযুগের সকল চিন্তারস্তকেই আপন আপন ভাবে নিজ নিজ অধিকারে এই কাজটি করিয়াছেন। বক্ষিম-সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই দেশাত্মোবধের শ্রেণী জাগিয়া আছে। এই ভিতরের উপরেই বক্ষিম-সাহিত্যে একটা সমীচীন রাষ্ট্রনীতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমি ও অন্যান্য—আমাদের প্রাচীন দর্শনের পরিভাষায় 'অহং এবং ইতি'র—সংবর্ধ এবং বিরোধ হইতেই আঞ্জান জম্মে। অপরের সমুদ্রীন না হইলে আমি যে আমি, এই জ্ঞানের উদয় ২৭
হয় না। পরক্ষণ রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখীন না হইলে রাষ্ট্রীয় আত্মবোধ জনিতে পারে না। পরক্ষণ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বিরোধ এবং প্রতিযোগিতা বাধিতেই নিজের রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার এবং নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বত্ব স্বত্বের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রদায়ের চেষ্টা হইতেই রাষ্ট্রীনির্ভর বা politics’এর জন্ম হয়। এই হাতেই আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সাম, দান, দও, ভেদ-এই চতুরঙ্গ নীতির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ক্রমে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া। বসেলাম, রাষ্ট্রকর্ম, রাষ্ট্র শাসনের ভার অপরের হাতে যাইয়া পড়িল, তখন হইতে আমাদিগের মধ্যে রাষ্ট্রনির্ভর চেষ্টাও লোপ পাইল। রাষ্ট্রসেবার অধিকার হইতে বিক্ষিত হইয়া আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি মমহৃদ্যিও ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। প্রেম বাড়ে সেবায়। প্রেমপাত্রের সেবা করিবার অধিকার ও অবসর নষ্ট হইলে প্রেমও অনশনে তরল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খল-সেবার অবসর সম্প্রায় হইলে শৃঙ্খলের প্রতি মমহৃদ্যিও কঠিন হইয়া যায়।

এইরূপে আমাদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে দেশাত্মবোধ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানের শাসনাধীনে কিয়ৎপরিমাণে আমরা রাষ্ট্রের শাসন সংরক্ষণ কর্তৃে নিজেদের শক্তিসাধ্য প্রয়োগ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে আমাদের মধ্যে কতকটা দেশাত্মবোধও ছিল। যাহারা মুসলমানের শক্তির প্রতিযোগি করিবার চেষ্টা করেন, তাহাদের মধ্যে এই বিরোধের ফলে একটা প্রাত্র দেশাত্মবোধে জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহা জাগে নাই। ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া। ক্রমে ক্রমে দেশের শাসন সংরক্ষণের দায় হইতে আমরা একবারে নিঃসন্দের পাইলাম। এই কারণে একদিক দিয়া আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি মমহৃদ্যির অনুগীণের অবসর একবারেই নষ্ট হইয়া।
বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

গেল। এই অবস্থায় ইংরেজ যদি আপনার শাসন সৌকার্য্যার্থে আমাদিগের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচার না করিত তাহ। হইলে যে ভাবে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রীয় জীবন একটা উদার গণতন্ত্র স্বাধীনতার আদর্শকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহ। আদে২ সম্ভব হইত না।

আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গ্রেন। আসে, প্রথমে ইংরেজী সাহিত্য ও যুরোপের ইতিহাস হইতে। আমাদের প্রাচীন সাধনাতে পারমাণ্ড মুক্তির কথা বিষ্ণু আছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার গ্রেন। একেবারে নাই বলিয়াও চলে।

Rule Britannia, rule the waves
Britons shall never be slaves.

এই জাতীয় কথা। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজী শিক্ষাই, আমাদের অন্তরে এই স্বাধীনতার গ্রেন। জাগাইয়া দেয়। ইংরাজে দেখিয়াই রংপুর গাহিয়াছিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঙালিতে চাই রে
দাসত শৃংখল কেবো সাধে পরে পায় রে?

ইংরাজী সাহিত্যের ও ইতিহাসের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই হেমচন্দ্রের শিখা গড়িয়া উঠিয়াছিল,

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
ভারত শুধুই যুগান্তে রয়।

বঙ্কিম সাহিত্যের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনীতির গ্রেনাৰ্থে ইংরাজী সাহিত্য ও যুরোপের ইতিহাস হইতেই প্রথমে আসিয়াছিল।
নবযুগের বাংলা

(৬)

কিন্তু আমাদের প্রথম যুগের স্বাধীনতার বাসনা করলনার অভিযোগ রয়েছিল। সত্যি স্বাধীনতার বাসনা জাগে তীর্থ বদনের বেদনা হইতে। তখনও ইংরেজ শাসনকে অপর একটি সাংঘাতিক বদন প্রদান করিতে আরস্তু করি নাই। ইংরাজের সঙ্গে তখনও আমাদের বিরোধার্থ পাকিয়া উঠে নাই। বরং ইংরাজের অধীনে আমরা নাম। দিক দিয়া যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে ছিলাম, পূর্বে এ দেশের লোকে কোনও দিন সে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় নাই, এরূপ ধারণা আমাদের তখন ছিল। রাজার ত কথাই নাই, সমাজও চিরদিন ব্যক্তি-স্বতন্ত্রের উপরে উচ্চতর হইয়া থাকিত। হুমকির ইংরাজ শাসনধীরে প্রথম যুগে আমরা যে পরিমাণ ব্যক্তি-স্বাত্বর সত্য ভোগ করিতে পাইয়াছিলাম, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোনও দিন তাহা পাইয়াছিলেন কি না সদেহ। অতএব তখনও আমাদের সত্য বদন-বেদনা জাগে নাই। সাহিত্যে স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন শুনিয়া এবং ইতিহাসে তাহার মহিনী মৃতিৰ্দেখিয়াই আমরা ইহার জন্য লোভো হইয়া উঠিয়াছিলাম।

বাজ রে শিঙ্গ। বাজ্ এই রবে সবাই জাগত এ বিপুল ভবে সবাই জাগত মানের গৌরবে ভারত শুধুই যুবকে রয়ে হেমচন্দ্রের এই উদ্দীপনা বিদেশের সাহিত্য ও ইতিহাস হইতেই আসিয়াছিল। প্রথমযুগের রাজ্যীয় সাধন। এই কল্পিত স্বাধীনতার বাসনায় গড়িয়া উঠে। তখনও আমাদের অন্তরে ইংরাজ বিশ্বেষ প্রদান করিয়া উঠে নাই। ইংরাজের সঙ্গে রেমারঞ্জিটা তীত্র হয় নাই। তখনও ইংরাজ রাজকর্তৃচারীর। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর
পিঠে হাত বলাইতেন। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাধনা ও চরিত্রের প্রতি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ার রাষ্ট্রীয় সাহিত্যের বাসনাও তাদের অন্তরে জাগিয়াছিল। এই সাহিত্যের আকাঙ্খার অন্তরালে কোনও প্রকারের পরামর্শ বিষয় ছিল না। আমাদের প্রথম যুগের সাহিত্যের আদর্শ অনেকটা বিশ্বজগুনীন ছিল। জগত্তা সাধীন হউক, জগতের সকল লোকেই মানের গোরে বড় হইয়া উঠুক, পৃথিবী সাধীনতা এবং সাহচর্যের লোকের মুখে হইয়া শক্তিতে, সম্পদে, শ্রুত, শ্রবণ, সর্বোত্তমতা-ভাবে জগতের সমক্ষ হইয়া। উঠুক, ধর্মায় ধর্মরাজ্য অবিভূত হউক ইহাই তখনকার সাহিত্যের সাধীনতার প্রাণের বাসন। ছিল। এইভাবে আমাদের প্রথমযুগের রাষ্ট্রীয় সাহিত্যের আহ্বানে পাশ্চাত্যের ইংরাজের বা অন্য কোনও জাতির প্রতি কোনও প্রকারের বিদ্বেষের ভাব লুকাইয়া থাকে নাই।

তখন আমরা ইংরাজকে কর্মকা ভক্ষ করিতাম আর অতি ভয়ে করিতাম। এইভাবে প্রথমযুগের বাংলা সাহিত্যে ইংরাজ-শাসনের উপরে কোনও তীব্র আক্রমণ দেখি যায় না। অথচ পরাধীনতার প্রতি একটা গভীর বিদ্বেষ জাগিতে হয়, এইভাবে প্রথম-যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসনের চির আক্রিয়। রাজহাজী মুসলমানদের অন্তরে নূতন সাহিত্যের গোলগা জাগাইবার চেষ্টা করা হয়। রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসের আশ্রয়ে এই কাজ করেন। হেমচন্দ্র মুসলমান শাসনাধীনে ভারতবর্ষের ইতিহাসেই তার ‘ভারত সঙ্গীতের ভূমিকা রচনা করেন। সত্যজিৎ ঠাকুর মুসলমান শাসনাধীনে প্রশিক্ষিত ভারতের কিন্তু হিন্দু বীরের মুখে “গাও ভারতের জয়” এই গাথা স্থাপন করেন। ইহারা কেহই খোলাখুলিভাবে ইংরাজশাসনকে আক্রমণ করেন নাই।
অমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনার প্রবর্তিত্ত্বস্বরূপ অত্যাচারী মুসলমান রাজশাসনকেই প্রতীকরুপে গৃহীত হইয়াছিল।

(৭)

সেকালে আমার। রণ্ডাবিভিন্নের অনুশীলন করিতে বাইয়া এককালে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর যে বিবাদ ছিল তাহার মূর্তিকেই আশ্রয় করিয়াছিলাম। মুসলমানকে খাটে। দেখিলে আমাদের স্বাধীনতাভিমান পরিতৃপ্ত হইত। বক্ষিমচন্দ্ৰও তার উপন্তাসে এই ভাবেই আমাদের স্বাধীনতাভিমানকে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু মুসলমানের বিরোধের আধ্যায়েই তুটোস্ফনন্দিনীর অধ্যায়িকা গড়িয়া উঠে। কতলু খার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে যাইয়া অসহয়। হিন্দু বিধবা বিমল। তাহার বুকে ছুরি মারিয়া সহস্র প্রহরী-বেষ্টিত মুসলমান শিবির হইতে নির্বিশেষ সরিয়া পড়িলেন;—এই দৃষ্টে বাঙ্গালী হিন্দু স্বাধীন গৌরবব ভারিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালী রপণীর এই বীর্যা, এই নীতকুশলতা, ধর্মের উপরে ভরসা ও আপনার রুদ্ধি ও বাহুর প্রতি আশ্র দেখিয। বাঙ্গালীর আত্মরক্ষা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তারপর জগৎসিংহ এবং ওদান। উভয়েই বীরপুরুষ, উভয়ের মধ্যেই অনেক সদ্ভূমি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বক্ষিমচন্দ্র জগৎসিংহকেই বড় করিয়া ধরিয়াছেন। সকলকে আয়েরা এবং তিলোত্তমা—দুইই অস্পর্ব যুদ্ধ। কিন্তু তিলোত্তমা হিন্দু মহিলা, আয়েরা যুব দুখিত। তিলোত্তমাতে হিন্দু নারীদের ছবি অস্পর্ব ভৈরবে যুটিয়া উঠিয়াছে। আয়েরাতেও রমণী চরিত্রের মাধুর্য এবং শক্তিক অল্প ফুটে নাই। তখাপ বক্ষিমচন্দ্র তিলোত্তমকেই আয়েরা অপেক্ষা বড় করিয়া তুলুন আর নাই তুলুন বেশী মিলি করিয়া আকিয়াছেন। ইহাতে আমাদের নবজাগ্রত স্বাধীনতাভিমানে নূতন শক্তির সংস্কার হইয়াছিল।
বক্ষিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

যেমন স্বর্গীয়নন্দনীতে সেইসময় কপালকুলাতে এবং মূলধনীতেও বক্ষি হিন্দু এবং মুসলমানকে পাশাপাশি দাড় করাইয়াছেন, এবং সর্বমূল্য হিন্দুর তুলনায় মুসলমানকে খাটে করিয়া অংকিয়াছেন।

মুসলমানকে খাটে করা বক্ষি বক্ষির উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলার বক্ষি সাহিত্যের আশ্রয় স্বদেশগ্রীতির অনুশীল করিতেন তাহাদের অস্ত্রেও মুসলমানের প্রতি কোন বিদ্ধে ভাব ছিল না। লেখক এবং পাঠক—উভয় পক্ষই মুসলমান শাসনের বিরোধের দ্বৃতি জাগাইয়া বক্ষি মান কালের স্বাধীনতার সংগ্রামের আওতায় করিতেছিলেন। তাহা বলিতে কি, ভিতর ভিতর এই সকল চিত্র মুসলমান বলিতে আমরা মুসলমানকে বুঝি নাই, যে স্বাধীনতার পরিপদ্ধতি তাহাকেই বুঝিতাম। মুসলমান এই সকল সাহিত্যে একটা ভাবের প্রতীকমান্ত হইয়াছিলেন। এই কথাটা না বুঝিলে বক্ষির সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতির মর্মকথাটা ধরিতে পারা যাইবে না।

(৮)

পূর্বেই কহিয়াছি, আমার সাফতাকারেই আত্মার আনুভূতিতে জন্ম। আমি যাহো নই, তাহার সম্ভাবনা হইয়াই, আমি যে কি ইহা প্রথমে বুঝিতে পারি। অন্যদিকে আশ্রয় ব্যতীত আত্মাচিত্তের জাগ্রত হয় না। দেশাত্মাবধি বা সামাজিক আত্মচিত্তে বা ইংরেজিতে যাহাকে আমরা ‘শাশ্বত সেলফ-কন্সায়নেশন’ (National self-consciousness) বলিয়া থাকি, তাহার সম্ভাবনেও এই কথাটা খাটে। অত্য সমাজের বা অপর ‘নেশনের’ সঙ্গে সংযোগ এবং বিরোধ হইতেই এই দেশাত্মাবধির বা ব্যাখ্যালাল কন্সায়নেশন-এর জন্ম হয়। এই সংযোগ ও বিরোধ যত তীব্র হয়, সেই পরিমাণে এই দেশাত্মাবধির প্রবল হইয়া উঠে।
বর্তমান যুগের প্রথমে আমাদের এই দেশাভ্যাস বা রাজ্যালু কন্দাসনেস্থিক বস্তুত্ত্ব ছিল না। কারণ সেই সময়ে ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের কেনও প্রাত্যক্ষ বিরোধ ভালু করিয়া বাধে নাই। ইংরাজ তখন দেশের রাজ্যাত্মকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সত্য; কিন্তু এই ইংরাজকে, অন্ততঃ এই বাংলা দেশে, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানরাই ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। ইংরাজ শত্রুবেশে নহে, মিত্র বেশী প্রথমে বাঙ্গালী শাসনতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছিল। এইজন্য গোড়া হইতেই এই নূতন ইংরাজ-রাজ সম্বন্ধে বাঙালীর অন্তর্বে একটা অন্তর্বুদ্ধি বা মমতবুদ্ধি জন্মিয়াছিল।

এইজন্য বাঙালী, কি হিন্দু কি মুসলমান, সাধারণভাবে কেহই ১৮৫৭ ইংরাজের সিপাহী যুদ্ধে ইংরাজের বিপক্ষে যান নাই। বিহারে, প্রায়াগে, অযোধ্যায় বা আগ্রা-দিল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের অন্তরে ইংরাজ সম্বন্ধে এই অন্তর্বুদ্ধি ছিল না। সে দেশে ইংরাজ বিজেতা— দেশের লোক বিজেত। সে দেশের লোকে ইংরাজকে ডাকিয়া তাহার ললাটে নিজের হাতে রাজ্যাত্ত্ব আকার দেন নাই। বিজেতের মর্যাদাতী বেদনা উঠাতে অন্তরে জাগিয়া ছিল। এই জন্যই সিপাহী-যুদ্ধের ভেরী বাজিয়া উঠিলে সে অঞ্চলের বহুলোকে সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙালী কেন করে নাই, একথাটা আজ পর্যন্ত কেহ ভাল করিয়া বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। কেবল বক্ষমচ্ছন্দ তাহার 'আনন্দ-মঠে' এই কথাটা বিশেষ করিয়া চেনা করিয়াছেন। তাহার আলোচনা অধ্যাপনে করিত। এখানে কেবল এই কথায় বলিতে চাই যে, আমাদের আধুনিক দেশাভ্যাস বা রাজ্যালু সেলফফ-কন্দাসনেস ইংরাজের সঙ্গে কেনও প্রাকারের প্রাত্যক্ষ বিরোধেকে আশ্রয় করে প্রথমে জাগে নাই।
(৯)
এই আত্মচৈতন্য জাগিরা উঠে, ইংরেজের সঙ্গে ঝাড়া করিয়া নহে, কিন্তু ইংরেজের সাহিত্য ও যুগের ইতিহাস পড়িয়া। আমাদের প্রথম যুগের দেশাত্যাবধ এই কারণে অনেকটা কার্যনিষ্ঠ ছিল। দাম্পত্য-সম্বন্ধ প্রতিরক্ষার পূর্বে, যৌবনের প্রথম উষ্মেশে, কোনও প্রকারের প্রাক্ত অংশের বা বিষয় ব্যতিরেকেও, অনেক সময় কেবল নাটক উপন্যাস পড়িয়া। যুবক যুবতীর অন্তরে একরূপ আদরের বা মাধুর্যের উদ্ভাদনা জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় নাটিকে আদরের অভিনয়ে জ্যোতির্বিদ্যমান ঠাকুর মহাশয় “এমন কর্ম্ম্ম্ম্ম আর করব না”-নামক প্রাচীনতে বিষয় বিষয়কালিনী ছিলোন। বইখানির নাম এখন কেহ করেন না। আঞ্জিলিকার বাঙালী তার কোন খোঁজ খবর রাখেন না ; কিন্তু ‘সেতায়ব’ (satire) হিসাবে এখনো বাঙালী ভাষায় এক অপূর্ব শ্রেষ্ঠ। আর সেকালের সমাজচিত্র ও নবাবিকেশ্বর যুবকযুবতীর মনোগতির ছবি হিসাবে এখনো এবং “যুক্তিকিত জলমাগ”-বাঙালী সাহিত্যের দুর্ধারি অমূল্য রঙ্গ। “এমন কর্ম্ম্ম্ম্ম আর করব না”-তে একটা কল্পিত আদরের অভিনয়ের অন্তরূপ ছবি অক্ষিত হইয়াছে। আমাদের প্রথম যুগের দেশাত্যাবধ বা সাদাশিকতাতেও অনেকটা এই নাটিকে ধরণের ছিল। এই জ্যাম্ভ রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, এমন কি বঙ্গমন্দ্র পর্যায়ে মুসলমান অধিকারের সময়ে হিন্দু মুসলমানে যে সকল বিরোধ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিতে অবলম্বন করিয়া, সেই বিরোধের ছবি আকৃতি আমাদের নূতন সাজাত্যাগ্নিয়ে উদ্ধু করিতে বাধ্য হন।

(১০)
ইংরেজ তখন দেশের রাজা হইয়া বসিয়াছে বটে, কিন্তু এই নূতন

২৮
রাজশাহীর সঙ্গে দেশের লোকের তখনও তেমন বিরোধ বাধে নাই। ইহার প্রধান কারণ—ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন। এই বাংলা দেশে তখন বাংলার সমাজের শীর্ষস্থলে ছিলেন, বাংলার দেশের চিন্তা, ভাব ও কর্মকে পরিচালিত করিতেছিলেন, তাহারা প্রায় সকলেই সর্বাধিক এই নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সাবধানভাবে বাংলার ইংরাজি পড়েন নাই, তাহারা পরাক্রমের ইহার প্রেরণা অন্তারে অন্তারে অনুভব করিতেছিলেন। কহিয়াছি যে, বাঙালী চিন্দিনেই বান্ধ-বান্ধের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লক্ষ্যটা। জীবনবাহনের সময় হইতেই বাঙালী চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান অধিকারে বাঙালীর এই চিন্তন সাধনার উপরে আঘাত পড়িয়াছিল। কিন্তু এ আঘাততে বাঙালী সহিয়াছিল। সমাজের চারিদিকে লক্ষ্যের গম্ভীর আঁকিয়া নে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইহার অসাধা না হউক, দুঃখ্যান্ত হইয়া উঠিল। মুসলমান এই গণ্ডীও ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জোর করিয়া দলে দলে লোকের মুসলমান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারই ফলে আজ বাংলা দেশের এগারো দশী লোক মুসলমান-রাজনীতি হইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ মুসলমানের শক্তি যখন কমিতে আরম্ভ করিল, মুসলমান যখন রাজার ধনপ্রাপ্ত রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল, প্রবলেরা দুর্বলদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল, চারিদিকে অধিকতর অসাধৃত। উঠিল, সমাজগ্রন্থি এই ভীষণ অধিকতার মূখে ছির-বিছির হইতে লাগিল, তখন বাঙালীর বহুলকের সাধনের ও সাধনার ধন এই ব্যক্তিগতত্ব ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা একেবারেই অসাধৃত। হইয়া পড়িল। আর তখনই বাঙালীর এই অধিকতা হইতে আজ্ঞা- করা লোকে, ইংরাজের অন্ধ্রণ কবিয়া আমাল। ইহাই বক্সমচন্দ্রের
বঙ্গম সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি

আধুনিক বাংলার ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যাখ্যা। তাঁর সকল উপন্যাস, বিশেষতঃ আনন্দ-মঠে, সীতারামে ও দেবী-চৌধুরাণীতে নান দিক দিয়া। এই কথাটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(১১)

ইংরাজ দেশের শাসনদণ্ড লইয়া সরদারপ্রথমেই শান্তি স্থাপন করিল। আইন-আদালতের প্রতিষ্ঠা করিয়া। সমাজকে পশুশক্তির উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্বিপদে, আপনার ইচ্ছামত, সংবিধায় জীবনযাত্রা। নির্দোহ করিবার পথ খোলাস। করিয়া দিল। ইহার ফলে দেশের জনসাধারণে অভয লাভ করিয়া, প্রাণ খুলিয়া।

“কোনওমতো বাহাদুরের” জয় ঘোষণা করিতে আরসা করিল। দেশের জনসাধারণের এরূপ সন্নভাব পঞ্চাশ ঘট বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদিকে ইংরাজি শিক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাকে অধিকার করিয়াছিল, অন্যদিকে ইংরাজের শাসন জনসাধারণের চিন্তাকে অধিকার করিয়াছিল। এ অবস্থায় ইংরাজকে প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠিত করিয়া। দেশের নৃতন দেশায়বোধের সাধন করা তখন সম্ভব ছিল না।

যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, তাহারা ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পের অমুকীলম করিয়া, ইংরাজের সভ্যতার ও সাহিত্য আদর্শকে নিজেদের অমরের বর্ণ করিয়া। লইয়াছিলেন। এই আদর্শকে দেশের মধ্যে গড়ীয়া তোলাই তাহার সাহিত্রিকতার সাধ্য হইয়াছিল। সুভরাং ইংরাজ-চরিত্রের প্রতি আন্দাবন্ধ ইংরাজের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি অমুরাগবশত, বাঙালী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইংরাজকে সাধারণ
বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার উচ্চে সাধনের প্রচেষ্টার সমর্থন করে নাই।

বঙ্গদীপেও ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধী ভাল করিয়া বাধে নাই। একটু আরও সংখ্য উপস্থিত হইয়াছে মাত্র, সংগ্রামের ভীরু তখনও বাজিয়া উঠে নাই। ইংরাজের শাসন তখন পর্যন্ত কঠোর ও পরস্পর ভাব ধারণ করে নাই। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে সঞ্জাতি-পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু একবারে ফুটিয়া উঠে নাই। সাধারণ ভাবে ইংরাজের শাসন তখনও আমাদের চিন্তার বা কর্ষার স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করে নাই।

স্থতরাং ইংরাজকে প্রতিপক্ষ করিয়া সে সময়ে আমাদের দেশাত্বাধিকার বা নাশ্তার কনশালী জাগরণ সম্ভব ছিল না, বলিলেও চলে। অথচ অনাত্মার সমুরুধী না হইলে আমাদের চৈতন্য জগান নয়। জাতির সমষ্টিগত অন্তৰ্ত্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া হইলে একটা পরজাতিকে প্রতিপক্ষে জাতির সমুখে দাঁড় করান আবশ্যক ছিল। নায়ক-নায়কের প্রেম ফুটিয়া যায় যেমন কাব্যে ও নটকে একজন প্রতি নায়ক বা প্রতি নায়কের স্ত্রী করিতে হয়, সেইরূপ সঞ্জাতি-বাণ্ডলিতে জাগাইতে হইলে, একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতে পরজাতির শক্তির সঙ্গে বিরোধীর ধ্যান ও অপূর্বীত করা আবশ্যক হয়। ইতিহাসের রঙ্গমঙ্গলই কোন জাতির বা নেশনর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বি জাতির বা নেশনর সাক্ষাৎকার, সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত হইয়া। থাকে। আমাদের তখনকার ইতিহাসে ইংরাজের সঙ্গে এরূপ কোনও বিরোধ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই। ফলতঃ আমাদের নূতন স্বাধিকারের প্রেরণা আসে, ইংরাজের সাহিত্যের ও মুরারের ইতিহাসের আলোচনা হইতে। ইহার ভিতরে ভাবকভাব প্রবল ছিল, বস্ত্রপ্রশস্ত ছিল না বলিলেও হয়। স্থতরাং এই সাহিত্যিক ও কাল্পনিক
বস্তিতে রাষ্ট্রনীতি 223

সাহিত্যিক অনুশীলনের জন্য, আমাদিগকে বন্দনার অশ্রুর লইতে হইয়াছিল। এই কারণেই তখন মুসলমান অধিকারের ভারতবর্ষের ইতিহাসের গুটি হইতে এই নতুন সাহিত্যিক অশ্রু অস্তিত্ব সংগ্রহ করিয়া, সেকালে দেশে হিন্দু মুসলমানে যে বিরোধ ও প্রতি-
যোগত ছিল, তাহাই ছবি আঁকিয়া আমাদিগকে এই দেশপ্রিয়তার
অনুশীলন করিতে হইয়াছিল। এই কথাটা মনে রাখিয়াই বস্তিতের সাহিত্যের সাহিত্যিক অনুশীলন ও রাষ্ট্রনীতির আদেশের আলোচনা করিতে হইবে। এই কথাটার ভূমিকা গেলে, বস্তিতের রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি যে কি ছিল, ইহার সন্ধান পাওয়া অসাধ্য হইবে।

( ২২ )

পৃথিবীর বর্ষ বর্ষে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের বিরোধী পাইয়া উঠে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে, ইংরেজ বিশেষের, অথবা এদেশের প্রান্তী ইংরেজ সমাজের অংশ বিশেষের সঙ্গে রেখারেখি বাধিতেছিল বটে; কিন্তু ইহাতে সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতি আমাদের অন্তরে কোন প্রকারের তীব্র বিরোধ জন্মে যাই নাই। ইংরেজ তখনও আমাদের বাঙালিদের সাহিত্যকে দীক্ষিত তাহার শক্তি হয় নাই। ইংরেজ তখনও আমাদের বাঙালিদের নব্যায়িক সমাজের দীক্ষিত হইয়াছিল। আর তখন ইংরাজনীয় বাঙালীদের মধ্যে নতুন দেশপ্রিয়তার ভাব অবদান ছিল, জনসাধারণের মধ্যে তাহা সনাক্ত হইয়া পড়ে নাই। তাহার তখন দেশের ডাক শোনেন নাই। দেশ-
প্রিয়তা যে কি অপূর্ব উন্মাদকারিতা বস্তু, এ জ্ঞান তখনও তাহাদের জন্য নাই, তখন ইহার সমান পর্যায় তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া নাই। দেশের জনসাধারণের মূল শ্রীলঙ্কা, ভাবনা এবং কর্ম লোকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিন্তু সামাজিক জীবনের গুণী ছাড়াইয়া যায় নাই। ইংরাজনীয় ধরে ইংরাজি পড়িয়া, ইংরেজের নিকট হইতে এই নতুন
দেশের দীর্ঘ লম্ব করিয়াছিলেন। তাহারা তখন বাস্তবিকই ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের ও যুক্তির সাধন। ও সত্যতার প্রতি অন্ত্য অল্পালু ও অনুরক্ত ছিলেন। এই কারণে সেকালে ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা জাগাই। সদেশের প্রেমের উদ্দোপন। করা সম্ভব ছিল 

না। অতঃপর পর্যায়ের প্রতিপক্ষীকর আশ্রম ব্যতিরেক সজ্জিত প্রেমের উদ্দোপন। ও অনুশীলনও সম্ভব নহে। এই জন্যই আমাদের 

প্রথম যুগের দেশচর্চার আচার্যের মুসলমান অধিকারের ভারতবর্ষের 

ইতিহাসের কথা তুলিয়া, মুসলমানকে এই স্বদেশের সাধনে 

প্রতিনিধিরূপে দাঁড় করাইয়া, এই নতুন স্বদেশপ্রেমকে জাগাইতে 

চেষ্টা করেন। বঙ্গমধ্যেও তাহাই করিতে হয়। কিন্তু ইহার 

অন্তরালে বঙ্গচন্দ্রের অন্তরে কোনও মুসলমান বিদ্ধে ছিল না, 

পূর্বেই একথা কহিয়াছি।

(১৩)

আর ছিল না। এই জন্য নে, বঙ্গমধ্যের স্বদেশপ্রেম হীন ও 

হেয় পলিটিক্স ছিল না। পর্যায়ের-বিদ্ধের উপরে তাহার 

স্বজাতিপ্রেমের আদর্শ গড়াই। উঠ নাই। বঙ্গমধ্যের দেশপ্রেম 

তাহার ঈশ্বর-ভক্তির অক্ষরত ছিল। তাহার দেশ-সেবা ধর্মের 

একটা মূর্ত আঞ্চ ছিল। বঙ্গমধ্যে যে ধর্মের সাধন। ও প্রচার 

করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে তিনি অনুশীলন ধর্মে কহিয়াছেন। বঙ্গমধ্যের 

হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে, 

হিন্দুধর্মেতে এই উদার ও বিশ্বজনীন অনুশীলন ধর্মে ততস্ত। পরিমাণে 

কৃত্যাণ্ড উঠিয়াছে, জগতের আর কোনও ধর্মে ততস্ত। কৃত্যাণ্ড উঠিয়া 

নাই। মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনী- 

রুপ্ত-সম্পর্কিত যে সকল শক্তি ও করণ বা যশ্চ আছে, তৎসমুদায়ের
বঙ্গম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

যথাযোগ্য পরিকৃতি দ্বারা এই অনুশীলন-ধর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এ সকল মানবীয় বৃত্তির প্রায় সকলগুলিই সম্পূর্ণ সমাজের বিভিন্ন সমক্ষের অপেক্ষা রাখে। এ সকলের যথাযোগ্য অনুশীলন, বিকাশ এবং সার্থকতা সম্পদন সমাজ-সাপেক্ষ। এই অনুশীলন ধর্ম প্রচলিত অর্থে সম্যাস ধর্ম নহে। সম্যাসী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের দায় এড়াইয়া, নিঃসঙ্গভাবে জীবন যাপন করিতে যাইলা, নিজের স্বাভাবিক রুপগুলিকে অনেক সময় চাপিয়া মারেন। বঙ্গমচন্দ্র কহিয়াছেনঃ—"বাহার। সন্নাসমধ্যে বলন্ধ্যা, ভাঙায়ের নিকটে অপত্যপ্রিয় ও দম্পতিগ্রীতি অতিশয় বৃদ্ধি। ভাঙায়। গীতাভ্যকেই পিঘাটী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি, অপত্যগ্রীতি ও দম্পতিপ্রিয়তা সমুচূর্ণ মাত্রায় পরম ধর্ম। এই পারিবারিক প্রতি জাগতিক গ্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।"

আর মানুষ প্রতির অনুশীলনে একবারে পারিবারিক গ্রীতি হইতে জাগতিক গ্রীতিতে যাইতে পারে না। প্রতির অভিযোগ ও সম্প্রদায়ের একটা ক্রম আছে। প্রথমে আত্মপ্রতি, তাপন আত্মপ্রতির সমক চরিতার্থতার জহিই অপত্যপ্রতি ও দম্পতিগ্রীতি—কিন্তু ইনি ভিন স্বজনগ্রীতির ভিতরে আরও কিছু আছে। যাহারা অপত্যস্বাস্থ্য, অপত্যপ্রতি নিজের সন্তানকে ছাড়াইয়া তাহারদেরও আশ্রয় করিতার যাহ। এইরূপ প্রতির সম্প্রদায় হইতে থাকিলে, কুটিলাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রতির পাত্র হয়েন। তারপর প্রতির সীমা আরও বিস্তৃত হইয়া সম্প্রদায়গণকে অধিকার করে। এইরূপে সম্প্রদায়ের অধিকার করিয়া সম্প্রদায় মানবমূল্যে যাইয়া প্রতি অর্পিত হয়। ইহাই প্রতির সাহাবিক অভিযোগের ক্রম। এই ক্রমের অনুসারেই প্রতি স্ফূরিত হইয়া আপনার চরম ও পরম সার্থকতালাভ করে। ইহাই বঙ্গমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মে প্রতির
প্রতিষ্ঠা। এই জ্ঞানই সংবিধানীতি বিশ্বাসিতির অনুশীলনের সোপানপুরে বন্ধনচাদ্রের ধর্মোপাধ্যায়ের অংশ হইয়াছিল। “অনুশীলন” এতে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বন্ধনচাদ্র এই সংবিধানীতি-ধর্মোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

( ১৪ )
মানুষের যাবতীয় বৃত্তির যথাযোগা বিকাশ-সাধনের নামই অনুশীলন। ইহাই সত্য মানব-ধর্ম। এই সকল বৃত্তির অনুশীলন সমাজ-সাপ্তাহ।

“সমাজের বাহিরে মানুষের কেবল পশুজীবি আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মানুষের ধর্মোপাধ্যায় নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন, কোন প্রকারের মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যাব্ধি হয় না। সমাজ-সংসে মানুষের ধর্ম ধর্ম এবং সমস্ত মানুষের সকল প্রকার মঙ্গল ধর্ম। 
যদি তাহাই হইল, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজরঞ্জ করিতে হয়।
অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষ। শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই জ্ঞানই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্ত বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষ। শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
সেই কারণেই সংস্থরক্ষার অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কেন না,
তামার পরিবারবর্গ সমাজের সামাজ অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশ- 
মাত্রকে পরিত্যাগ বিদেয়।”

সর্বভূতে সম্পূর্ণ যাদৃশ অনুস্থিত কর্ম, আত্মরক্ষা, সংস্থ রক্ষা 
এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুস্থিত কর্ম। উভয়েরই অনুশীলন 
করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পর বিরোধী হইবে, তখন কোন দিক গুরু তাহাই দেখিব। আত্মরক্ষা, সংস্থরক্ষা, দেশরক্ষ।—জগৎ 
রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেইদিক অবলম্বনীয়।”
"কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আস্তান্ত্র করিব, কিন্তু তার প্রতি প্রীতি প্রতিরোধ কেন হইব? জাগতিক প্রীতি এবং সর্বত্র সমাদর্শনের এমন তাপত্ত্ব নহে যে, তত্ত্ব মায়ার সাহিত হইব। ইহার তাপত্ত্ব এই যে—যখন সকলেই আমার তুলা, তখন আমি কখন কাহার অনিস্ত করিব না। কোন সম্ভারেও করিব না এবং কোন সম্ভারেও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধারণসারে ইট সাধন করিব, সাধারণসারে পর সমাজেরও তেমন ইট সাধন করিব। সাধারনসারে, কেন না কোন সমাজের অনিস্ত করিয়া অথ কোন সমাজের ইট সাধন করিব না। পর সমাজের অনিস্ত সাধন করিয়া আমার সমাজের ইট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিস্ত সাধন করিয়া কাহারও আপনার সমাজের ইট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমর্থন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশ-প্রীতির সামঞ্জস্য।"

বক্ষিমচন্দ্র কহিয়াছেন যে তাহার এই দেশপ্রীতি "ইউরোপীয় Patriotism নহে।" ইউরোপীয় যাহাকে দেশপ্রীতি বলিয়া সাধন করিতেছে, তাহা বক্ষিমচন্দ্রের মতে "একটা ঘোরতর পৌরোধার পাপ।" কারণ,—

"ইউরোপীয় Patriotism দশ্মের তত্পত্ত্ব এই যে, পর সমাজের কাছার। যে সমাজের প্রীতি করিব, কিন্তু অমূল্য সমস্ত জাতির সধিন্ত করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই চূর্ণ patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতির সকল পৃথিবীর হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর যেন ভারতবর্ষের কোপালে এরূপ দেশ-বাসলল ধ্রু না লিখেন।"

বক্ষিমচন্দ্রের দেশ-প্রীতি ঈশ্বরভক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আত্মরক্ষা। ২৯
ধর্ম, কেননা এই দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা ঈশ্বরের হস্ত, ঈশ্বরের দান; তাহাকে প্রীতি করিবার ও তাহার জগতের সেবা করিবার উপকরণ ও সহায়। সকলকে ধর্ম, কারণ সকলগণের শক্তি, সাহায্য ও সাহায্যের উপরে আমার নিজের রক্ষা ও নিজের ঈশ্বরদাতা শক্তি ও বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও সার্থকতা লাভ নিভর করে। সদৃশ-জগতের হিতের উপায়।

“পরম্পরে আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধ্যপিত হইয়া কেবল পরম্পরলোপ পালিত জাতির অধিকারভূক্ত হইলে, পথিবীর হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্বব্যাপীতের হিতের জন্য সকলেরই সদৃশেরক্ষণ করিবা।”

(১৫)

বক্তিমশীর সদৃশপ্রীতি ঈশ্বর-ভক্তির অঙ্গ ছিল। ভক্তি বলিতে তাতি মানুষের সমুদয় বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখতা বুঝিতেন। “মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরাভিমুখিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।” এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি, কেননা ঈশ্বর সর্বজগতে আছেন। এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্ম-প্রীতি, সকল-প্রীতি এবং সদৃশ-প্রীতির প্রকৃতপক্ষে কেনা বিরোধ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনতার এই সত্তা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ইহাই ভারতবর্ষায়দের সামাজিক ও ধর্ম-সমাজীয় অনন্তর কারণ।

“ভারতবর্ষায়দের ঈশ্বর ভক্তি ও সর্বলোকে সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু তাহারা দেশপ্রীতি এই সর্বলোকিক প্রীতিতে ভুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতি-বৃত্তির সামঞ্জস্যমূলক অনুশীলন নহে। দেশ-প্রীতি ও সর্বলোকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর
বঙ্কিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

সামগ্রী চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রেষণ জাতির আসন প্রাপ্ত করিবে।”

এই উদার ও বিশ্বজনীন স্বদেশ-প্রতিরূপ উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই বঙ্কিম-সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি একটা সমন্বয়ের পথ ধরিয়া চলিয়াছিল।

(২৬)

রামমোহনের নতুন বঙ্কিমচন্দ্র ও জীবনের সকল বিভাগে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইহা বিশেষভাবে দেখিয়াছি। বঙ্কিম সাহিত্যের রাষ্ট্রনীতিও এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করিয়াছে। বিরোধ থাকিলেও সমন্বয় করিতে হয়। ধর্মের এবং সমাজে আমাদিগের বর্তমান যুগে প্রাচীন এবং নবনে একট। তীব্র বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনুশীলন-ধর্মে, ভগবদগীতার ব্যাখ্যাতে এবং কৃষি-চরিত্রে এই বিরোধের একটা সমীচীন গৌরবাঃ কারিগার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ নবনেকে বর্জন করিতে চাহেন নাই। আবার নবনের লালসায় প্রাচীনের উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু প্রাচীনের সনাতন সত্য এবং সাধনার উপরে নবনের প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলিয়া। সময়ের একটা সময় এবং অবস্থা আছে। কেন বিরোধ পাকিয়া ন। উঠিলে সময়ের সময় উপস্থিত হয় না। দূরদূর মনীষীরা প্রযোজন হইলে পরিণামে এই সময় প্রতিষ্ঠার জন্যই, আদিতে বিরোধট। পাকিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বিরোধ যত পাকিয়া উঠে, ততই সময়ের প্রযোজন এবং অবস্থা উপস্থিত হয়। বাংলার বর্তমান যুগে বঙ্কিম-চন্দ্রের পূর্ববর্তী ধর্মে ও সমাজে প্রাচীনের এবং নবনের মধ্যে বিরোধটা খুবই পাকিয়া উঠিয়াছিল। স্তুতরাং এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরোধ
নবমূর্তির বাংলা

পাকাইতে হয় নাই। তবে তাহার প্রথম জীবনে নবীন সমাজ সংস্কারের দলই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাব-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প লোককেই সেকালে প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বস্তিতে প্রথম বয়সে কোন কোন দিক দিয়া এই দূর্বল পক্ষেরই ওকালতী গ্রাহণ করিয়া প্রবল দলকে একটুকু সংযত ও আমন্ত্র করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দু পুনরূপান্তরী দল, যখন প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন বস্তিতে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না। একদিকে যে সময় আক্ষরিকের সঙ্গে বস্তিতে স্বল্প-বিষের বিরোধ বাধিয়াছিল, সেইরূপ অপরদিকে জীবন পাগল শান্ত তত্ত্বাবধানের নূতন হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গেও কোন কোন দিক দিয়া। তাহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। তিনি এই দুই দলের কাহারো সঙ্গে মিলিতে পারিলেন না; কিন্তু উভয় দল হইতে পৃথক থাকিয়া ইহাদের পরম্পরের বিরোধের মীমাংসা। করিয়া চেষ্টাতেই “প্রচার” তাহার গীতাভাষ্যের ও অনুশীলন-শ্রমের আলোচনা আরম্ভ করেন।

( ১৭ )

যেমন ঘণ্টা ও সমাজে, সেইরূপ রাজনীতিতে বস্তিতে একটা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, তাহার প্রথম জীবনে, আমাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রাপ্ত ভাল করিয়া। জাগে নাই। এই জন্য সর্বপ্রথমে তিনি রাজ্য ক্ষেত্রে আমাদের ও ইংরাজের মধ্যে যে বিরোধটা অল্পে অল্পে বাড়িয়াছিল, পাকে-পাকারে তাহাকেই পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। প্রচুরভাবে এবং কখনও কখনও প্রকাশিতের কথাতে দুর্বল হইয়া মাঝে মাঝে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। বস্তিতে প্রথম যুগের উপযাস মুসলমান
বঙ্গম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

ইতিহাসের আশ্রয়ে আমাদিগের মধ্যে সংঘাত-স্রোত ও সকলে সকলের পরজাতি বিশেষ জাগাইয়া তুলে। "চন্দ্রশেখরে" এবং "আনন্দমণ্ডলি" সেকালের নবায়নিক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইংরাজ বিশেষের একাদশ ভাবে ফুটাইয়া তুলে। এইরূপে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্গমালা সমগ্র জীব গড়িবার পূর্বে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধ। খুব ভাল করিয়া পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তাহার জীবন্তে এ বিরোধে কিছু পাকিয়া উঠে নাই। পাকিয়া উঠে তাহার সর্গরোধের দশ বার বৎসর পরে, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ইহার বস্তু পূর্বে হইতেই বঙ্গমালা কোন পথে এই সাংঘাতিক বিরোধের সমস্যার সত্তাবনা আছে তাহ নির্দেশ করিয়াছিলেন।

( ১৮ )

দেখিয়াছি যে বঙ্গমালা স্নেহ-প্রীতি তাহার পদ্ধতির অঙ্গ ছিল। ফরাসী বিশ্বাসের পরে যুরোপে যে গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ ফুটিয়া উঠে, বঙ্গমালা সর্বাংশে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আদর্শ সাধ্যজাতীয়। যুরোপে ফরাসী-বিশ্বাস যে সাময়িক সহানুভূতি গিয়াছিল, আমাদের দেশে অতি প্রচুর কালে ভেগান রুক্ষদেব সেই আদর্শের দুর্গনহে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গমালা তাহার "সাধা" শৈল্পিক প্রবন্ধে এই সাধ্যজাতীয় সাধা, মৈত্রী ও প্রাণীতাত্ব আদর্শই প্রচর করিয়াছিলেন। সমৃদ্ধিবিদ্যা হয় নাই বলিয়া তিনি এই প্রবন্ধের পরে তাহার গ্রন্থাবলী হইতে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার বাঙ্গালী পাঠকেরা ইহার কথা জানেন না। কিন্তু আধুনিক সমাজজন্তুরের দিক দিয়া বঙ্গমালা সমাজসিক আদর্শ কি ছিল, তাহার প্রমাণ সম্পূর্ণ তাহার এই মহাম্মূল প্রবন্ধটি আবার
চারিত হইলে মন্দ হয় না। বস্তুচক্রের সামায়িক মৈত্রীর সঙ্গে অন্তঃপ্রাণবেন্দ্র জড়িত ছিল। ফরাসী প্রহরের অধিনায়কের। সামোর আদর্শটাই ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন, যদিও তাহার
*equality* (সাম্য) এবং *liberty* (স্বাধীনতার) সঙ্গে *fraternity* (ভাইবুদ্ধি) জড়িয়া। দিয়াছিলেন, এই সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে
*fraternity* বা ভাইবুদ্ধির কোনো অঙ্কাঙ্কী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কেবল নির্জন সাম্য ও স্বাধীনতার অমোঃ পালনে সমাজবন্ধন টিকিয়া। থাকিতে পারে না দেখিয়া ইহাদের সঙ্গে এই
ভাইবুদ্ধির আদর্শকে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাধনের
মৈত্রী ঠিক এই *fraternity* বা ভাইবুদ্ধি ছিল না। সর্বতোতে
আত্মান্তরের উপরে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ কহিয়াছেন যে
আপনার অন্তঃপ্রাণবেন্দ্রের অন্ত সকল জীবের মাধ্যে প্রতাপক
করে, সে কখনো কাহাকেও অন্তঃপ্রাণবেন্দ্রের মাধ্যে প্রতাপক
করে না। এই যে আপনার অন্তঃপ্রাণবেন্দ্রের সকল মানুষের মাধ্যে দেখা, ইহাই আমাদের
dেখা মৈত্রীর বর্তমান। যুরোপ এ তরের সন্ধান পাই নাই।
সত্তবাণ যুরোপের সামায়িক এবং স্বাধীনতার আদর্শ কেবল বিরোধেই
জাগাইয়া। তুলিয়াছিল, এখনও বিরোধেই জাগাইয়া। রাখিয়াছে।
স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রীর, সামোর সঙ্গে আত্মসংযমের সময় সাধন
করিতে পারে নাই। যুরোপে এইজন্য এই জটিল সমাজ সমাজের
নীরাঙ্কার পথ এখনও পরিস্কার হয় নাই। চলিশপর্দাকাণ্ড বৎসর
পূর্বেও আমরা এতটে যুরোপীয় শিক্ষা ও সামাজিক প্রেক্ষাগৃহে সাম্য
ও স্বাধীনতার সন্ধানে এই বিরোধের পথেই চলিয়াছিলাম। তাহার
জন্য মনে হয় যে, জানি তাঁর 'সাম্য' শিক্ষার প্রবক্ষে এই সাংঘাতিক
সাম্য ও স্বাধীনতার একতায় আদর্শে শান্তি সঞ্চার করিয়া।
আমাদিগকে যুরোপ বে সর্বব্যাপারের পথে ছুটিয়াছে সেই পথেই
চালাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কাতেই বঙ্গমঞ্চে তাহার “সামা” শৈল্পিক প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গীতোক্তি কর্মস্যোগের পথে ভারতের অধুনীকি সাধারণকে প্রবর্তিত করিয়া। এক্ষণে উঠিয়া বা বিশ্বস্তৈষের অনেকের উপরে সামা এবং আধুনিক সঙ্গে বিশ্বজগদ্দী মৈত্রের সত্য সময়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। এই বিশ্বজগদ্দ মৈত্রের উপরেই বঙ্গমঞ্চে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিরোধেরও সময়ে করিতে চাহিয়াছেন।

( ১৯ )

কহিয়াছি যে বিরোধ সত্যকে পাকিয়া না উঠে, তত্ক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব না মান্য থাকি সাধন বা সময়ের কথা ভাল করিতে উঠিতে পারে না। “আনন্দমঠে” বঙ্গমঞ্চে এই বিরোধের প্রথমে পাকিয়া তুলেন। পর্যায়ের অত্যাচার-পীড়িত না হইলে কোথাও স্বজাতি বাংলার ভাল করিয়া জাগিয়া উঠে না। এইজন্য “আনন্দমঠে” প্রথম দিকে তিনি সেকালের প্রাণের উপরে কি নির্ভর অত্যাচার হইতেছিল তাহার ছবি ফুটাইয়া তুলিলেন। মানুষ অনেক অত্যাচার সহিয়া যায়। তাহার মন-সম্বন্ধ, ভোগ বিলাস, এসকলের উপর আক্রমণ পর্যন্ত সে নীরবে সক্ষু করিয়া চলে। কিন্তু এসকলের উপর যখন অত্যাচারের কর্মফলে তাহার জীবনের শেষ অবলম্বন মুষ্টি অন্ত পর্যন্ত আর মেলে না, তখনই মানুষ মরিয়া হইয়া হৃদকালের অভাবে অত্যাচারের পরিত্যক্ত দণ্ডায়মান হয়। জগতের সর্বত্র এই সমধিকেই রাষ্ট্রের মধ্যে মনোনিত হইয়াছে। “আনন্দমঠে” প্রথম স্বষ্টিকে বঙ্গমঞ্চে এই কথাটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চারিদিক থেকে হারাকারের মাঝখানেই মানুষের শব্দ বাজিয়া উঠিয়াছিল। মারাজ্ঞি বন্ধুত্ব মানুষের ঐহিতি ও পারিত্রিক কোন কল্যাণই যে সত্য নহে, ইহাই
"আনন্দমত্তের" প্রথম কথা, ধর্মসাধন করিতে হইলে শরীরের প্রয়োজন। শরীরের স্থায় এবং শক্তির উপরে ধর্মসাধনের যোগ্যতা নির্ভর করে। মানুষ যদি দুঃখে। পেট, ভরিয়া খাইতে না পায়, তাহার সাধন ভজন সম্ভব হয় না। আর রাত্রীয় বিবর্ধার উপরেই প্রকৃতি-পুঞ্জের অন্ত-সংস্থার সম্ভাবনা। সম্পৃক্ত সম্ভাবনা নির্ভর করে। রাজা যদি প্রজার সর্বক্ষণ শোষণ করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রাণাঙ্গ পরিশ্রম করিয়াও প্রজা কিছুতে আপনার যথাপর্যন্ত অন্তসংস্থা করিতে পারে না। "আনন্দমত্তের" এই দৃশ্যে এই সত্তায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধার এই দুঃখিতের বেদনা বাংলার কোমল ফ্রান্সে প্রথমে বাঁচিয়া, উঠে, তাহার দিনাদিক আনন্দুহী হইয়া। প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া। শ্রদ্ধার উদার কার্যে আপনার জীবন উৎসর্গ করেন। শ্রদ্ধাই তখন তাহার একমাত্র শেষ ও প্রেয় হইয়া। উঠে। এই শ্রদ্ধান্ত্রীতির প্রেরণাতেই "আনন্দমত্তের" স্থান দলের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ইহারা এই দেশভঙ্গির প্রর্থনায় ধর্মার্ধ্য বিচার পর্যন্ত পরিষ্কার করিয়া। দেশবাসীর উদার, কার্যে নিযুক্ত হন। এই ভূখাও করিব, এই নাতির অন্যসহ করিয়া, 'সন্তানেরাrant' রাজার দুঃখুজ্জ্বল নিবারণের জন্য নিজেরা দুঃখুজ্জ্বল অবলম্বন করেন। ইহাতে তাহাদের কোন স্থায়ীভিক্ষু ছিল না। ইহারা প্রজার ঘন অপহরণ করিতেন না। প্রাঙ্গ যে অর্থ শোষণ করিয়া রাজাআপনার উদরস্থ করিতে চাহিত তাহাই নুত্তর। আত্মা। একদিকে নিজেদের অনশন সংগ্রহে এবং অলিখ দুঃখ প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্য বায় করিতেন। এইভাবেই "আনন্দমত্তের" একটা প্রজা-বিদ্রোহের ছবি ফুটিয়া উঠে। ইহার ভিত্তি দিয়া বক্ষিতচর্চ রাজার বিরোধটা পাকাইয়া তুলেন। আর পাকাইয়া তুলেন এই জন্যে যে এই বিরোধটা না পাকিয়া উঠিলে সক্ষি না সময়ের কথা উঠিতে পারে না।
বক্ষিম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

(২০)

বিরোধ কেবল পাকিস্তান উঠিলেই চলে না। এই বিরোধে প্রজাপক্ষ যতক্ষণ জয়লাভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্বির প্রস্তাব উঠিতে পারে না। "আনন্দমঠ" সম্মানের যখন শেষ যুগে জয়লাভ করিয়েন বাংলার মুসলমান প্রভুশক্তি যখন নিম্নে বিলোপ পাইল, তখন সমাজ সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের কর্ম্ম্ব শেষ হইয়াছে বলিয়া দলটা ভাজিয়া দিলেন। সম্মানের কেবল অত্যাচারী রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্যই উঠিয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য যে শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন কেবল তাহাই তাহারা পাইয়াছিল; কিন্তু স্থায়োগ্যভাবে রাষ্ট্রশাসনের অধিকার এবং শিক্ষা তাহারা লাভ করেন নাই। অধিকের বিনাশ পর্যন্তই তাহাদের অধিকার ছিল। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সাধন তাহাদের হয় নাই। যাহারা অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন প্রায় কুতুক্তি তাহারা এই সংগ্রামের অবসানে সত্য গণতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। লড়াইয়ের একটা মোহ আছে। সংগ্রামে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ফলে বিজয়ী সেনানীর অন্তরে পুণ্যশক্তির উপরে একাংশ নির্ভর জমিয়া যায়। প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গেলে স্পশভূমির সেনামণ্ডলীর উপরে কঠোর শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এ অবস্থায় সত্য স্বাধীনতার ভূমি কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না। এইজাত রাষ্ট্রশাসন বা বিদ্রোহের সফলতাতে প্রজাবিদের প্রতিষ্ঠা হয় না, কিন্তু এক ক্ষেত্রের রাজশক্তির উচ্চেদ করিয়া তাহার আসনে আর একটা নৃতন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বক্ষিমচন্দ্রের মনীষা এই সত্যটাকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তারই জন্য বক্ষিমচন্দ্র ৩০।
নবযুগের বাঙ্লা

কহিয়াছেন (কোথায় ঠিক মনে পড়িতেছে না) যে বিদ্রোহ অন্তঃস্থায়ী।
“আনন্দ-মঠের” শেষ অংশে তিনি এই সত্তাতাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।
সত্যানন্দ সন্তানদের নায়ক ছিলেন। যখন যেমন তুই খণ্ড ওকালে প্রস্তরের সংযোগে কৃত্রিম মুক্তি নিপীড়িত হইয়া যায়, তেমনই তুই সন্তান-সন্তান সংযোগে বিশাল ইংরাজীজ্ঞান নিপীড়িত হইল—
“ওয়ারেন হেকিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায় এমন লোক রাহিল না!”
—তখনই সত্যানন্দের উপর আদেশ হইল, সন্তান বল বাধিয়া দাও।
সত্যানন্দ কহিলেন—আমার এক সন্দেহ ভঙ্গন করুন। আমি যে মুহূর্তে জয় করিয়া সন্তান ধর্ম নিস্কটক করিলাম, সেই সময়ই আমার প্রতি এই প্রত্যাখ্যানের আদেশ হইল কেন?

যিনি আদিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—তোমার কার্য সিক্তি হইয়াছে। আর এখন তোমার কেন কার্য নাই। অন্যতম প্রাপ্তিহীন প্রয়োজন নাই।

সত্যানন্দ—মুসলমান রাজ্য ধর্মস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য
স্থাপিত হয় নাই। এখনও কলিকাতার ইংরাজ প্রবল।

তিনি—হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হইবে না। তুমি থাকিলে
এখন অন্যক নরহত্যা হইবে না। অতএব চল। ....সত্যানন্দ তীব্র
মর্যাদায় কাতর হইয়া মাত্রোপ। জীবন তুমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া
জোড়হতে ‘বাঙ্গালির সুষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, “হায় মা, তোমার
উদ্দার করিতে পারিলাম না। আবার তুমি মেঘের হাতে পড়িবে।
হায় মা, কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মুত্যু হইল না?”

তিনি বলিলেন—সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির
ভ্রমক্রমে দেশে করিতে দশ সংগঠ করিয়া। করণ জয় করিয়াছ। পাপের
ক্ষেত্রেও পবিত্র ফল হইয়া না। অতএব তোমর। দেশের উদ্দার করিতে
পারিবে না। আর যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজ্য না
হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাব্য নাই। মহাপুরুষেরা, যেমন বুদ্ধ, একথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝিতে, মনোযোগ দিয়া গুন। . . . . . . প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কষ্টাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দেই প্রকার, বহিবিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহিবিষয়ক জ্ঞান না। জ্ঞানের অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জ্ঞানই। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে আগে বহিবিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহিবিষয়ক জ্ঞান নাই—শিক্ষায় এখন লোক নাই; আমরা লোকের শিক্ষায় পটু নাই। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহিবিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহিবিষয়ক জ্ঞানের অভি সুপ্রাপ্ত, লোকের শিক্ষায় বড় সুপ্রুত। স্থতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশের (লোক বাহিত্যে সুশিক্ষিত হইয়া) অন্ততঃ বুঝিতে সম্ভব হইবে। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্ধার হইবে। যতদিন তা না হয় ততদিন না হইতে আপনার জ্ঞানবান, মুগ্ধ ও বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষর থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধবান—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।

(২১)

ইহাই “আনন্দ-মঠের” মূল শিক্ষা। ইহাই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলতত্ত্ব। ইহাই উপরে বক্ষিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মুসলমানের উচ্চতম সাধন যখন সজ্জিতির ও ধর্মের কল্যাণের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল, তখন ‘সন্তানের’ প্রাণ
বিসর্জন দিয়ে সে কার্যা সাধন করিয়াছেন। দুর্বল ও অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতি কুলে বিদ্রোহ অধর্ম নহে। যুগে যুগে ভারতের ইতিহাসে অবতারণ যখনই ধর্মের গ্রাম এবং অধর্মের অস্তিত্ব হইয়াছে, তখনই এই রূপে দৃঢ়তির বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানের প্রতিকূলে বিদ্রোহ আত্মীয়তা হয় নাই। কিন্তু তখনও ভারতের প্রজাশক্তি জাগির। উঠে নাই। মুস্তিমেয় সম্প্রদায় মাত্র জাগির। উঠিয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাহাদের উপরে রাজ্য শাসনের ভার পড়িলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইত না। ঐ গণতন্ত্র আদর্শের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্যই ইংরাজ শাসন অন্তর্বর্তক হইয়াছিল। ইংরাজ আসিবার পূর্বে ভারতবর্ষ যদি জাপানের মতন স্বাধীন ও স্বত্বপ্রতিষ্ঠাতা হইত, তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। জাপান যে পথে আধুনিক বহিবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মকর্ম ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন তদবস্থাধীনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করিয়া আত্মকর্ম ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিত।

কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা হইতে পারিত এরূপ কলন। করিয়া যাহা হইয়াছে ও যাহা প্রত্যক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করা বুঝিতেন। নহে। রাষ্ট্রীয়তার কব-কলনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রত্যক্ষ অবস্থা এবং ব্যবস্থা ধারাই সমীচীন রাষ্ট্রীয় গতি নির্ধারিত হইয়া থাকে। বক্ষের রাষ্ট্রীয়তার যাহা হইয়াই অথবা তাহার উপরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হইতে পারিত সে কলন অশ্রু করিয়া চলে নাই। আর যাহা হইয়াছে ও আছে তাহাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াই বক্ষের রাষ্ট্রীয়তার একটা সমীচীন সমস্যার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। এই বিষয়ের বক্ষের রামমোহনের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন।

( ২২ )

কেহ কেহ মনে করেন যে বক্ষের ইংরাজের চাকুরী করিতেন;
বক্সম সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি ।

আর ইংরেজ প্রত্যাশিতের বিরুদ্ধে দেশের লোকের অন্তরে কোন প্রকার স্বাধীনতার জাগাইয়া, তুলিবার চেষ্টাতে রাজনীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হয়, এইজাহ্যই বক্সমচন্দ্র “আনন্দমণ্ড” এরপ্রভাবে ইংরাজের ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করলে বক্সমচন্দ্রের মনীষা ও চরিত্রের অবমাননা করা হয়। রাজা রামমোহনের মতন এমন স্বাধীনতার উপাসক, এরূপ স্বজাতিবৎসল দেশদেশের সব যুগে যুগে দেখা যাইতে না, বিলিও অসুস্থি হইয়া। আর রাজাও ইংরাজ শাসনের দ্বারা এদেশের সমুহ ক্যাল্পাটিহীন, এরূপ বিশ্বাসের ব্যথা হইয়া ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতবর্ষের ক্যাল্পাটিহীন জন্ম, যুক্ত ভারতবাসীর অসাধু দেহে জীবনের শক্তি সঞ্চার করিবার জন্ম আধুনিক বহিবিশ্বাস বিষয়ে আক্ষেপ ভারতবাসীদের মণ্ডল শিক্ষা দিবার জন্ম রামমোহনও কিছুকাল ইংরাজ এদেশে রাজা হইয়া থাকিলেন। ইহার চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহার সহকারী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী আরনল্ডকে বহিয়াছিলেন যে এই কাজটি করিবার জন্ম আরও চলিয়া বৎসর কাল ইংরাজ ভারতের রাজা হইয়া থাকিবে; ইহার মধ্যে ভারতবাসী যুরোপীয়... দিগের সমক্ষ হইয়া উঠিয়া পারিবে।

স্বাধীনতার কিছুদিন পূর্বের রামমোহন আরনল্ডকে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ১৮৭০-৮০ পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটের উপরে একশেষা বা সৌরাষ্ট্র বৎসর পর্যন্ত ইংরাজ এদেশে রাজা হইয়া থাকিবে; এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজদের নিকট আমাদের যাহা কিছু প্রাপ্য ও শিক্ষানীতি তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিব। এই কারণেই ইংরাজ এদেশের রাজা হউক, রাজা হইয়া আমাদের নব-জগতের সহাযতা করুক, ইংরাজের শিক্ষাধীন পাইয়া আমরা বহিবিশ্বাস ভাবে পারঙ্গর হইয়া উঠিয়া, এবং ক্রমে এইভাবে
আধুনিক জগতে একটা স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি, রামমোহন ইহা চাহিয়াছিলেন । বক্ষিমচন্দ্রও তাহাই চাহিয়াছিলেন । “আনন্দমণ্ডিত” এই মতবাদটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

ইহার আরও একটা হেতু অনুমান করা যাইতে পারে । বক্ষিমচন্দ্র যুরোপীয় ছাচের স্বদেশগীতির আদেশ পক্ষপাতী ছিলেন না । যুরোপীয়রা নিজের দেশকে বড় করিতে যাইয়া অপরের দেশের উপর অকথ্য অভ্যাসচার করিয়া থাকে, একথা তিনি দেখিয়াছিলেন । স্পষ্ট ভাবায় তিনি যুরোপের এই স্বদেশগীতির নিম্না করিয়াছেন । ভারতবর্ষের লোকে কোনদিন যেন এই আমৃতাদলী, বিশ্বদেহী ও ধর্মদেহী আদর্শের অনুসরণ না করে, বক্ষিমচন্দ্র সর্ববাস্ত্রকরণে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এই ধর্মদেহী রাষ্ট্রনীতির পথে বর্জন করিয়া চালিত হইলে যেভাবে আধুনিক যুরোপে প্রবল পরাক্রমে রাষ্ট্রস্কল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষে সে পথে যাইলে চলিবে না । আর যুক্তিবিশেষের পথে যদি ভারতবর্ষ আপনার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে যায় বা যাইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে যুরোপে যেকোন সামরিক সামঞ্জস্য-সূচনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ভারতবর্ষেও সেই জাতীয় সামরিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়া, বক্ষিমচন্দ্রের মনোজ্ঞাত যে এই মোটা কথাটা ধরিতে পারে নাই, এরূপে মনে করিতে পারি না । যুক্তি করিতে হইলেই সেনা ও যুদ্ধের অন্যান্য সাঙ্গসাঙ্গাল্য সংগ্রহ করিতে হইবে । আধুনিক কালে যুদ্ধ ব্যাপারটা অতি জটিল হইয়া উঠিয়াছে । কোন বাহ্যের অতিকালি রাণজয় হওয়া সহজ নয় । প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়হীন লাভ করিতে হইলে এখন বাহ্যে, ধনবাল, দ্বিতীয়, বিদ্বান, জাতীয় জীবনের প্রায় সমগ্র শক্তিকে ও সম্পদকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে হয় । ইহাতে যুদ্ধ জাতিসম্পল পুনর্যাপ অভিনব দাসের শৃঙ্গে আবদ্ধ হইয়া
পড়ে, সত্য স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের আদর্শ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। এই পথে বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। অসাধ্য। আর ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শই এই বিশ্বজগতীন নৈতিক। ভারতবর্ষের হিন্দুদের অতি প্রাচীনকাল হইতে এই আদর্শের পরিচালনা ছিলো না; ইহাই ভারতের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত। এই আদর্শেরই হইলে ভারতবর্ষ আপনাকে হারাইবে। আপনাকে যদি হারাইয়া ভারতবর্ষ যুদ্ধের মতনই হইয়া। উঠে তবে তাহার সত্যনাম বাঁচিয়া। একবার কোন হেতু থাকে না। বক্ষিমচন্দ্র একক কথা বেদবৃন্দ সৃষ্টি করিয়া। দেখিয়াছিলেন, এমনকি রামচন্দ্র ছাড়া। আর কেহ সৃষ্টি দেখিয়াছিলেন বলিয়া। মনে হয় না। আর এই জয়ই বক্ষিমচন্দ্র যেমন ধর্মে ও সাধনে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একটা সম্পূর্ণ সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রধান হইলে যুদ্ধবিগ্রহ যে পাপ একর কথা। বক্ষিমচন্দ্র কথন ভাবিতেন না। নিকামভাবে আত্মার আত্মার নিবারণের জন্য অদ্বিতীয় পাপ হওয়া। দুর্বল কন্যক, অনিয়ম পুণা কস্ম, ইহাই বক্ষিমচন্দ্রের শিক্ষা। “আনন্দমঠে”, “সৌভাগ্যে”, “সৌভাগ্যে” “সৌভাগ্যে” “সৌভাগ্যে” “সৌভাগ্যে” “সৌভাগ্যে” এই সকল বলিয়াছেন। সকল শ্রীকৃষ্ণ যেমন যত্নশীল কৌরবদিগের সঙ্গে পাশ্ববিদ্যমানের সঙ্গে বা আপোষে বিবাহ নিন্দ্যভূত বিদ্যুতচ্ছায়া সংগ্রহ ছিল, তত্ত্বন পর্যন্তই যুদ্ধ প্রকৃত হইতে চাহেন নাই, বক্ষিমচন্দ্রও সেইরূপ যত্নশীল স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য বিদেশী প্রভুর প্রমুখ সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গিন ও সোনামায়ার বিনোদন সম্পর্কে। আঘাত তত্ত্বন মারাত্মক বিদ্রোহের পথ অবলম্বন অধর্ম বলিয়া। মনে করিতেন। এই সংস্কৃতি ও সোনামায়ার দিকে উঠার দৃষ্টি সর্বদা যেন নিবন্ধ ছিল। এইজন্যই তিনি স্বদেশবাসীদিগকে আপনার বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল ও বিশ্বান্বল সংগ্রহ করিবার জন্য
প্রণোদিত করিয়াছিলেন। “কলকাতা সেই অভ্যন্তরে” আত্মনির্ভর যে
রাষ্ট্রীয় শক্তি ও স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ—ভিক্ষারুতি যে
স্বাধীনতা মিলে না, এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।
অথচ অন্য দিকে এই আত্মশক্তিকে বিরোধ জাগাইবার পথে
পরিচালিত না করিয়া প্রজার প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজার
স্বাধীনতা আপনে নষ্ট করিয়ে চাহিয়াছিলেন। বক্ষমের
রাষ্ট্রীয়তাতে সমরায়োজনের স্থান আছে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সংগ্রাম
নহে, সম্ভির দিকে প্রতিপক্ষকে প্রণোদিত করা। এইরূপেই
বক্ষম-সাহিত্যের রাষ্ট্রীয়তা একটি সমর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া
চলিয়াছে। এই কথাটি না ধরিলে বক্ষমচন্দ্রের রাষ্ট্রীয়তার মূল
তত্ত্ব ধরা সম্ভব হইবে না।
চতুর্দশ কথা

নাট্যকলায় ও রঞ্জালয়ে নবযুগ

ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক যুগের সাধারণ প্রেরণা বাংলার
ইংরেজি-নিবিষ্টদিগের অন্তর্যামে বিবর্ণ ঘটাইয়া। তুলনা, তাছার ফলে
সাহিত্যের অপরাপর বিভাগের মতন নাট্যকলা। এবং রক্ষণাবেক্ষণে এক
অপর্যাপ্ত সুন্দর উপস্থিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতের
নাট্যকলার অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে নাটকগুলি
তার প্রায়। কিন্তু সাধারণ লোকের সাধারণ সাহিত্যে ইহার
প্রতি হয় নাই। বাঙালি ভাষায় ইংরেজি আমলের পূর্বে কোনো
নাটক রচিত হইয়াছিল কিনা, তাছার প্রমাণ নাই। এমন কি পাঁচ
ছয় শত বৎসর পূর্ববকার বাঙালি সাহিত্যে কোনো বিশিষ্ট নাটকের
খোঁজ পাওয়া যায় নাই—অতি উঁচু অঞ্চলের সীমাবদ্ধ বিশ্বকর
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "চণ্ডীদাস, বিধাপতি, রায়ের নাটকগীতি"—
"চৈতন্য-চরিতামৃত" ইহার উল্লেখ থাকিলেও "রায়ের নাটকগীতি"
যে বাঙালি নাটক ছিল, এরূপ অনুমান করিবার বেদ হয় কোন হেতু
নাই। শ্রীরীবি মহাপ্রভুর সময়ে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল,
তাই সকলে সংগৃহীত, বাঙালি ভাষায় কেবল গীতিকাব্যেরই স্তর
হইয়াছিল। বাঙালি নাট্যকলা নিতান্ত আধুনিক, ইংরেজি আমলের
স্তর, ইংরেজি শিক্ষার ফল। আর এই নতুন শিক্ষার প্রেরণায়
বাঙালীর প্রাণে যে সকল ভাব ও আদর্শ জাগিরাছিল, বাঙালি
নবযুগের নাট্যকলা তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

৩১
ঐংরাজি শিক্ষা প্রথম ফল সমাজ ও ধর্ম সংস্কার। ঐচ্ছিক
বাংলার নূতন আদর্শে ও ধর্মীয় বুদ্ধিতে আশা লাগে। ইংরাজি শিক্ষা
প্রচলিত আচারায়ণসাদৃশ ঐংরাজি শিক্ষার অংশ নিতান্ত বীত প্রবল হইয়া,
এগুলির সাধারণ সাধন প্রাপ্ত হয়ে। বাংলার নব্যুগের প্রথম পর্যবেক্ষন নাট্যালায়
এই সমাজ সংস্কারের আদর্শটাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে। "বিয়ে
পাগলা বুড়ো”, "জমাই বারিক” প্রভৃতি প্রভাসনে, “কুলীনকুলসর্বব্যবস্থা”,
"বধু বিবাহ নাটক”, “সাধারণ একাদশী” প্রভৃতি নাটকে এই ধর্ম
ও সমাজ সংস্কারের ভাবটাই খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।
বাঙালী সমাজের মূলে ভাব ও আদর্শ জাগাইয়াছিলেন, যাই বৎসর
পূর্বকার বাংলা নাট্যালা তাহাই অন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত
করিয়া চাহিয়াছিল৷ বাংলার নূতন রঙ্গলয়ের সাহায্যে এই
সকল ভাব এবং আদর্শের দেশ হইয়া পড়িয়াছিল৷ দীর্ঘবাসুর
বস্তুত যুগপৎ সাময়িক ও সার্বকলিক ছিল৷ একদিকে তাহাতে
নাট্যালের প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে আলাদা যাহা দেশ
বাসকালের অভিজ্ঞতা, নিতা রসমৃদ্ধি, তাহাও মূলত উঠিয়াছে।
"জমাই বারিক” বহু বহু দিন উঠিয়া। যাহা ছিল৷ নিষ্ঠার বাস
আচার-মানবিক বাঙালী সমাজে লোক পাইয়াছে৷ কিন্তু যে
অবলম্বন ও উদ্দেশ্যে আদর্শে এ সকল অপূর্ব রসমৃদ্ধি গড়িয়া
উঠিয়াছিল৷ তাহ। বলিয়া গেলে মূল রস বদলায় নাই। তাহা
চিন্তন ও সমাজেন৷ এইজন্য আজিও আমরা “সাধারণ একাদশী” বা
"নবীন তপস্বিনী” পড়িলে বা এগুলির অভিনয় দেখিয়ে অপূর্বের
রসাঞ্জনা করিয়া থাকি৷ "নবীন তপস্বিনী" কে বাংলায় ত্রাস্যুগের
নাটক বলিতে পারা যায়৷ ফলতঃ দীর্ঘবাসুর নিষ্ঠার সকল নাটকের
নাট্যকলায় ও রঙ্গালয়ে নবযুগ

মধ্যেই স্নাতকবিতার পরিমাণে তদানীন্তন কালের ব্যাখ্যা সমাজের ভাব
ও আদর্শ ফুটিয়া আছে। ইহ। কিছু আশঙ্কার কথাও নেহ।
কারণ পঞ্চাশ টাই বৎসর পূর্বের দেশের নবায়নিক সমাজের সকলেই
অক্ষুন্নে অন্তরে ব্যাখ্যা ভাবপর্যায় ছিলেন।

( ৩ )

সমাজ ও ধর্মরূপকের যুগের পরে রাষ্ট্রীয় স্থানীয়তার যুগের
আবির্ভাব হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের
সূত্রপাত হয়। কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, সঙ্গীত, সাহিত্যের সকল
বিভাগে এই নতুন স্বাচ্ছিন্নতার ভাবটা মুখ্য হইয়া উঠে। পশ্চিমে
যমুনাতীরে বসিয়া। গোবিন্দ চন্দ্র রায় নতুন “জাতীয় সংগীতের”
তাঁর ধরেন।

কত কাল পরে, বল ভারতের

• দুঃখ-সাগর সাতারি পার হবে?

এটী বোধ হয় তাঁর প্রথম গান।

মিশ্রল সলিলে বহিছ সদা।

তংশালিনী সুন্দরী যমুনে—ও!

এইটি বিজয়ী গান। গোবিন্দচন্দ্র এই দুইটি সংগীতেই বাংলা। সাহিত্যে
একটা স্বায়ী স্বাভাবিক অধিকার করিয়া। আছেন। আজিকালিকার লোকে
এ সকল গান আর গায় না, ইহার সমীকরণ এবং শক্তি জলিয়া
গিয়াছে। কিন্তু এককালে এগুলি নব বাংলার নবীন দেশমতৃকার
সাহিত্যের আশক্তি ছিল। যমুনা ত বহুদূর। আমার। পঞ্চাশ
বৎসর পূর্বের গভীরতারে বসিয়া। “মিশ্রল সলিলে” গাইয়া। ও শুনিয়া
স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ার। হইয়া। উঠিতেন। ভারত ইতিহাসের এমন
করুণ কাহিনী আর কেহ গান করেন নাই।
এই স্বদেশ-প্রেমের ভাব ও আদর্শ ক্রমে নাট্যকলাতেও ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। "ভারত মাতা" নামে গীতি-নাট্যধারার সর্বপ্রথম দেশ-ভক্তিকে ধর্মের এবং দেশ-শেষকে উপাসনার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পরে দেশ মধ্যে যে স্বদেশ-ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, "ভারতভক্ত" তেই তার প্রথম সৃষ্টী হয়। বোধ হয় বেঙ্গল থিয়েটারেই এখানির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। সিলেট ছাপা হইয়াছিল কি না, মনে নাই। কিন্তু বহুল ধরিয়া রঞ্জকে অভিনন্দিত হইয়া "ভারত মাতা" পৌরাণিক সংস্কার করিয়া দিল। পৌরাণিক বর্তমানের পূর্বের সমাজে দেশ-ধর্মের বা পৌরাণিক শিক্ষা সমাজে দেশ-ধর্মের বা পৌরাণিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

( ৪ )

ইংরেজি-বিষয়ে সে যুগের দেশ-ধর্মের বা পৌরাণিক শিক্ষার মূল প্ররোচনা ছিল। বাংলার নূতন নাট্যকলা এবং রঞ্জকে এই বিষয়ে ভাব খুব গুণিত। উঠে। ইহা প্রথম প্রকাশ পায় দীর্ঘকাল পূর্বে।

নীল কান্তি ঠিক বাংলা করলে এবার ছাড়া নাই।

প্রকাশের আর প্রাণ বিচার নাই।

অসময়ে হরিশ মোল, লংয়ের হ'ল কারাগার।

এই গানটিতে লোকে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিত। আর—

নীল কান্তি দীর্ঘকাল দি দিল গত সুখ।

ফুলের শোভা চেলে দিল যত সুখ।

পত্নীগুলি শোকে মাতা ছ'য়ে পাগলিনি

ধন্তত করেন বধ সরল কামিনি।
নাট্যকলায় ও রঙ্গলয়ে নব্যুগ

আমার কথায় মার জ্যানের সকার
উদ্ধলিল একবারে শোক পারাবার।

শেষ অঙ্কের শেষ অভিনয়ের এই আক্ষেপক্ষিতে শ্বোতৃ ও দর্শকমণ্ডলী অনেক কারণে রঙ্গ ভুলিয়া। যাইতে ও ইহারই সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রে ইংরাজ-বিদেশে প্রাবল্য বন্ধর মতন বিহিতে আরম্ভ করিত।

(৫)

“নীল-দর্পণ” যে আদেশিকতার বোজ বন্ধ করিয়াছিল, উপেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়ের “শরৎ সরোজিনী” ও “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” তাহাকে অনুভূত, পল্লিবাদ ও কৃষ্ণমিত করিয়া তোলে। “নীলদর্পণের” কথা লোকে এখনও জানে। যদিও বাংলা ভাষা থাকিলে, দীনবন্ধুর নাট্যাবলী তদিন বাঙালী সমাজে আদৃত হইয়া রহিলে। দীনবন্ধুর কবি-প্রতিভা উপেন্দ্রনাথের ছিল না। তাহার “শরৎ সরোজিনী” বা “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করে নাই। আজ্ঞাকালিক লোকে উপেন্দ্রনাথের নাম জানেন না, তাহার নাট্যকলার কোন খবর রাখেন না। কিন্তু পঞ্চ নক্ষত্র পূর্ণবে “শরৎ সরোজিনী” এবং “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” আমাদের নূতন এদেশ-প্রেমে ও ইংরাজ-বিদেশে অসাধারণ ইতিহাস কোঠায়ীছিল। এই দুইখানি নাটকই এদেশ-প্রেমীতেমুলক। এই দুইখানিতেই ইংরাজের অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র ফুটাইয়া হলিয়াছে। এই দুইখানি নাটকেই বিদেশীর হাতে দেশের লোকের কিছু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় তাহ। বিশ্ব করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। হেমচন্দ্র তাহার কবিতায়

দীরে দীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই,
শেষাঙ্গ দেখিয়ে আতঙ্কে পলাই।
বাণী ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
না হলে শুনিতে এ বীণা বঙ্কার।

এ সকল কথাতে যে ভাব জাগাইয়াছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র “কত কাল
পরে বল ভারতের” এবং “নির্মল সলিলে” গাহিয়া। যে উদ্দীপনার
স্থিতি করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কল্পকুশলতা সহকারে
সৃষ্টিপূৃণ তুলিকায় “চন্দ্রশেখরে” ফক্তারের চিত্র আকিয়া।
খ্যাদেশের যে মর্মান্তিক অবসামনার কথ। অন্তরে জাগরক রাধিতে
চাহিয়াছিলেন,--সেই ভাব ও সেই প্রেরণাকেই উপেক্ষনায় ‘শরৎ
সরোজিনী’” এবং “সুরেন্দ্র বিনোদিনীতে” প্রাপ্তির করিতে চেষ্টা
করিয়াছিলেন। সেকালে এই হাওয়াটাই আমাদের মধ্যে বহিতেছিল।
তাহী জন্য “শরৎ সরোজিনী” এবং “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” তখনকার
নাটকলাভে ও রঙ্গমণ্ডলে একটা প্রাপ্তির লাভ করিয়াছিল। আধুনিক
খ্যাদেশিকতার অভিবক্তির ইতিহাসে এই জন্য ‘উপেক্ষনাত দাস
এবং তাহার “শরৎ সরোজিনী” ও “সুরেন্দ্র বিনোদিনী”র একটা
বিশিষ্ট স্থান আছে।

“শরৎ-সরোজিনী” ও “সুরেন্দ্র বিনোদিনী”র একটা বৈশিষ্ট। এই
যে, ”নৌলিপাঁ” ছাড়া। এই দুর্ধারা নাটকগত সর্বপ্রথমে খোলাখুলি-
ভাপে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের যে একটা সংযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা
জাগির। আছে, ইহা বলিতে চেষ্টা করে। ইহার পূর্বে আমরা ঠারে-
ঠারে মূল্যমন্ত আমলের ইতিহাসের আড়ালে যাই। ইংরাজ-রাজের
প্রতি আমাদের মনোভাব বাক্য করিতে চেষ্টা করিতাম। হেমচন্দ্রের
“বাজ রে শিখা”, সত্যেন্দ্রনাথের “গাও ভারতের জয়”, গোবিন্দ-
চন্দ্রের “কতকাল পরে বল ভারতের” কিন্তু “নির্মল সলিলে”——
এ সকলই পরাক্ষেশ্বারে বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনাকে
নাট্যকলায় ও রঙ্গলয়ে নবমুগ

ঝাগাইয়াছিল। কেবল “নীলদর্পণ” সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ কুটিলাল-  
দের অত্যাচার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষদের  
পশ্চাতিস্থের ছবি ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু নীলকরের অত্যাচারে দেশে যে  
কুমুল অন্দোলন জাগিয়াছিল, তাহ। একটি বিষেষ ঐতিহাসিক ঘটনা।  
লং প্রভূতি সদাশয় ইংরাজের পর্যায়ে এই অন্দোলনে প্রাজার পক্ষ  
সমর্থন করিয়াছিলেন। লং সাহেবের কারাদণ্ড হওয়াতে একদিনে  
দেশের জনসাধারণে অন্দোলন ইংরাজ সমাজের উদারমতি লোকের  
পর্যাপ্ত ক্রু হইয়া উঠেন। এই ক্রোধ ও এই অত্যাচারের ছবিটাই  
দোনবঙ্গ “নীলদর্পণ” অঙ্কিত করেন। সাধারণভাবে ইংরাজ-রাজের  
বা ইংরাজ-রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে “নীলদর্পণ” স্পষ্টভাবে  
কোনও কথা বলা হয় নাই। তবে নীলকরদের অত্যাচারের  
ছবিতে কেবল নীলকরদের বিরুদ্ধেই যে লোকের মনে একটি বিষেপ  
জাগাইয়াছিল, তাহ। নহে; সাধারণভাবে সকল বিদেশীয়ের এবং  
বিদেশী প্রভুশিক্ষার প্রতিকূলেও একটি বিরুদ্ধ ভয় জাগাইয়াছিল।  
“শরৎ সরোজিনী”তে এবং “সংরক্ষণ বিনোদনী”তে উপেক্ষারূপই  
প্রথমে এই ভাবটাকে প্রবৃত্তি ও প্রকাশভাবে ইংরাজ সমাজের  ও  
ইংরাজ প্রভূশিক্ষা প্রতিকূলে পরিচালিত করেন।

(৬)

নবমুগের নাট্যোক্তিরে জ্যোতির্বিদ্যানাথের “সরোজিনী” একটা  
বিষেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। রস-স্থাটির বিচারে “সরোজিনী”  
উপেক্ষারূপে নাট্যবলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বাদেশিকতার প্রকল্প  
হিসাবেও “সরোজিনী” একটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে।  
“সরোজিনী” রাজপুত্র ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। রাজপুত্রের অগ্র দেশভক্তি বাংলা নাট্যকলায় প্রথমে “সরোজিনী”তেই ফুটিয়া
উঠিয়াছে। কারণ রংকলারের "পাখনী উপাধ্যায়" এই উদ্দেশ্যে "সরোজনী"র পূর্বে জাগাইয়াছিল। কিন্তু তখন লোকে রংকলারের "পাখনী উপাধ্যায়" পড়িত, তার চাইতে অনেক বেশী লোকে সম্পাদের পর সপ্তাহ "সরোজনী"র অভিনয় দেখিত। বাহির হইতে দেখিলে "সরোজনী"তে একটা মুসলমান-বিদ্রেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অস্তর্য বাংলা। বেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। হিন্দু মুসলমানকে বিদ্রেষের চক্ষে দেখিত না, মুসলমানও হিন্দুকে ঈশ্বর করিত না। স্বভাব "সরোজনী" প্রভৃতিতে মুসলমান ইংরাজের প্রতীকরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লোকে মুখে গান দিত মুসলমানকে, অন্তরে ধ্যান করিত ইংরাজকে। পরাক্ষভাবে "সরোজনী"ও রাজপুত-মুসলমানের বিরোধের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া লোকের মনে ইংরাজ-বিদ্রেষই জাগাইয়াছিল।

( ৭ )

যদিও পঞ্চাশ বৎসর পূর্বকার স্বজাতিবাংলা বিশেষভাবে পরজাতি-বিদ্রেষের আর্ধরেই জাগিয়াছিল, তথাপি ক্রমে ক্রমে ইংরাজ অমুকলে স্বদেশের সত্যতা এবং সাধনর প্রতি একটা অকৃতিম শ্রদ্ধা ভক্তিই স্ফূরিত হইতেছিল। একদিকে বঙ্গমন্ডলের "বঙ্গদর্শন" বিশেষভাবে এই কাজটা করিয়াছিল, অন্যদিকে সেই স্বদেশের মাদককালে নানাদিক দিয়া এই সত্য স্বদেশিকাত্তকে উদ্দেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সেকালে ইংরাজ-শিক্ষিত লোকের মনে মুসলমানের অনুচিতীর্থি। প্রত্যেক নিরিতিসম্পর্কে বলবতী হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে জ্যোতিরল্লাঙ্কার এই বোধ হয় সর্বপ্রথমে বঙ্গ রংকমে এই সাংঘাতিক প্রবণতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্রে বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতে
চেষ্টা করেন। তাহার “ষষ্ঠকিংক্ষৎ জলযোগ” এবং “এমন কর্মে আর করব না” এই দুইখানি প্রাসনই প্রাসন হিসাবে যেমন উৎকৃষ্ট, সেইরূপ পরজাতির অনুচিত্কর্ষ প্রুষাধিকৃত দন্ন এবং অধিক করিবার চেষ্টা তেও সেনাহার বংশ নাট্যকলায় অনাৰ্তাধারায় বেশীঅত্যন্ত লাভ করিয়াছিল । এ দুইখানি যদি এখন বাঙাল পাওয়া যায় কিনা জানি না, আজিবালিকার বাঙালী ঐ দুইখানি প্রাসনের খবর রাখেন কিনা যেন সন্দেহ। জান তিরিসন্নাথ পঞ্চশ তৃতীয় পূর্বে প্রাসন রচয়িতারূপে বাঙালী সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। নাট্যচর্চা অমৃতলাল বঙ্গ মহাশয় পরে সেই স্থান অধিকার করেন। অমৃতলালের রঙ্গকৌতুক এবং বাঙালী হিন্দু পুনরুত্থানের আন্দোলনের মুখেই ফুটিতে আরম্ভ করে। বিদেশীর অনুচিত্কর্ষার বিরুদ্ধে তখন দেশে একতা অতি একত্র ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম যুগের বিলাতী সভ্যতা এবং সাধনার প্রভাবের প্রতিকূলে তখন প্রাচ্য প্রতিক্রিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু জান তিরিসন্নাথ যে সময় এই অনুচিত্কর্ষার প্রস্তুতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা আরম্ভ করেন, তখনও আমাদের ইংরাজীনবিশেষা বিদেশের মোহে আচ্ছান হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বভাবান্ত স্বাভাবিক প্রাধান্য আচরণের আসন জান তিরিসন্নাথ এবং তাহার অন্য জ্ঞান বিজ্ঞান নাথনাথেই একত্র বলিতে গেলে পরবর্তী হিন্দু পুনরুত্থানের মূল প্রবর্তক। দেবন্দনাথ স্বয়ং আর একদিক দিয়া দেখিলে এই পুনরুত্থানের বা প্রতিক্রিয়ার গোমুখী হইয়া ছিলেন, একুশ্চ বলা যায়। “জামাই বারিক” এবং “সম্ভব একাদশ” তখনকার সমাজের অহিতাচরের উপরে তীর্থ ক্ষারীতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। “বলু বিবাহ”, “বিধবা বিবাহ নাটক”, “বিয়ে পাগলা বুড়ো”, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো”—এ সকল প্রাসন এবং ৩২
নবযুগের বাংলা

নাট্যস্থল প্রাচীন হিন্দু সমাজের কুরীতি এবং কুসংস্কার লোক-চক্ষু হীন করিয়া, সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্বপ্রথমে নূতন সমাজ এবং ধর্মসংস্কারকে দেরী অভিচারের উপরে শানিত বিজ্ঞ বাণ নিয়ে গেল পরোক্ষভাবে মোক্ষের সাধন। এবং সভ্যতার প্রতি শিক্ষিত সমাজের চিন্তার আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন।

(৮)

নবযুগের নাট্যকলায় মনোমোহন বঙ্গ মহাশয়ও একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন। মনোমোহন বঙ্গের নাটকগুলির খোঁজখবর আধুনিকেরা রাখেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমরা উঠিল নটক পড়ি আর না পড়ি, তিনি বর্ষান যুগের স্বাদেশিকতায় ও দেশচর্চায় যে শক্তি অধান করিয়াছিলেন, তাহা বাংলার নবযুগের ইতিহাস বিশ্বুত হইবে না। চলিন পঞ্চাশ বৎসর পরের লোকে তাহার রচিত—

দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন,
অমনভূতে শীর্ষ, চিন্তাজগতে জীবন,
অমননে তুমি কীৰ্ত্তি

এই গান গাইয়া থাকে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই সঙ্গীতের অন্তরালে যে বাস্তবতা ছিল, আজ লোকের চিন্তার কারণে এই অনুভূতি শতাধিকে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। কবির সুস্বর্পী পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল আজ তাহাই প্রকাশ্যভাবে সাধারণ লোকের চক্ষুগোচর হইয়াছে। বাংলার নবযুগের নাট্যকলার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় রামরায়ণ, মাইকেল, দীনবঙ্কু, উপেক্ষানাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন প্রতীতির রসচিত্রের ঘর। গাছিত
নাট্যকলায় ও রঙ্গালয়ে নব্যুগ

হইয়াছিল। বিদ্যায় অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, বিজেন্দ্রলাল, 
কৌরোদেশায় প্রভূতির শ্রম। ইংল্যাণ্ডের হিন্দু-পুরুষতান ও সামাজিক 
প্রতিক্রিয়ার মুখে ক্রমে ক্রমে স্ফুরিয়া উঠেন। এই নব্য হিন্দু 
আন্দোলনের কথার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র প্রভূতির নাট্যকলা অনুসরণ। 
এই আন্দোলনের কথা বিবৃত করিবার সময় গিরিশচন্দ্র প্রভূতির 
রসসৃষ্টির আলোচনা করাই সম্ভব হইবে।

( ৯ )

বাংলার রঙ্গমঞ্চে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতা ও দেশচর্চারকে 
কি পরিমাণে যে বেশি করিয়াছেন, কি অভিনেত্রীর নিপুণতাতে, কি 
রসসৃষ্টির রূপকল্পনায়, বর্তমান যুগের বাংলার অভিনেতা ও অভিনেত্রী- 
গণের কেহ কেহ যে সম্ভাবনামূলক অভ্যাস দেশের শ্রেষ্ঠতম 
অভিনেতা ও অভিনেত্রী অপেক্ষা নিকৃষ্ট থেকেন, অনেকে এ সকল কথা 
বোঝেন না বা ধ্যান করিয়া দেখেন না, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া দেখিতে 
চাহেন না। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে নট বিদ্যা একটা 
সম্প্রদায় বা জাতি ছিলেন। নাট্যকলার অনুশীলন ইংল্যাণ্ডের 
পুরুষানুষ্ঠান বা জাতিগত বাসসায় ছিল। নট নটী গৃহস্থ 
ছিলেন। সে বাসসায় ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। সঙ্গীতকলা এবং নৃত্যকলা 
উভয়ই মধ্যযুগে গণিকাদিগের দ্বারা সৃষ্টি হয়, প্রাচীনকালেও 
হইত। বাংলায়নে ইংল্যাণ্ডের কথিত গ্রামীণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
আমরা আজকাল গণিকা শব্দে অর্থে ব্যবহার করি, বাংলায়নের 
কালে সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না। যে সকল প্রাচীন চৌষট্টিকলা 
আয়ত করিতেন তুষারাদিগকেই বাংলায়নের কালে গণিকা বলা হইত। 
যাত্রাকালের মনে— 'বিজ্ঞাপনগণিকা পুষ্পমালা পতাকা' প্রভূতির যে 
উল্লেখ আছে তাহাতে বোধ হয় গণিকা শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত
হইয়াছে, সাধারণ অট্টচরিত্র। প্রালোক অর্থে নহে। ক্রমে মধ্যযুগে রাজ্যের অভ্যর্ত নাশের সঙ্গে ইঞ্জোনের দুঃখ অপমানের অসহ্য যন্ত্র। হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ যখন নিতান্ত নিরাশ ও একান্ত অসহ্য হইয়া। পরলোককে অধিকার করিয়া ইহলোকের ক্ষতিপূরণ করিবার আশায় সংসারের সকল ভোগ বিলাসকে বিষয় বর্জন করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতে যাবতীয় রসকলার অনুশীলন ধ্বংসক্রম ও ভদ্রসমাজের সঙ্গে নিষিদ্ধ হইয়া। পড়ে। ইহাই ফলে সঙ্কীর্ণতার লিঙ্গ কলার অনুশীলন ভদ্রসমাজে লোপ প্রাপ্ত হয়। আধুনিক যুগে ইংরাজি শিক্ষা ও যুরোপীয় সংবধানের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যখন লিঙ্গ কলার অনুশীলনে প্রবৃত্ত ইহলাম তখন ভদ্রসমাজে নষ্ট নষ্ট পাওয়া সত্ত্বা ছিল না। প্রথমে পুকুরেরই সহের রঞ্জালয়ে রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। ইহাতে রসস্থানের ব্যাঘাত হইত, অভিনেত্রীদের চরিত্রে যে বিশ্বদ্বার থাকিত এমন বলা যায় না। সত্তা রসস্থানের প্রয়োজনে যখন রমণীর ভূমিকা রমণীকেই গ্রহণ করিতে হইল, তখন সমাজে না ব্যবসায় আপনকেই হইল। উঠে। এরূপ অবস্থায় শুধু রসস্থান এবং নাট্যকলার যথাযথ উন্নতি সহ্য ছিল না। সমাজের চিন্তা এবং চরিত্রে আত্মার। উদ্ধৃত ও নিয়মিত করিতে ছিলেন তাহাদের সঙ্গে রঞ্জনের একটা বিশাল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত হইয়া। নাট্যকলার উন্নতির গুরুত্ব ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিল। নাট্যকলার বিশেষ রঞ্জনের রসস্থান সমাজের প্রাণের হইতে পৃথক থাকিয়া আপনার সম্প্রদায় সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই গুরুত্ব অন্তরায় সহেও বাংলার মধ্যযুগের রঞ্জনের নাট্যকলার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর যে সমাজের চিন্তাধারার উন্নতি দিলিয়া মিশিয়া নিজেদের রসস্থানের প্রোগ্রাম লাভ করিতে
পারিতেন, তাহা হইলে নবযুগের বাংলার রক্ষণ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠতম রঙ্গমণ্ডলের সমক্ষে হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু এ সমস্তে বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের বাংলার চিন্তাধারা এবং জীবনধারার বিকাশে বাংলার এই 'অপাংকীয়' রঙ্গমণ্ডল যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে একথা অঙ্গীকার করা যায় না। আজিকা বাংলায় সকল শক্তির সমাহারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, নবযুগের নাট্যকলার এবং রঙ্গমণ্ডল তাহার মধ্যে অন্য কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা নিকুট নহে।
পঞ্চদশ কথা

রাষ্ট্রীয় ধার্মিকতা ও স্বরেন্দ্রনাথ

বাংলার নবযুগের ইতিহাস আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তাভাষ্য ও চরিত্রে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম ধার্মিকতা ও মানবতার আদর্শকে গড়া। তুলিবার জন্য শায়দ ব্যাপ্তি একটা সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামের নায়করূপেই বাঙ্গালী বিকশ শত বর্ষকাল ধরিয়া। সমগ্র ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তা ও সাধনায় শিক্ষা ও দীক্ষাগুলোর স্বাভাবিক অধিকার করিয়া আছে। সত্য ধার্মিকতার আদর্শ মানুষের সমগ্র জীবন চাহিয়া পড়ে। প্রায় সর্বনিম্নেই এই ধার্মিকতার আদর্শ সর্বপ্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তি-স্ত্রীত্ব ধন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বসন্তের অনুপ্রূতি এবং বেদনা হইতেই ধার্মিকতার লিপ্য স্ফুরিত হয়। আর মানুষ সর্বদাই আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে লড়াইয়া এই সংগ্রামের সূচনা করে।

এক কালে ধর্ম্মই মানুষের জীবনের মূখ্য সাধনা ছিল। আর তখন মানুষ ধর্ম্ম বলিতে পারলোকিক সম্প্রদায় বুঝিত। মুক্তির অর্থ তখন সংসার-বন্ধন বিমোচন ছিল। ইহোকের স্বরূপভেদের ঘাট-প্রতিঘাতে একাক্ত পাই হইয়া। মানবের চিন্তা একটা বদ্ধাত্ত সমতা লাভ করিবার জন্য ব্যাপক হইয়া। ধর্ম্মর অমুসরণ করিত। ধর্ম্ম তখন অনেক কেন্দ্রে বা অধিকাংশ স্থানে পারলোকিক ইটের অগ্রসর করিয়া। পরলোকেই মানুষের নিকটে একমাত্র সাধনা ছিল। পরলোকেই মানুষ ইহোকের স্বর্গে আরোপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থায়কে স্বর্গ ও ঐকান্তিক
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও মুহূর্তনাথ ২৫৭

দ্বিতে নরক নামে অভিহিত করিয়া এই নরক-যন্ত্র হইতে উদ্ধার পাইয়া। স্বর্গকামনায় ধর্ম্মসাধন করিত। আমাদিগের দেশে বহুকাল হইতে জনমগুলো ইহলাকে অভিজ্ঞহীন হইয়া ঐহিত্য সম্পদপূর্ণ বাস ক্রিয়াকলাপ হইয়া মানুষের চিন্তাকে কর্মকে শত বছরে বাঁধিয়াছিল।

প্রবল এবং নিম্নভূতির মধ্যে একটা তুমুল সংঘ্রাম চিরদিন মানুষের জীবনে জাগিয়া আছে। এই সংঘ্রামের মুখে পড়িয়া। অধিকাংশ লোকে ইহলোকের অসুস্থিত ব্যক্তিত্ব পারিত না, অতীশ্বর সম্পদপূর্ণ যে অসুস্থ শান্তি পাওয়া যায়, তাহাতে পাইত না। ইহলোকেও ঘাটিতে পারিত না, পরলোকেও দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারিত না। এইসময় বাহিরে সমাজ-শাসনভূতে তাহারা ধর্মের বহিঃসঞ্চার, অনুসরণ করিলেও অন্তর্ভুক্ত এই ধর্মের বিভক্তদিক আত্মসাত্বর একটা দ্বোঁহীভাব সম্পন্নে গোষ্ঠ করিত। সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে যত্নশীল না একটা সত্য সমস্যার প্রতিষ্ঠা হয়, তত্ত্বজ্ঞ জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভক্ত এই দ্বোঁহীভাব জাগিয়া রহে। মানুষের চরিত্র যাহা কিছু অধ্যায়ীর বা পাপাচরণ দেখিতে পাই, ভিতরের এই নিম্নশ্রম এবং দ্বোঁহিতা হইতে তাহার উৎপত্তি। এই দ্বোঁ ও দ্বোঁহিতা মূলবিত্ত পরিমাণে সকল সমাজেই জাগিয়া রহে। যেখানে বাহিরের ধর্মের শাসন যত কঠিন হয়, সেখানে ভিতরের এই দ্বোঁ ও দ্বোঁহিতা তত তীব্র হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও মধ্যযুগে ইহাই ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশেও মধ্যযুগে ইহাই ঘটিয়াছিল। আর মাঝে মাঝে সাধু ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ নিজ মূলপ্রভাবকে অধিকার করিয়া। সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে একটা সমস্যার চেষ্টায় করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা হইতেই এক-
দিকে বিশ্বকর্মা তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক সাধনা ও অন্যদিকে বামাচারী ও সহজভাবে প্রক্রিয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব হইয়াছিল। তাত্ত্বিক সাধনের ভিতর সর্বদাই প্রক্রিয়ার একটি সমাজভূতিতা জাগিয়াছিল। এই সাধনা মুক্তি-কামনাতেই ঐকাত্মিক নির্ভরটিতের জন্য ভোগঃ এবং প্রবৃত্তির পথে সাধনকে চালাইয়া লইতে চাহিয়াছিল। বৈষ্ণবসাধন মূল্য এবং ভোগ উভয়ই বিষবৎ বর্জন করিয়া। সর্বকালিন বিমূল্য হইয়া। বিশ্বব্যাপী ভগবদ্গীতির প্রক্রিয়া ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়-সকলকে শীতলভ্য সম্পর্কে করিয়া সংসার এবং পরমার্থের মধ্যে একটি উদার ও উচ্চ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। তাত্ত্বিক এ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্মত মহাপুরুষদিগের জীবনে সম্পাদনে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। কিন্তু সাধৃপন লোকে এই মহা সিদ্ধ্রান্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার সংসার এবং পরমার্থের বিষম লক্ষ্যের মুখে পড়িয়া স্ত্রোতন স্ত্রোতন্ত্রে হইয়া রহিল। এই অবস্থায় বাহিরে ভোগের শাসন মানিয়াও ভিতরে ভিতরে লোকে এই শাসনকে মুক্তির সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। বরং এই শাসনবীনে তীব্র বন্ধন-বেদনাই অনুভব করিতে লাগিল। এই অবস্থায় জনসাধারণের অন্তরে ভোগ ও সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা নিঃসৃত স্বাতন্ত্র্য জন্মিয়া উঠিয়া ও তাহার থাকা। অতিরাজ্য। ইংরেজ এদেশে আসিবার পূর্বেই হইতে জনসাধারণের অন্তরে এই স্বাতন্ত্র্য ভর্ষল-বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইল। নৃত্তন ইংরেজী শিখি ও যুরোপীয় সাধনার সাধারণানুকুল স্নাতকতার এবং মানবতার প্রেরণা সাধনের এই প্রচলন স্বাতন্ত্র্য হইতে প্রাক্ত করিয়া তুলে। ইংরেজী-বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাতে ও চরিত্রে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আগাম্যোর ও আকৃষ্টিক নহে। জনসাধারণের মধ্যে তাহার অন্তর্ভুক্ত যে ভাব ব্যাপকতার বিভাজন ছিল, এবং ব্যাপক বলিয়াই যাহার প্রকাশভাবে
তেমন করিয়া প্রকৃত হয় নাই, সেই নিগুঢ় স্নেহীভাবে নূতন ইংরাজী-বরীশদিগের অন্তরে ও আচরণে কেন্দ্রীভূত ও ঘনায়ুভূত হইয়া। প্রকৃত হয়।

কোনও সমাজে কোনও সময়ে জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব প্রচূর না থাকে তাহা কখনও সেই সমাজের মুঠিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে একটা তুমুল ধর্মী, সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের আকারে প্রকৃত হইয়া উঠে না। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে মুঠিমেয় ইংরাজী-বরীশদিগের মধ্যে যে ধর্মী ও সমাজ-দ্রোহিতা জাগিরাই উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের একটা অতি নিগুঢ় যোগ ছিল না, এরূপ কলনা করা যায় না। ফলতঃ এই ধর্মী ও সমাজ-দ্রোহিতাকে ধাতার বিদেশী অনুচিকৃতীর ফলে একটা আগমন ও আকারিক উৎপাদ বলিয়া মনে করেন, তাহদের সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

(২)

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা উল্লেখ-সমাজের ধর্ষের দ্রোহিতা এবং সমাজ-দ্রোহিতা হইতে। ধর্ষে এবং সমাজের বন্দনই তখন মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে পীড়িত করিতেছিল। অনেকাংশ নবযুগের নূতন চিন্তা ও সাধনা সকলের আগে এই বন্দনকেই চেহারা করিতে চাহিয়াছিল। বন্দন-বদনের অনুভূতি হইতেই মুক্তির বাসনা জাগিতে হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে তখনও কোনও তীব্র বন্দন-বদনের অনুভূতি জন্মে নাই বলিয়া। বাংলার নবযুগের ইতিহাসের প্রথম পর্বতায় প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রণয়ন আসে নাই। বরং ইংরাজ আমাদিগের আধুনিক স্বাধীনতা এবং মানবতার আদর্শের দীপকাণ্ড এবং শিক্ষাগুলি হইয়াছিল বলিয়া। ইংরাজের রাষ্ট্রীয় শাসন-বন্দনকে আমরা আমাদিগের কল্যাণের সোপান বলিয়াই একক্ষণ দৃষ্ট।
করিয়া লইয়াছিলাম। (ইংরাজ শাসন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা ভাবিতাম যে আমরা নিরাপদে সমাজ এবং ধর্মের শাসনের ভূমিকা করিতে পারিয়াছিলাম। (হিন্দু রাজা ধাকিলে এমন ভাবে আমরা ধর্ম ও সমাজের জিতনা করিতে পারিত না। ইংরাজের রাষ্ট্রীয় শাসন আমাদিগকে মন্ত্রী ও পরামর্শদের ধর্ম ও সমাজ শাসনের হাত হইতে মুক্তি দান করিয়াছিল। এই শাসনের চায়াতলে হারিয়াই আমরা ব্রাহ্মণের জাতি হইয়াও নির্বিরোধে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার পাইয়াছিলাম। ইংরাজ শাসন রাজ্য হইয়াছিল বলিয়াই আমরা শৈলুক ধর্ম ও পরিতাঙ্গ করিয়াও আমাদিগের দায়িত্বের হইতে বর্জিত হই নাই। ইংরাজ রাজ্যের গুণেই ইংরাজী শিক্ষা ব্রাহ্মণের জাতির লোকেরা বান্ধবদিদের শেষের মধ্যেও আচার্য ও ধর্মোপদেশকের পদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ইংরাজ রাজ্যের পূর্বেও এরূপ হইয়াছিল, সত্য। মুসলমান শাসনদাতাদের ভারতের সকল একটা প্রাক্তন ধর্ম ও সমাজবিন্যাস ঘটিয়াছিল। সেই বিপর্যয়ে বহু পরীক্ষায় মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ শাসন কোথাও বা কোথাও বা প্রায় সর্বত্রই শিক্ষা হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে সকল বিপ্লব লোকের ধর্মান্তর ও সমাজে এতটা ওলটঙ্কালাট করিয়া দেয় নাই। যতটা করিতে পারিয়াছিল তাহাও বিধায়র হাতে রাষ্ট্র-শাসন হাত ছিল বলিয়া। আর মুসলমান অধিকারে ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব ঘটিয়াছিল বলে, কিন্তু ইংরাজধিকারের মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাভাবিক এর এতটা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। মুসলমান-শাসন নিতাংসি স্বৰ্গীয়তাতে ছিল, বিধিতত্ত্ব বা নিয়মতত্ত্ব ছিল না। এই সকল কারণে ইংরাজ আমলের প্রথম অবহ্মান বিদেশী রাষ্ট্রীয় শাসনের বন্দন-বেদনা তেমন তীব্র হইয়া উঠে নাই; জাগ নাই বলিলেও অতুষ্ট্ট হয় না।
কিন্তু স্বাধীনতার প্রবণতা বা মুক্তির বাসনা মানুষের অন্তরে একবার জাগিলে তাহার সমগ্র চিন্তা ও চরিত্রকে অধিকার না করিয়া ছাড়ে না। যে একবার জীবনের কোনও বিভাগে সত্যকার মুক্তির আশ্রাদ পাইয়াছে, সে কোন বিষয়ে কোন প্রকারের বদন সহিতে পারে না। এইজো নবযুগের বাঙ্গালায় ধর্ম ও সমাজের অঙ্গিতার আকারে যে মুক্তি-বাসনা প্রথমে আপনাকে সফল করিতে চাহিয়াছিল, অতি অন্যকিলের মধ্যে তাহ আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের রাষ্ট্র-দোহিতা জাগাইয়াতে। ধর্মশাসন সত্যকার জাতির অন্ধকারের বিজ্ঞান শাসনের ব্যবস্থা একটা বিজ্ঞান শাসনের অধিক হইয়া রহিত, ইহা সম্পর্কে প্রথমে আমাদের আদশ হইব, অথচ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা রাষ্ট্রীয় প্রভূত শক্তির অধীন হইয়া রহিব, ইহা সম্পর্কে প্রথমে আমাদের আদশ হইব, অথচ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা রাষ্ট্রীয় প্রভূত শক্তির অধীন হইয়া রহিব।

ইংরাজীকে আধেশিয়া শাসন কেবল বাঙ্গালী-বাঙ্গালীর আদশেরই প্রথিত করে নাই, আমাদিগের অন্তরে একটা নূতন স্বাধীনতাভিমান বা স্বদেশহিতৈষিতা কিন্তু patriotismএর আদশের জাগাইয়া তুলে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্য-সমাজের জ্ঞাননাভ করিয়া। আমরা মിসের হীনতার বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম।

চাহী ব্যক্তিদেশ অসভ্য জাপান
তাহাও স্বাধীনতার প্রধান
কেবল আমাদিন একটি প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার উল্লরাধিকার হইয়াও পরােজিয় ও হয় হইয়া রহিায়ি হইল। জগতের স্বাধীন দেশের
তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আমাদিন অক্ষরে এক অভিনব বেদনা জগাইয়া তোলে। এই বেদনার ভিতর দিয়াই আমাদিন
আর নামীকরণ জাহাণ সাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় সাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র হয়।
আর বাংলার বন্ধুগরের এই নূতন সাধীনতার স্বতন্ত্রতার স্বাধীনতায় নাম অন্তত প্রধান ধারারুপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

( ৪ )

স্বাধীনতার আজ অগুরবে আজান হইয়া আছেন। কিন্তু তাহার
বর্তমান অর্থায়িতে কেবল বাংলার নেহে সমগ্র ভারতের সাধীন নিয়েআসে, তাহায় পূর্ব কার্য করা পরিমাপেও
মুচ্ছিণ যাইবে না। আমাদিন এই সাধীনতা ও সাধীনতার
আন্দোলনের অন্তত আদিতে স্বাধীনতানাথ। প্রথমে যাবেন দেশের
নব্যশিক্ষিত ও শিক্ষাকৃষ্টি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতার প্রায় অন্তর
শতাব্দী পূর্বে যে রাষ্ট্রীয় সাধীনতার প্রেরণা ঝোঁকাইয়াছিলেন,
তাহাই এক কুটিল পথে পরিচালিত হইয়া। আজিকর প্রবলতর
আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয় সাধীনতার গতিতে স্থায়ি করিয়াছে। আজ
দেশের রাষ্ট্রীয় সাধীনতার সাধনের। প্রবলপরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে
উপহাস করিয়া অন্তরবদনে মূল্যে পর্যাপ্ত বরণ করিতেছেন। দলে
দলে ইংরাজের শাসন-ষষ্ঠকে বিকল করিয়া বা ভাঙ্গিয়া। দিবার জয়
প্রকাশভাবে কোনরী বিচ্যুতি। লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতানাথ এবং
তাহার সহচর এবং অন্যদের। পক্ষায় পূর্বে শুধুই কাটিয়া
নূতন খাত প্রস্তুত করিয়া। যে সাধীনতার পুনর্গ প্রবাহ আনিয়াছিলেন,
তাহা না আমিলে আজ্ঞকর এই প্রবল প্রবাহ সম্ভব হইত না। এই
কথাটি এখন তাল করিয়। মনে রাখ। কর্তব্য। স্বরেন্দ্রনাথের প্রাচীন
কালে তাহার অধুনাতন অপব্যের দ্বারা নষ্ট হইবার নহ। কালগতভাবে
একদিন স্বরেন্দ্রনাথের অপম্যতত্ত্বী প্রভাব দেশের চিত্ত ও চরিত্রের
উপরে প্রভূত হইয়াছিল। কালপ্রবাহের আবার তাহার সে পূর্ববর্গীয় মান হইয়া পড়িয়াছে। “কালোহি বলবত্তী।” কাল আসনার
কর্ম করে, কত ভাইঙ্গ, কত গড়ে। কিছু সর্ববর্গীয় নিরপেক্ষ ইতিহাস
একদিন যাহ। গড়িয়া উঠে, তাহাকে ভুলে ন।; আবার যাহ। ভাঙ্গিয়া
পড়ে তাহাকেও অবিশ্বাসী কৃপণের মতন অঁকড়াইয়। ধরিয়া রহে ন।
কিছু পরমার্থ দৃষ্টিতে ভাঙ্গ। ও গড়া, উত্থান ও পতন, গৌরব ও অগৌরব
উভয়ের সম্বন্ধে বিচার করিয়া উভয়কেই তাহাদের যথাযথে: কালে রক্ষা
করে। নিরপেক্ষ ইতিহাসের চক্ষু নবমুক্ত বাংলার রাজ্য বাপীতা
আন্দোলনের অভিযোগে স্বরেন্দ্রনাথের যে একটা অন্যতম বিশিষ্ট
মান আছে, তাহা কখনও নষ্ট হইবার নহ। সামরি দলালর
প্রেরণায় সমসাময়িক লোকেরা যাহা দেখিয়ে ন। বা দেখিয়ে পাইয়ে
না, মানারের ক্রিয়াকলাপের চরিত্র সাফটা নিরপেক্ষ ইতিহাস সর্ববর্গীয়
তাহা দেখিয়ে এবং উদাসীন জনমণ্ডলের চক্ষু উজ্জল করিয়া তাহ।
ধরিয়া রাখিয়ে।

(৫)

স্বরেন্দ্রনাথ কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া। সিভিল
সার্কিস পরিভাষা দিবার জন্য বিলাত যান। তবু পূর্বে কেবল একজন
মাত্র বাঙ্গালী এই উদ্দেশ্যে বিলাত গিয়াছিলেন। অর্গায় সতোন্দ্রনাথ
ঠাকুর মহাশয় কেবল বাংলার নহ, কিন্তু সামগ্র ভারতবর্ষেরই প্রথম
দেশীয় সিভিলিয়ান হইয়া আসেন। সতেশ্বরনাথের পরে বোধ হয়
বোলিয়ের স্থপদ বাবাজি ঠাকুর ইংরাজ সিভিল সার্কিসে ভর্তি হয়েন।
ইংহার পরে স্বরেশ্বর, রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত এই তিনজন বাঙালী যুবক সিভিলিয়ান হইয়া আসেন। ইংহার তিনজন জনে একসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। স্বরেশ্বর দেশে ফিরিয়া প্রথমে শ্রীহট্টে জারেট্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েন। আমি তখন শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট স্কুলে বিদ্যুত্ত শ্রেণীতে পড়ি। এখানেই স্বরেশ্বরকে আমরা প্রথম দেখি। তখনকার দিনে দেশীয় সিভিলিয়ানের ও ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের মতন স্বাধীনের সামঞ্জস্য হইতে দূরে থাকিতেন। ইংহার ইংরাজী পোষাক পরিয়েন, ইংরাজী ধরে চলাফেরা করিতেন, সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া নিজেদের পদ মর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইংরাজী পোষাক পরিলেই বাঙালী ইংরাজ হইতে পারে না। নবীনচন্দ্র এইজন্য ইংরাজের পরিচ্ছদধারী, ইংরাজের অসুখিকৃত্যপারায়ণ, ইংরাজী শিক্ষিত, বিলাত প্রায়োজ্য বাঙালীকে লাগ্ত করিয়া কহিয়াছিলেন:—

“সিঃহস্তর্ধে তুমি তেছ অপরাধ!“

স্বরেশ্বর শ্রীহট্টে ইংরাজের কেবল অনুকরণ করিয়াই কান্ট ছিলেন না; ইংরাজ সিভিলিয়ানদিগের সঙ্গে সকল বিষয়ে আপনাকে সমান আসেন প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিভিন্ন বাঙালীর এই স্পর্শ বিচেতা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সঙ্গে করা কঠিন হইল। স্বরেশ্বর একদিকে দেশীয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে চাহিলেন না, আপনার অভিনব পদদেশে বিভূত হইয়া। তিনি স্বাধীনের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিতে চাহিলেন না, অন্যদিকে স্নায়ী ইংরাজ সমাজেও আপনার শিক্ষা ও পদের যোগ্য আসন পাইলেন না। তাহার দ্বারাকাঙ্ক্ষা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অসুখিয় জাগাইয়া তুলিল। সাদার্লায় তখন শ্রীহট্টের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমি তখন বালক বলিলেও হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিদ্যাবৃদ্ধির বিচার করিবার অধিকার খশে
নাই। তবে বালক হইলেও তাহার বিশাল বপু আমাদিগের অন্তরে যে “হাস্য-অনুর-করণ-রূপ” রঘূর উদ্রেক করিত সে কথা এখনও মনে আছে। গুণিন্ত্যক্ষাকে তাহার জগৎ এজলাসে নুতন আসন প্রস্তুত করিয়া হইয়াছিল। পূর্ববর্তী মাজিস্ট্রেটদিগের সংকীর্ণায়তন অসন তাহার বিশাল বপুকে ধারণ করিতে পারে নাই। একটা আসন বিলাতী কুমড়া না হইলে নাকি তাহার উদরপূর্তি হইত না। সাদার-ল্যাঙ্গ সাহেবের সঙ্গে অলিদের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের খাটাখটী বাধিয়া যায়। এই অপেক্ষাকৃত অপরিণতবয়স্ক বঙ্গজায়িত সিভিলিয়ানের ধুস্কার্ণ ইঁরাজ মাজিস্ট্রেটের অসহ হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহি সুরেন্দ্রনাথের সম্ম ক্রোট খুঁজিতে আরম্ভ করেন। সুরেন্দ্রনাথের এজলাসের বঙ্গজায়িত আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মাজিস্ট্রেটের অন্যুগ্রহ লাভের লোভে তাহার বিরুদ্ধে গোপনে সত্যমিথা নানা প্রকারের অভিযোগ পেশ করিতে লাগিল। এইরূপে মাজিস্ট্রেট সাহেব সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা বেশ শত্রুতাপূর্ণ পাকাইয়া তুলিলেন। ক্রমে সুরেন্দ্রনাথের এজলাসের নথিতে ছুটিএকটা গুরুতর ভূল বাহির হইয়া পড়িল। একটা মামলায় ফরিয়াদী ও তাহার সাহায্যকারী আদালতে হাজির থাকা সম্ভব মামল। তাহার হাজির নাই বলিয়া খারিজ হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ মোকদ্দমার নথিতে এই কথা লিখিয়া দেন। যতদুর মনে পড়ে ইহাই তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগেই তাহার কর্ম যায়। একদিকে অভিযোগ শুধু সন্দেহ নাই। কোনও ধর্মাধিকৃত করণের ধর্মাত্মার বিচারকের গঙ্গে একপ মিথা। কথা নথিবুক্ত করা কিছুতে মাজ্জনীয় নহে। কিন্তু এ সকল প্রয়োগ সকল আদালতেই বিচারকদিগকে তাহার পেশকারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। পেশকারের উপরে সবরপাই ছোঁ রাখিয়া হয় ইহাও সত্য। কিন্তু বিচারক যতই কেন সতর্ক হইয়া চলুন না, পেশকার যে
মাঝে মাঝে তাহার চক্ষুতে ধূলি দিয়া। তাহার ঘায়া। এ সকল কাজ করাইতে পারে না, এমনও বলা যায় না। স্বরেন্দ্রনাথ যে জ্ঞানিয়া শুনিয়া এক করিয়াছিলেন, এ কথা তখনও কেহ কহে নাই। এদেশের লোকে কোনওদিনই তাহা বিশ্বাসও করে নাই। ঘর খাইয়া জ্ঞানিয়া শুনিয়া কোনও বিচারকের পক্ষে এইরূপ মিথ্যা। নথি প্রস্তুত করা অসম্ভব; স্বরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার শত্রুরাও কোনওদিন এরূপ ইঙ্গিত করিতে সাহস পান নাই। তাহার পেশকারও এইজন্য দণ্ডিত হইয়াছিল। স্বরুন্ত পেশকারের দোষেই যে এটা হইয়াছিল, গভর্নমেন্টও ইহা। অতীকার করিতে পারেন নাই। এ সে কেন এই সামাজিক অনাবধানতার জন্য স্বরেন্দ্রনাথ কুরুপনয় কলকাতার বোঝা মাঝায় লইয়া রাজকর্ম হইতে অপসর্গ হয়েন। ইহা তাহার নিজের পক্ষে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ভালই হইয়াছিল। প্রথমতঃ এই যা না পাইলে স্বরেন্দ্রনাথের বিদেশের মোহ কাটিত কি না সন্দেহ। তিনি সাহেব চিফ রাজকর্মে উন্নতীর্থের উন্নতি লাভ করিয়া। বিদেশী আমল প্রস্তর অধিভূত থাকিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত কেবল রাজসেবাই করিয়া যাইতেন, দেশ/সেবার অধুন ও মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেন না।

( ৬ )

কষ্টচূত হইয়া স্বরেন্দ্রনাথ বিলাতে আপনি করিতে যান। বিলাত হইতে ব্যর্থমনোর্ধ হইয়া বোধ হয় ১৮৭৫ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। তাহার পিতৃপুত্র বিভাগীয় মহাশয় অনুদিন পূর্বে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্বরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া। এই ইন্সটিটিউশনে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতেই স্বরেন্দ্রনাথের নবজীবন আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে তিনি দেশ-
সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনার আলোকসামান্য বাণিজ্য প্রভাবে দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষনীয় নব্যুক্ত সমাজে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নূতন প্রেরণা সঞ্চার করিয়া। আমাদিগের বর্তমান রাষ্ট্রীয় সাধনার উদ্ধৃত্ত করেন। নব্যুক্ত ইতিহাসে এই সুচেই সুরেন্দ্রনাথ আপনার অনন্য-প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।
ষোড়শ কথা

সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন

বাংলার নবযুগের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ যে অন্যতম প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, আনন্দমোহন বস্তু মহাশয় তাহ পান নাই, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু আনন্দমোহন বস্তুর সাহচর্য না পাইলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে যে কাজটা করিয়াছিলেন, কিছু তাহা করিতে পারিতেন না, ইহাও অতি সত্য। আনন্দমোহন একটি সর্ববিশ্বাসী বৈধিনতার আদর্শক ধরিয়া আপনার দেশের আধুনিক ধর্মকর্মকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া প্রেসটাইড-রায়চৌধুরী বৃন্দারী পাইয়া আনন্দমোহন বোধ হয় ১৮৭০ বি. ১৮৭১ ইংরাজীতে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার পূর্বে নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ভ্রাতাসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকটে প্রকাশভারে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইতেন। সেকালের ব্রাহ্মণ অতিশয় সত্যবাদী এবং সংযতভ্রমের ছিলেন। আনন্দমোহনের চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেকালে বাঙালি বিলাত যাত্রা তাহাদের প্রায় সকলই বিলাতী ভোগবিলাসের ভ্রমে হাল ছাড়িয়া ঝাপাইয়া পাগড়িতেন। কিন্তু আনন্দমোহন সমক্ষে কেহ কোন দিন এককল বিষয়ে করাদিপূর্বক পরিমাণ অসংখ্য অভিযোগ তাহা পারে নাই। আনন্দমোহন বিলাত যাত্রা কখন সুরা স্পর্শ করেন নাই। এসম কি, তামাকু পর্যায়ে বজ্ঞান করিয়া চলিয়াছিলেন। আনন্দমোহনের কাঠার ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৌতুক-হৃদ সমুদ্র নীচে স্নান করিয়া হাসিয়াছিলেন।
তাহাকে “সাধু আনন্দমোহন” বা Saint Ananda Mohan বলিয়া ডাকিতেন। আনন্দমোহন কেশবিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ‘রংলার’ হয়েন। তাহার পূর্বে কোন ভারতবাসী এই বৈষ্ণবীয় লাভ করেন নাই। যেমন পড়াশুনায়, সেইরূপ আপনার মিশ্র চরিত্র-গুণেও আনন্দমোহন সেকলের কেশবিজ সমাজে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন কেশবিজ ছাড়িয়া আসিবার প্রায় পঁচিশ বছর পরেও কেশবিজে যাইয়া লোকমুখে তাহার কথা শুনিয়াছি। কেশবিজ তখনও তাহার স্মৃতি একবারে ভুলিয়া যায় নাই। তিনি যে ঘটিতে থাকিয়া, পঁচিশ ছাবিশ বছর পূর্বেও (১৮৯৯-১৯০০) তাহার কলেজের গৃহরক্ষীরা (caretakers) সে ঘরখানিকে আনন্দমোহনের ঘর বলিয়া বাঙালী দর্শকদিগকে দেখাইয়া দিত। একদিকে কেশবিজের সর্বোচ্চ সমান লাভ করিয়া অন্যদিকে ব্যারিস্টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া। আনন্দমোহন বোধ হয় ১৮৭৫ কি '৭৬ ইংরাজীতে দেশে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতা বিশ্ব- বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্টার হইতে এম, এ, পর্যায়ে সকল পরীক্ষাতেই যত্ন্দূর্মনে পড়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া। তিনি বিলাত যায়।

সেখানেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এই কারণে তাহার বিশারদবৃদ্ধির খ্যাতি দেশময় বাপিরিয়া পড়ে। কিন্তু বিশারদ অপেক্ষা তাহার বিশ্বস্ত চরিত্রের খ্যাতির আরও বেশী ছিল। সেকলের কোন বিলাত-ফেরত বাঙালী আনন্দমোহনের মত্ত দেশের লোকের এমন অকৃতিম শ্রদ্ধা লাভ করেন নাই; স্বরেশ্বরনাথও নহেন, অন্য কেহও নহেন। বিশেষতঃ ইংরাজ আমল-তম স্বরেশ্বরনাথের চরিত্রে যে কালিমা মাখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেশের লোকের চক্ষে একবারে নিশ্চিত হইয়া মুছিয়া যায় নাই। তখনও লোকে প্রাণ-খুলিয়া
নবযুগের বাংলা

স্বর্ণেরনাথকে লোভভাবকি করিতে পারে নাই। এ অবস্থায় স্বর্ণেরনাথের পক্ষে কেবল অলোকসামান্য বাণিজ্যিক প্রভাবে লোকনায়কত্ব লাভ করা সত্বর ছিল না। আনন্দমোহনের বিশ্বাস চরিত্রের সঙ্গে স্বর্ণেরনাথের প্রতিভা মিলিত হইয়াই বাঙালি নবযুগের ইতিহাসে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্র-কর্মের সূচনা করে। একা স্বর্ণেরনাথ দেশে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আদর্শকে এমন ভাবে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেন না। আনন্দমোহনের পক্ষেও একেলা একাকী করা অসাধ্য ছিল। ইহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আধুনিক গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সাধনার প্রতিষ্ঠা করেন।

( ২)

আনন্দমোহনের স্বাধীনতার আদর্শ স্বর্ণেরনাথের আদর্শ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পূর্ণতর ছিল। আনন্দমোহনের মধ্যে যে অতিন্দিরের অমৃতুত্তি ছিল, স্বর্ণেরনাথের তাহা ছিল না। আনন্দমোহনের idealism কিন্তু আধুনিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ স্বর্ণেরনাথের চিন্তাকে কখনও অধিকার করে নাই, স্পষ্ট করিয়াছিল কি না সংক্ষেপে। স্বর্ণেরনাথ সর্বদাই সুবিধাবাদী ছিলেন। কোন কথার সর্বদাই ব্যবহার করিতেছি না। ইতরাজীতে যাহাকে expediency রাখে, এখানে আমি তাহাকেই সুবিধাবাদ কহিতেছি। এই expediency বা সুবিধাবাদই পলিটিকশায়ান বা রাষ্ট্রকর্মীদের জীবনের মূলসূত্র। রাষ্ট্রকর্মীরা কোন সনাতন আদর্শের বড় ধার ধারেন না। আসম কাজটা কি করিয়া হাসিল হইবে তাহারই দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। এই কারণে আশু ফললিপ্ত রাষ্ট্র-কর্মীদের মধ্যে কোন প্রকারের সনাতন আদর্শের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা নিষ্ঠা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সনাতন
আদর্শের প্রতি অমুরাগ এবং নিষ্ঠাকেই ইংরাজীতে idealism কহে। আর এ কথা অধ্যুক্ত করা। অন্যতম যে স্ত্রীমন্ত্রের মধ্যে কোন দিন এই idealism ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। স্ত্রীমন্ত্র আপনার অলৌকিক বাঙ্গালা প্রভাবে দেশের কোষালমতি যুবক দলকে মাতাইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার বৈশ্বিক ইতিহাসে যেমন শোনা যায়—

‘নিমাই আপনি পত্রিয়া বলে সামালিও ভাই’

—স্ত্রীমন্ত্র কোন দিন এমনিভাবে আপনি পত্রিয়া অপরকে সামলাইয়ে কহেন নাই। তিনি দেশকে নাচাইয়াছেন, নিজে নাচেন নাই। দেশকে স্বাধীনতা-যজ্ঞে ঝাপাইয়া পড়িতে প্রণোদিত করিয়াছেনএ ই আমের ঝাপাইয়া গড়ে নাই। তাহার নিন্দা করিবার জন্য এ কথা কবিতায় না। বিদায়। তাহার প্রভাক্ত ফললিপি, রাষ্ট্রক্ষম্যী করিয়াই গড়িয়াছিলেন, ভারুক অপ্রভাক্ত আদর্শের অমুরাগী করিয়া গড়ে নাই। স্ত্রীমন্ত্র যদি রাষ্ট্রবিদ্যী না হইয়া ফললিপি বিচার-বিবর্ণিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি যে কাজটা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন কি না তাহা কে বলিবে? অন্য দিকে বাঙ্গালী জাতীয় চিনিদিনই ভাবুকের জাত। আদর্শের স্বাদ। না পাইলে বাঙ্গালী কোন দিন আমৃতার্থ হইয়া কর্মের পথে ধাবিত হয় নাই। ভ্যারভার্জের অমু জাতিরা প্রত্যাক্ষবাদী বা practical, এ কথা সকলকেই জানেন ও মানেন। বাঙ্গালীর মতন তাহা সূক্ষ্ম কার্য্যে জানেন না; নবযুবায়েরও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। বাঙ্গালীর স্বামী তাহার। ভাবপ্রবণ নন। বাঙ্লার ভক্ষ্যাদিত ভারতের অমু কোন প্রদেশে সৃষ্টি উঠে নাই। এই ভাবপ্রবণতা বা idealism বাঙ্গালীর ছাড় হাড়ে ছুড়িয়া আছে। স্ত্রীমন্ত্র আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত
ব্যাখ্যা কেবল স্বরাজ্যনাথের প্রত্যক্ষ ফলপ্রস্ফুট রাষ্ট্রকর্মের আহ্বানে মাত্রিক উঠিতেন না। স্বরাজ্যনাথের যাহা ছিল না, অনন্দমোহনের তাহা ছিল। অনন্দমোহনের নিকৃত চরিত্রের খ্যাতি ছিল; অনন্দমোহনের মধ্যে একটি সর্বসংগঠন ক্ষেত্রের আদর্শের প্রেরণা ছিল। অনন্দমোহনের আর কিছু তীব্র-হৃদয়বলতা থাকুক না কেন, একটা ভাববুদ্ধি বা idealism ছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আর অনন্দমোহনের এই idealismএর সঙ্গে স্বরাজ্যনাথের practical politics এবং অসাধারণ বাদ্যিত্ব মিলিত হইয়াই আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূচনা করে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে স্বরাজ্যনাথ এবং অনন্দমোহনকে পৃথক করা যায় না।

( ৩ )

সিভিল সার্ভিস কর্মচারী হইয়া স্বরাজ্যনাথ ভারত সরকারের এই অবিচারের বিরুদ্ধে আপনী কর্তব্য বিলাত গমন করেন। তাহর প্রতি যে গুরুতর অবিচার হইয়াছিল, এবিষয়ে সনদেহ নাই। স্বরাজ্যনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়, তাহা অক্ষর অক্ষরে সত্য হইলেও ইহার দ্বারা তাহার অনবধানতাই প্রমাণিত হয়, তাহার অসাধুতা বা দোষাবহ অক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। স্বরাজ্যনাথের প্রকৃত অপরাধ তাহার জীবন ও বর্ণ ইংরাজ সিভিলিয়ান একরূপ অপরাধে কখনই এমনভাবে দণ্ডিত হইতেন না। হাতে হাতে আলাদাম মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বরাজ্যনাথের পদচ্যুতির আলাদাম মধ্যেই রংপুরের ইংরাজ সিভিলিয়ান জঙ্গের বিরুদ্ধে ইহ অপেক্ষা শতরােণ গুরুতর অভিযোগ আসে। এই জঙ্গ, সাহেবের নাম, যতটা মনে পড়ে, বোধ হয় লেভিন ছিল। ইনি প্রায়ই আপনার আদালতের পেশকারকে দিয়া মোক্ষদামর রায়
লিখাত্মক লইতেন। ঈহার অন্তরালে কেবল জন্ম সাহেবের আলোচনা এবং আইন-কানুন সম্বন্ধে অমজনিত অনুভূতি ব্যতীত আরও কিছু ছিল কিনা বলা কঠিন। কিন্তু তিনি যে নিজের হাতে সকল মোকদ্দমার রায় লিখিতেন না, একটা প্রমাণ হইয়াছিল। কিন্তু এই গুরুত্ব অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াও এই ইংরাজি জবাবের যে দণ্ড হইত তাহা স্বরূপান্তরের প্রতি যে দণ্ড বিহিত হইয়াছিল তাহার তুলনায় অকিংবফর। স্বরূপান্তরের কর্মশীলতা করিয়া ইংরাজ সরকার মাসিক ৫০০ পেনসন বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লেভিন সাহেবের জন্মপত্র যাওয়া ছাড়া একবারে পাঠ্য হইয়াছিল কিন্তু মনে পড়েন না। অন্যতঃ হইল যাকিলেও তিনি যে মোট পেনসন লইয়া রাজকার্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হন, একথা ঠিক। লেভিন সাহেবের মোকদ্দমার স্বরূপান্তরের প্রতি অবিচার যে কঠোর গুরুত্ব হইয়াছিল ইহু বুঝা যায়। এরূপ গুরুত্ব অবিচারের এদেশের ইংরাজ আমলাতন্ত্র করিতে পারেন, তখন আমাদের এই সংস্কার জমিয়াছিল। কিন্তু আলেহী বিলাতী ইংরাজের। এরূপ অবিচারের সমর্থন করিবেন, ইংরাজী সাহায্য ইহ বিভাগ করিতে পারিতেন না। ইংরাজের উপরে এড়া শ্রদ্ধা তখনও ছিল বলিয়াই স্বরূপান্তর অনেক অর্থায় করিয়া বিলাতে আমিল করিতে যান। সে আমিল যখন নামনাল হইল, তখন স্বরূপান্তরের এবং তাহার সাহায্যকারী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরে ইংরাজ-চরিত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা একবারেই নষ্ট হইয়া গেল। যে স্বরূপান্তর ইংরাজকে জীবনের আদর্শ করিয়া প্রথম যৌবনে ইংরাজ সাহিত্য জীবনের চরম সাহসিক লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই স্বরূপান্তরই এখন এক অভিনব শ্রাক্ততা-ভিভাষার প্রেরণায় দেশবাসীকে দেশচর্চা-ভ্রমে দীক্ষিত করিবার জন্য
বঙ্গপরিকর হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বোধ হয় অনন্তমোহনের
eক সঙ্গেই এবং বিফলমনোরণ হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া
আসেন। অন্ততঃ এক সঙ্গে না অসিলেও অল্পদিন অগ্রণীতে
ধ্বংসে আসিয়া কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসগর মহাশয়ের
মেট্রোপলিটান ইল্লিউসনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন, এবং
অনন্তমোহন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ
করেন।

( ৪ )

অনন্তমোহন কলিকাতা এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে অসাধারণ
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, আইন-ব্যবসায় সে প্রতিষ্ঠা লাভ
করেন নাই। সে শক্তি তাহার ছিল কি না বলা কঠিন। তবে
যেদিন সর্ব প্রথমে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে একটা কঠিন
মামলায় সওয়াল-জবাব করিতে দণ্ডায়মান হন, সেদিন জঙ্গ
এবং এটি সকলেই তাহার রুখমন্ত্র, বাক্সপুটা এবং ব্যবহারশাস্ত্র-কুশলতা
দেবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; এবং কেহ কেহ এরূপ ভাবিয়াছিলেন
যে অনভিবিলেন আনন্দমোহন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার মহলে
সর্বোচ্চ প্রান্ত অধিকার করিবেন। আনন্দমোহন তাহা করিতে
পারেন নাই। আরইহার একটা প্রধান কারণ এই যে আনন্দমোহন
কোন দিন ব্যারিস্টারি ব্যবসায়কে জীবনের উহাকে ব্যক্তি গ্রহণ
করেন নাই। সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য একরূপ আপাতদৃষ্টিতেই
তিনি আইন ব্যবসায় অপলব্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অন্তরের
ঝুঁক ছিল লোকের এবং দৈশেবার প্রতি। উমেশচন্দ্র,
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আনন্দমোহনকে 'সাধু আনন্দমোহন' বলিয়া
ডাকিয়েন; পাঠী আনন্দমোহন বলিয়ে বোধ হয় তাহার চরিত্রের
মূল সূত্রটি ভাল করিয়া প্রকাশিত হইত। আনন্দমোহন নিজে অন্যান্যরা হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার ব্রত গঠন করেন নাই। কিন্তু অনেক-বার তিনি বুঝি ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া ধর্ম্ম-প্রচার কর্যে ঝাপাইয়া পড়েন, তাহার বন্ধুবান্ধবেরা এরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের এ আশা পূর্ণ না হইলেও একথা সত্য যে আনন্দমোহন কেন দিন আইন ব্যবসায়ে আপনার সুমধুর সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন নাই। যতটা সম্ভব সময় ও শক্তি বায় করিয়া যতটা বেশী অর্থ উপার্জন করা যাইতে পারে সেই দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল। এইরূপে জীবনরক্ষণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় ও শক্তি ব্যবহার প্রচারে এবং লোকসেবাতে উৎসর্গ করিবার জন্য আনন্দমোহন সর্বদাই লালায়ত ছিলেন। ব্যারিস্টারি জমাইতে হইলে হাইকোর্টে অঁকড়াইয়া ধর্ম্ম পড়িয়া থাকিতে হয়। আসলি মামলায় (original sideএ) পশার জমাইতে না পারিলে কলিকাতার হাইকোর্টে বড় ব্যারিস্টার হওয়া যায় না। এই পশার জমাইতে হইলে যেভাবে যতটা পরিশ্রম করিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হয়, আনন্দমোহনের সে দৈর্ঘ্য ও আমৃত্সর্বিচ্ছেদ ছিল না। আর ছিল না এই জন্য যে নিজের ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর গভীর অমুকাগও ছিল না। আইনের সুক্ষ্ম তথ্য নিকটস্থের তিনি বোধ হয় কোন দিন বিচারের আনন্দ বোধ করেন নাই। তাঁর জীবনের আদেশের উৎস ছিল ব্যাখ্যাতার সাধনাতে। পরিবারে, সমাজে, রাজ্যে—সর্বত্র সর্বাধিক স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি লোকের ব্যাপ্তি দেখিবার জন্য আনন্দ-মোহনের অন্তর আঘোষ লালায়ত ছিল। এই স্বাধীনতার আদর্শের প্রদর্শনে তিনি স্বর্জননাথের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাক্ষ বৎসর পূর্বের বাংলার ইন্দোরী নবীনচিত্রের নূতন ও উদার রাষ্ট্রকর্মের দৌড়াওয়ার ও শিখাওয়ার হইয়া দূর্দায়মান হন।

৩৫
অনন্দমোহন বিলাত হইতে অসিবার সময় বোম্বাই সহরের
শিক্ষিত ও শিক্ষকার্য। মিলিত হইয়া কি ভাবে দেশে একটা নূতন শক্তি
জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া আসেন। বোম্বাইয়ে
তখন একটা নূতন ছাত্র মণ্ডলী—Student Movement—গড়িয়া
উঠিতেছিল। ঠিক বলিতে পারিলাম না, কিন্তু আমার মনে হয় যে
এই নূতন আন্দোলন হইতেই তথ্যে তথ্যে দাঙ্গাধার শিক্ষা সমাজের
বা Deccan Education Society’র জন্য হয়। এই সমাজই
দাঙ্গাধার আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা করেন। লোকমান্ত
তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোকুলে প্রভুতি দক্ষিণাত্যের ভারত-প্রাপ্তি
লোকনয়কেরা এই শিক্ষা-সমাজ হইতেই নিজেদের দেশে বের হইতে
দাঙ্গাধার করেন। রাণাড়ে, চিল্পন্কর, নামহোশি প্রভৃতি বোম্বাইয়ের
এই ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে পরোক্ষভাবে কিন্তু অপরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট
ছিলেন। অনন্দমোহন বিলাত হইতে দেশে নিরবার পথে বোম্বাইয়ের
এই ছাত্রমণ্ডলীর কিছু কিছু পরিচয় লাভ করিয়া আসেন। কলিকাতায়
অসিয়াই স্ক্রেন্টনাথের সঙ্গে মিলিয়া তিনি এখানে একটা অনুরূপ
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া। তুলিতে চাহেন। এইভাবে ১৮৭৫ সালের শেষাংশের
কিন্তে '৭৬ সালের প্রথমে কলিকাতা ছাত্রগুলো—Calcutta
Students’ Association’র প্রতিষ্ঠা হয়। এই ছাত্রগুলোকে
আশ্রয় করিয়াই স্ক্রেন্টনাথ এবং অনন্দমোহন উভয়েই নিজেদের
নূতন রাষ্ট্র-কর্মকে দেশের মধ্যে গড়িয়া তুলেন।
কলিকাতার ছাত্রগুলোর সভাপতি ছিলেন অনন্দমোহন, সহকারী
সভাপতি ছিলেন স্ক্রেন্টনাথ; আর প্রথম সম্পাদক ছিলেন নন্দকৃষ্ণ
বসু মহাশয়। নন্দকৃষ্ণ বসু সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উচ্চতম রত্ন ছিলেন। বৌধ হয় আনন্দমোহনের মতন তিনিও প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এম, এ, পর্যাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশক পরীক্ষাতেই সর্বমোচ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ছাত্র-মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাকালে কিছু তাহার আলাদিন পরে নন্দকুঞ্জ প্রেসটাইড রায়চাদ বুঝি লাভ করেন। কলিকাতার অদানীষ্ঠন ছাত্রমণ্ডল নন্দ-কুঞ্জের অন্তর্গত বিভাগীয় প্রতিষ্ঠা ছিল। ছাত্রজীবন তখনও সজ্জবদ্ধ হয় নাই; নতুন নন্দকুঞ্জ সমসাময়িক শিক্ষার্থী যুবক-মণ্ডলীর নায়করূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়েন। সুরেন্দ্রনাথ এবং আনন্দমোহন তাহাদের নৃতন কর্ম-প্রতিষ্ঠান গড়িয়ে যাইয়। নন্দকুঞ্জে এই ছাত্রমণ্ডলীর সম্পাদকের পদে বরণ করেন। এই কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলীকে অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেমন সেকালের শিক্ষাবীষ্ণু বাঙ্গালীদের রাজ্যী জীবন গড়িয়ে তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ছাত্রমণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথের এবং আনন্দমোহনের রাষ্ট্রীয়করণ গড়িয়ে তুলিয়াছিল।

((৬))

এই কলিকাতা ছাত্রমণ্ডলী বা Students’ Association-এর রঙ্গমণ্ডলের সর্বপ্রথমে সুরেন্দ্রনাথের অগ্রধারণ বাংলা প্রতিষ্ঠা প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু স্কুলের একটি গ্যালারী ছিল, এখন সেটা আছে কিনা জানি না। বর্তমান সংঘর্ষ কলেজের পশ্চিমের ঘরে এই গ্যালারিটা ছিল। এখানেই কলিকাতা Students’ Association-এর সভা হইত। তখনও সরকারী স্কুল কলেজে রাষ্ট্রীয়তার আলোচনা বহ্ন হয় নাই। এই রঙ্গমণ্ডলে সুরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে আপনার অলোকসামান্য বাগ্বিভূতি বিষয়ের কনিষ্ঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার প্রথম বক্তৃতার কথা এখনও যেন আছে। বিষয় ছিল— "Rise of the Sikh Power in India"; ঐৰী পূৰ্বে ইংরাজী-
নবীক বাঙ্গালী রাষ্ট্রীয় বিষয়ে এমন বক্তৃতা শুনে নাই। আজ শিক্ষার বলিদানের” কাহিনী বাঙ্গালার অন্তর্গতেও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চ বৎসর পূর্বে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ও স্বদেশের আধুনিক ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রেরণা অনুভব করেন নাই। রজ্জী সিংহের নাম জানি থাকিলেও, তেহ বাহাদুর ও তােহার—শির দিয়া শীরে নোহি দিয়া—অর্থাৎ মাথা দিলাম বটে ধর্ষ্য দিলাম না—এই অসাধারণ তাগের কথা কেহই প্রায় জানিতেন না বলিলেও হয়। গুরু গোবিন্দের নাম তখন আমাদের মধ্যে অপরিণাত ছিল। সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে শিক্ষার ইতিহাসের প্রাণের দিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আমাদের নিজেদেরে উপস্থিত করেন। তাহার এই প্রথম বক্তৃতাতিকে কলিকাতার গোস্বামীরা চারিদিকে ঘন ঘন করতালি ধরিয়ে বহিরাকাশে যেয়ে একটা বড় উঠিয়াছিল, সেইগুলো কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাতামণ্ডুলী অন্তরেও একটা অভূতপূর্ব ভাবের বহু চুটিয়াছিল।

কহিয়াছি যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া, নাট্যকলা ও রঞ্জনকের মাধ্যমে ও ইংরাজদের শিক্ষ। দীঘীর ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে গভীরগত ধর্ষ্যের ধৃঢ়তার এবং সমাজরূপ বিদ্যার দিয়া নবাশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা অভিবত্ত স্বাধীনতার প্রেরণা এবং স্বাধীনতার ভাস্করের উত্থান, সুরেন্দ্রনাথ তাহাকেই রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে ফুটিয়া তুলেন, প্রাচীনের প্রেরণাকে অধুনাতন রাষ্ট্রীয় জীবনে জাগাইয়া তুলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ‘ভারতের জয়’ গাহিতে যাইয়া পূর্বারণা কৌতূহল কাহিনীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহাতে নূতন স্বাধীনতার ভবানীকে মাত্র ফুটিয়া উঠিয়েছিল। কল্যাণী তখন আমাদের স্বদেশের অভ্যন্তরে ছিল। তীর্থ, জ্যোৎ, কর্ণস্তুপ প্রভৃতি স্মরণাত্মীয় অভ্যন্তর প্রতিপাড়িনি মাত্র আনিতেন। কিন্তু
সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন

২৭৯

ঈদানীত্যন্ত কালেও যে ভারতে অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ভারত মহাকাব্যের আদর্শ যে আধুনিক ইতিহাসেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল, একথা অনেকেই জানিতেন না। সুরেন্দ্রনাথের এই প্রথম বক্তৃতা। আমাদের কল্পনাকে বাস্তব রাজ্যে আনিয়া ফেলিল। ইংরাজ শক্তি যে অপরাজেয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে এই ধারণাই জমিয়াছিল। ইংরাজ অন্যান্য সংগলনে ভারতবর্ষে আপনার অনন্ত প্রতিম্নী প্রভু-শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেকালের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনে এই ধারণাই ছিল; শিক্ষের শৌর্য্য-বীর্যের নিকটে ইংরাজের শৌর্য্য-বীর্য যে বারবার পরাভূত হইয়া বিরাজ করিয়াছে, একথা ভাল করিয়া আমরা জানিতাম না। ইংরাজের ইতিহাসে যেখানে ইংরাজ বেদম হারিয়া গিয়াছে তাহার কথা জয়পরাজিয় ঠিক হয় নাই এই ভাবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সত্যরাত্রে শিক্ষার শক্তি যে কত দূর্দৰ্শ ছিল, একথা আমরার ভাল করিয়া জানিতাম না। সুরেন্দ্রনাথ নিজে মৌলিক গবেষণার সাহায্যে একক তথ্যে পৌঁছে নাই, ইহা সত্য। ম্যালকলম প্রভুতি ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা একক তথ্যে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সেকালে স্কুল-কলেজে ভারতের যে ইতিহাস পড়িতাম তাহাতে একক সাংঘাতিক সত্যের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। এই জন্য সুরেন্দ্রনাথের “Rise of the Sikh Power” বিষয়ক বক্তৃতা যুগপৎ আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেয় এবং স্বাজাত্যাভিমানকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দূর্দৰ্শ প্রতিষ্ঠা করে। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা বাঙ্গালার নব্যুগের ইতিহাসে এক স্বরূপী ঘটন। সেই দিন হইতেই নব্যুগের বাঙ্গালার ইতিহাসে নূতন রাষ্ট্রক্ষমের এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়।

( ৭ )

সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে আমাদের নূতন স্বদেশাভিমান, কহিয়াছি,
প্রাচীনের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। মহাভারতেই আমাদিগের প্রাচীন শৌর্যবীর্যের কাহিনী দ্বারা আমরা যে হুনিয়ায় একদিন একটা বড় জাতি বা nation ছিলাম এই ভাবটা আমাদের ভিতরে জাগাইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের—

গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ও অন্যান্য সঙ্গীত ভৈষ্ণ, দ্রোণ, কর্ণ, অর্জুন প্রভৃতির অলক্ষসামায় ক্ষত্রিয়ের কার্যের ফলে গাহিয়া আমাদিগের শর্দুলাভিমানকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। রঙ্গলাল রাজপুত ইতিহাসের বীরকৃত্তি গাহিয়া আমাদিগের নূতন শ্রদ্ধাপ্রেমকে উদ্ধৃত্ত করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আকারে ইহাতে আমাদের বর্তমান হীনতার ছবি ফুটাইয়া তুলিয়া অম্বিকাদের আমাদিগের এই নূতন দেশপ্রেরিতকে জাগাইয়াছিলেন।

কিন্তু ইহারা কেহই খোলাখুলিভাবে প্রাচ্য ইতিহাসের ভিত্তির উপরে দেশনাত্তোকর মন্দির গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। এই কারণে স্বরেন্দ্রনাথী প্রথমে আরম্ভ করেন এবং শিখ খালসার উৎপত্তি ও অভ্যাসের কাহিনী বিবৃত করিয়া ভারতের ক্ষত্রিয়ায়ে যে ইন্ডিয়া কানেও অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে এই সিদ্ধান্ত আমাদিগের মধ্যে প্রাচীন করেন। গুরু তেজ বাণচ্ছ এবং গুরু গৌরিন্দের কথা প্রাচীন না হইলেও পুরাতন বটে। কিন্তু চিলিয়নওয়ালা ও গুরুচ্চারের যুগ এই সেইদিন হইয়াছিল বলিলেও চলে। এই সকল লড়াই প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ প্রভু-শক্তির সঙ্গেই হইয়াছিল। ভারত-বিজয়া ইংরাজকে মুক্তিযোগ্য শিখ-সেনা করিয়া সমস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, শিখের ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মুক্তির লেখার্থে সাহেবের ইতিহাসে শিখদের সঙ্গে ইংরাজের যে সকল লড়াই হইয়াছিল, তাহার কথা।
আমরা পড়িয়াছিলাম বটে। শিখ খালসার উৎপত্তির বিবরণের মোটামুটি জানা ছিল। কিন্তু তাহার অন্তরালে যে কত বড় স্বজাতি-বাঙ্গালোর প্রতিষ্ঠা ছিল, একথা ইংরাজ লেখক নিজেও বোধ হয় জানিতেন না, অথবা জানিলেও আমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। আর এ কথা পূর্বেই কহিয়াছি যে আধুনিক কালে শিখে ইংরাজে যে লড়াই হইয়াছিল, তাহার কথা বলিতে যাইতে কখনও ইংরাজের পরাজিত করেন নাই। অথচ সত্তাদলী ও সত্যবন্দী ইংরাজ ঐতিহাসিক যে কেহ ছিলেন না, তাহার নাই। স্বরেন্দ্রনাথও স্বরূপমূলী শিখিয়া। শিখদের নির্দিষ্ট হইতে ভারতে শিখ-শক্তির অন্যায়ের মহান সংঘর্ষ করেন নাই। মালকলমের শিখ-শক্তির অন্যায়—Rise of the Sikh Power in India—এমন অবলম্বনই স্বরেন্দ্রনাথ কলিকাতার শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবক-মন্দিলের নিকটে শিখ-ইতিহাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তাহার সংবাদসিদ্ধ বাক্সৈভবের দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যত্নদূর যে পড়ে ইহার অল্পদিন পরে ভবানীপুর লগ্ন মিশনারী সোসাইটির বিদ্যালয়-গৃহে (L.M.S. Institution) স্বরেন্দ্রনাথ আমাদের এই বাংলা দেশে শ্রীশ্রীমাহারাজু যে সামাজিক ও ধর্মসংস্কারের সংঘর্ষ আন্দোলন প্রবর্তিত করেন, তাহার কথা আমাদের নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌরীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধারণ তত্ত্বাঞ্চল্য, ভারতাঞ্চল্য এবং ভাঙ্গাঞ্চল্যের কথাই আমরা আজিকালি শ্রদ্ধা সহকারে আলোচনা' করিয়া। দায়িক। কিন্তু শ্রীশ্রীমাহারাজু-প্রবর্তিত গৌরীয় পন্থার ভিতরে যে একটা অসাধারণ স্বাধীনতা ও মানবতার প্রেরণা আছে, ইহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করি না। মহাপ্রভুর অবির্ভাব কালে তাত্ত্বিক সাধারণ
বাংলার হিন্দু সমাজকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। এই তাত্ত্বিক সাধনাতেও একদিক দিয়া একটা জৈত্য-বৈতের অমৃত মানবতার অদর্শগুলো উঠিয়াছিল। “প্রবর্তন বৈরবী-চক্র” সর্ববর্ণ ব্রহ্মনীত্ব এই সুত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সঙ্গে অন্যান্য তাত্ত্বিক সমাজী এবং পরমহংস সম্প্রদায় ব্যতীত তাত্ত্বিক সাধনাতে সর্বভূই ব্রাহ্মণিদের প্রভাব নির্ভরশীল ছিল। বৈরবী-চক্র অতিশয় নিগুঢ় অস্ত্ররূপ সাধনার একটা ভিন্ন প্রতিষ্ঠা ছিল। এই চক্রে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ আচার-বিধানের স্থান ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণিদের প্রভাব এইজন্য জগতের হাস পায় নাই বরং বাড়িয়াই গিয়াছিল। আমাদিগের তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকতার ইদানীহে কলে প্রচারনাম বৈদিক যাগসঙ্গের ধারা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাজ্ঞবলিকদিগের ঐশ্বুর্যালিক ও অনৌক্ষেপ ক্রিয়াকর্মের ভব বাংলার তাত্ত্বিক পৃষ্ঠ- পোষকতারই এদিনে রক্ষিত হইয়াছিল। বাংলার পৌরোহিত্যের প্রভাব সহজেই এ সকল পৃষ্ঠপোষকতার ভিতরে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলার প্রতিষ্ঠা-পৃষ্ঠ বিশেষ ভাবে তাত্ত্বিক মানবদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আর এই সকল পৃষ্ঠপোষকতার প্রযোজনে শ্রদ্ধারক, পৌরোহিত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণিদেরও প্রভাব রুদ্ধ পাইয়াছিল। এইভাবে মহাপ্রভুর আঘাতের কালে বাংলা দেশে একদিকে তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকতার প্রযোজনে ও অন্যদিকে মুসলমানের বর্ণাশ্রমবিরোধী সামাজিক প্রভাব হইতে হইতে হিন্দুর ধর্মে ও আচার- বিধানের রূপ করিবার জন্য সে সময় বাংলা দেশে ব্রাহ্মণিদের ও জাতিতের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম এগুলোকে স্বতা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, তাহার নাম শেষতের হইল না। এই ধর্মে ও সমাজ-শাসনের শুরুতে বাংলার হিন্দু সমাজ জড়িত অচল
হইল। রহনদন এই অচলায়তনের ভিত্তিকে ভাঙ্গে নাই, বরং সময়পাতঘী বাংলার করিয়া। এই প্রাচীন সমাজ-বদ্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু জাতির বর্ণ নিরবচ্ছিন্ন সকল শ্রেণীর মধ্যে হরিরন্ম প্রচার করিয়া। এবং—

হরিরন্ম হরিরন্ম হরিরন্ম হরিরন্মৈর কেবলমূল
কলা নাত্যের নাত্যের গতিতর্কথা।

এই মহাবাক্য প্রচার করিয়া। বাঙ্গলার ও চণ্ডীলেক হিন্দু ও মুসলমানের একই সাধনপথে প্রবর্তিত করিলেন। এই সাধনের মুখ্য অঙ্ক ছাড়াই—নাম জগ ও না মান। এই জগ ও মানের অধিকারী জাতির আর সাধনের দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই;

তুষারপথ সুনীচেন তরোরিব সহিয়ুন।

অমানিনা মানবন কীর্তনীনা সদা হরিস।

তৃণের মত যে দীন হইতে পারে, তরুণ মত যে সমিষ্টি হইতে পারে, নিজে অমানী হইয়া অপরকে যে মান দিতে পারে, এই সাধন-সম্পূর্ণ যার লাভ হইয়াছে, সে বাঙ্গলার হতক আর চণ্ডীলেক হতক তাহারই শ্রীহরি নাম করিয়া অধিকার জানিয়াছে। ইহার দ্বারাই মহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তিসাধনে অধিকারী অনধিকারী নির্দিষ্ট হইল। এখানে আর কোন প্রাকারের অধিকারী-ভেদ ঘান পাইল না। এইরূপে শ্রীলীলামহাপ্রভু বাংলার দেশে একটা প্রবল সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত করেন। ইহার ফলে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত গৌরীন্দ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কায়স্থ বৈষ্ণবের জাতি, এমন কি, তদানীন্তন সমাজে স্বব্যাপী বিশালাকায় বহাল করিয়াছিল হইত তাহার পর্যন্ত মনোরঞ্জন জ্ঞান সদা হইলেন। তারিক হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র গুরু ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা কোথাও কুলগুরুর আসন পাইয়াছিলেন, এমন শোনা যায় নাই।

৩৬
মহাপ্রভু তাহার বৈষ্ণব-সাধনে ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণদিগের এই একচেটিয়া অধিকার নষ্ট করিয়া দিলেন। এমন কি বাঁহারা মুসলমান কুলে জমিয়াছিলেন অথবা মুসলমান সংসগ্ন জাতিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন মহাপ্রভু তাহাদিগকে পর্যাপ্ত তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লয়েন। এইরূপে শ্রীরীমুন চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলা দেশ সাম্য মৈত্রী এবং অধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। স্বরেজনাথ পক্ষ বৎসর পূর্বে ইংরাজীনবিশ বাঙালীদিগের মধ্যে বাংলার আধুনিক ইতিহাসে এই তথ্যটা প্রচার করেন। মহাপ্রভুর গভীর ভক্তিসিদ্ধান্ত ও ভক্তি-সাধনার কথা শুনিবার ও বুঝিবার অধিকার তখনও আমাদের জন্যে নাই। স্বরেজনাথও তাহার সম্পান নাই। বেশেবচস্ত তখন সেবমাত্র বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিসের একটু অধিক সম্পান পাইতে আরও করিয়াছেন। সেই সময়ে স্বরেজনাথ মহাপ্রভুর সামাজিক সংস্কারের কথা বিশেষত্বে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন। তাহার শিশির ইতিহাসের বক্তৃতাতে আমরা প্রথম দেখিয়াছিলাম, যে যুদ্ধের স্থান-ভঙ্কর আমাদের দেশভুক্ত ফুটিয়াছিল। দেশ-বন্ধু বা দেশচর্চা বা patriotism যুদ্ধের একটিটিয়া নহ। ভারতবর্ষের লোকেও অজ্ঞাত রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংহত রাজ্যশক্তিকে প্রতিদিইত করিয়াছিল। জনশক্তির হাতে একাধিক একচৌরা রাজশক্তি পরাভূত হইয়াছে। সেইরূপ তাহার শ্রীরীমুন মহাপ্রভুর জীবন-বিষয়ক বক্তৃতাতে আমরা দেখিলাম, শাসনতাত্ত্বিক ও মানবতার নামে সমাজ-সংস্কার ও সমাজের শাসন বদলকে ছেদন করিবার চেষ্টা কেবল যুদ্ধের পরেই হয় নাই; আধুনিক যুগে আমাদের এই বাংলাদেশে একটা প্রবল সূচনার সংস্কার ও সামাজিক বিলম্বের তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। এই ছুটি বক্তৃতাতার দ্বারা স্বরেজনাথ আমাদের নকল নবিশিষ্ট দেশভূক্তি বা patriotismকে
বৈদেশিক ইতিহাসের কল্পিত প্রভাব ও প্রোণা হইতে মুক্ত করিয়া। আমাদের নিজেদের ইতিহাসের বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। এ কথা কথা নহে। আজ আমরা বহুল পরিমাণে আমাদের দেশচর্চা সাধারণ যুগোপের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমাদিগের নিজেদের সাধন, সভ্যতা, শাস্তি, এবং ইতিহাসের উপরে দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছি। কিন্তু এই পুণ্যীর্যের ভিত্তি খুঁজিতে গেলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রোণা সমন্ধে স্বরাজনাথের পকাশ বৎসর পূর্বকার পকাশের ও বাংলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসের ব্যাখ্যাতেই তাহ খুঁজিয়া পাইব।

( ৮ )

স্বরাজনাথের শিক্ষা কেবল আধুনিক ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আধুনিক যুগোপের ইতিহাস হইতে তিনি বহু ইচ্ছা সংগ্রহ করিয়া। আমাদের এই নূতন মাত্রূপাশ্চাত্য যুগের সময়-ক্ষুদ্রতার শানা করিয়াছিলেন। সেকালে এক এম, এ, পরাক্র। যাহারা দিতেন এবং সেজন্য ইতিহাস পড়িতেন তাহাদের বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আধুনিক ইতিহাস পড়িতেন না। যুগে আমরা লেখার সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং কলিয়ারের ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসই পড়িতাম। কলেজে আসিয়া টেলারের প্রাচীন ইতিহাস, অর্থাৎ পারস্য, ব্যাবিলন এবং বিশ্বভাবে ইহুদীয় পুরাণ-কথা—জিহুদিজার তাহাকে ইতিহাস বলা যাইবে, কি না সন্দেহ এবং ইহুদিয় সঙ্গী সঙ্গে স্মিজ সাহেব কৃত গৌতম এবং রোমের ইতিহাস পড়িতাম। এক ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ছাড়া আধুনিক জগতের আর কোন ইতিহাসেরই খবর রাখিতাম না। কেহ কেহ কার্ললাইনের French Revolution
কলেজ-পাঠা রুপে না হইলেও গৃহ-পাঠারূপে পাঠ করিতেন। এছাড়া কৃষ্ণীয় অবস্থায় শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাঙ্গ পর্যন্ত যুরোপের ভিত্তি ভিত্তি দেশ মণিয়ের বা বিদেশীয় একত্ব রাষ্ট্রের সঙ্গে নবজাগত প্রাগ্যাচার্য স্বাধীনতার নামে যে সংঘাম করিয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ আমরা রাখিতাম না। সাহিত্যের ভিত্তি দিয়া দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে একটু আধুনিক পাঠাতে ফাট। বাইরের বক্ততার বিশেষতঃ Isles of Greece শীর্ষক পড়ে প্রায় যে স্বাধীনতার সংঘাম হইয়াছিল তাহার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক তথ্য জানিতাম না। কঙ্গোরে, ইটালি, স্কুইজারল্যাঙ্গে এমন কি আরো পর্যন্ত যে স্বাধীনতার সংঘাম হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছুই জানিতাম না। মাট্সিনি, কনিচ, উইলিয়াম টেল কিন্তু এমনির নাম পর্যন্ত আমাদের জান ছিল না। স্কুরেন্ড্রনাথই প্রথমে আমাদিগের নিকটে একক পুরুষ-কাহিনী প্রচার করেন। তাহারই মুখে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেতে ইটালির শিক্ষার্থী যুবকেরা কি করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া Young Italy সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, একথা শুনিতে পাই। স্কুরেন্ড্রনাথই প্রথমে মাট্সিনির জীবনী, চরিত্র, দেশচর্চার অদর্শ এবং স্বদেশের উদারকরণে তিনি যে প্রায় জীবনযাপী সংঘাম করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমাদিগকে বলেন। এইরূপে আধুনিক ইটালির স্বাধীনতার সংঘামের ইতিহাস হইতে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করি। আরো ভিক্তোরিয়ার রাজত্বের প্রথম দিকে টেমস ডেভিস এবং গাভান ডাফি প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ে কি করিয়া মূল্য স্বদেশবাসীদিগকে জাগাইয়া। স্বাধীনতার নামে দেশচর্চার অদর্শ দীক্ষিত করিয়াছিলেন, স্কুরেন্ড্রনাথের মুখেই প্রথমে আমরা সেই কাহিনীও শুনিতে পাই।
ম্যাট্সিনির গ্রন্থ, ডাফির 'Young Ireland' আমাদের এই নূতন দেশচর্চার বা মাতৃপুজোর তত্ত্বলোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা এইসকল কাহিনীতে একবারে মশগুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। পর্দালাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি যে দেশভিক্ষীর ভাব মাত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনাবলীর উপর গড়িয়া তুলেন। আমরা যে পথে ইটালি আপনার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, যে ভাবে আয়লণ্ড ইংরাজের শাসন-শৃঙ্গ ছেদন করিতে চাহিয়াছিল, যে ভাবে আমেরিকা ব্রিটিশের বন্ধনমুক্ত হইয়াছিল, সেই সকল দৃষ্টান্তের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলাম।

(৯)

রাজশাহীর প্রতিকূলে একটা ভাব না জাগিলে প্রজা-শক্তি কখনও আস্ত-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে না। আমরা যখন প্রথম ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তখন ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের ইংরাজী-নীচ যুবকদের মধ্যে বিদ্যুত্ত যুব কথ্য করিয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়া হইয়াছিলেন। তাহারই আমাদের বর্তমান দূর্দৃষ্টির জন্য স্কুল থেকে উঠিয়া ফিরিয়া যাইয়াছিলেন। আমরা যখন তাহাদের শিক্ষাদায় লাভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগতত্বের প্রেরণায় আমাদের গতানুগতিক ধর্ম বিশ্বাস এবং সমাজ শাসনের বিরুদ্ধে উঠিয়া দীঘাইলাম, লোকিক ধর্মের জাতীয় বিচার বর্জন করিতে লাগিলাম, রাজতন্ত্রী প্রতাপাধিকার করিলাম, দেববান্তর উপাসনা মিথ্যা বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলাম, তখন দেশের ইংরাজ রাজপুত্রো। আমাদিগের এই সৎ সাহসের প্রশংসা করিতে আস্তর করিলেন; পাকে প্রকাশে আমাদিগের এই ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের আয়োজনে শক্তিসাগর করিতে লাগিলেন।
স্বতরাং আমাদের এই নূতন স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথমে তাহারা আমাদের স্বপক্ষেই ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে আমাদের ভাবের এবং আদর্শের এই ঐক্য ছিল বলিয়া আমরা তাহাদিগকে অত্যন্ত অনুকুল করিতাম। ইংরাজ এদেশের রাজা হইয়া আমাদের পুরুষপর্ষ্পর সক্ষম অধ্যয়ন ও কুসংস্কারকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অসংখ্য সমাজশাসনের এবং অলীক ও অযৌক্তিক ধর্ম-বিশ্বাসের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছে। ইংরাজ এদেশের রাজা না হইলে যে নূতন স্বাধীনতার অপূর্ব অনুভূতি আমরা লাভ করিয়াছি তাহা পাইতাম না। ইংরাজ দেশের রাজা না হইলে হিন্দু সমাজ আমাদিগকে পিত্যায় নষ্ট করিয়া ফেলিত। আমরা কিছুতেই এমন নির্বিবাদ ও শাস্তিতে নিজেদের মতবাদের অনুরূপ করিতে পারিতাম না; জাতিভেদ প্রভৃতি সুখ্রুপ অবলীলা-ক্রমে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতাম না; এমন কি, স্বাধীনতার অধ্যয়ন পর্যন্ত করিবার অধিকার 'পাইতাম না। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজি-নবিশিষ্টের একুশ ধারণায় জমিয়াছি। বহুদিন পর্যন্ত বহুমূল্য শিক্ষিত লোকের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ইংরাজ চরিত্রের উপরে এই আস্থা, ইংরাজের সভ্যতা ও সাধনা প্রতি এই শক্তি, ভারতের ব্রিটিশ প্রতুষ্টিকর প্রতি এই স্বতন্ত্রতা, আমাদিগের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের অকাঙ্কের্কে প্রবল হইয়া উঠিতে দেয় নাই। সেকালের অনেক শিক্ষিত লোকেই মনে করিতেন যে আমরা ক্রমে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া নিজেদের সমাজ-গঠনকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের উপ-যুক্ত হইলে, ইংরাজ স্বতঃ হইতেই আমাদিগকে তাহার শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। ভারতবর্ষ নাবালক। ইংরাজ এই নাবালকের সম্পত্তি অলি ও অছিলাপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে মাত্র।
দায়িত্বকারী বর্ণপ্রাপ্ত হইয়া নিজের সম্পত্তির ভার যখন নিজের হাতে লইতে পারিয়ে, তখন তাহার সদাস্য অভিভাবক তাহাকে আপনার অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনা হইতেই প্রসন্ন চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিবেন। ইংরাজ এ কথা কহিতেন। আমাদের প্রথম যুগের ইংরাজী-নবীশেরাও এই কথাকে বেদবাকারূপে মানিয়া লিখিতেছিলেন।

এই সকল কারণে আমাদের নূতন স্বাধীনতার আদর্শ সমাজ এবং ধর্মরীকৃত সমাজে ইংরাজী-নবীশের মতন তাহাদিগেরও এই শাস্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এখানকার ইংরাজ সরকার এবং বিক্রমের শাস্তি-সমাজ পর্যায় যে অবিচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষভাবে তাহাদের চোক খুলিয়া যায়। দেশের লোকেরও ইংরাজের প্রতি অবিচার দূষণ হইয়া উঠে। কিছুকাল হইতেই দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরাজ রাজপুরুষদের একটা রেষারেষি জাগিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথম প্রথম যখন আমরা তাহাদের মুখে যে বুলি স্থিতিস্থান, এমনকি কৃত্তিত সহকারে তাহারই আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, তখন শিশুর বিষাক্ততার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া গুরুর অন্যথা যেমন আত্মান্তঃকরণ উদয় হয়, ইংরাজের অন্তরে সেই রূপের হইয়াছিল। ইংরাজ আমাদের কৃত্তিত দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইত। কিন্তু ক্রমে যখন আমরা তাহার শিক্ষানুভূতি করিয়া সেই শিক্ষার দাবীতেই ইংরাজের সঙ্গে সমান অভিকার ও আসন এবং করিতে অগ্রসর হইলাম, তখন গুরু-শিষ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাণিজ্য গুরুর পূর্বের অভিভাবক মেহাণ্ডি এবং শিশুর আগেকার সহজ আত্মঃ উভয়ই একবারে নষ্ট হইয়া গেল। ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীরা সকল বিষয়ে ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।
করিতে আরও করিলেন। ইংরাজ ও যথাসাধ্য চারিদিকে তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা এই ইংরাজ বাঙ্গালীর বিদ্যালয়ে খুবই বাড়াইয়া তুলে একথা অস্থীকার করা যায় না।

ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার প্রাক্কালেই নানাকার দলের সহরে দেশীয় এবং বিদেশী দিগের মধ্যে একটি তীব্র বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেকালে মেডিক্যাল কলেজে ইংরাজ ও যুরোপীয় সেনাবাহিনীর প্রারম্ভিক ছাত্ররা বাঙ্গালী ছাত্রদের এক সঙ্গে ডাক্তারী শিক্ষা করিত। এই সেনাবাহিনীর ছাত্ররা বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের উপরে অনেক সময়ে অত্যাচারও করিত। এই সূত্রে একবার উভয় পক্ষের মধ্যে একটি তীব্র মারামারি বাধিয়া যায়। এই অগ্নিটাকে একুশ সহরময় ছড়াইয়া রড়ে।

শুনিয়াছি যে আটলান্টিক পর্বতমালা এই কারণে বাঙ্গালী টোলাই ইংরাজ বা ফিরংগি সানিলেই মার খাইত; আর ইংরাজ বা ফিরংগি টোলাই বাঙ্গালী মাইলেই মার খাইত, এইরূপ অগ্রহা দঞ্চুড়াইয়াছিল। এইজন্য কলকাতায় ছাত্রমহল তখন হইতেই একটি প্রথম ইংরাজবিদ্রোহ জন্মিয়াছিল। এই ভাবিতেও সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজ যোগাইয়াছিলেন।

স্কুল-কলেজে আমরা ব্রিটিশ ভারতের যে ইতিহাস পড়িতাম, তাহাতে ইংরাজের শুণ্যগ্রামের কথাই দেখিতাম। কত জটিল-কুটিল নীতির আক্রমণ, কত রাজনৈতিক ছল বলে কোঁপালে যে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি শৈলং শৈলং সদগ্রহ ভারতকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহার বলা আমরা জানিতাম না। সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা হইতে আমরা ইহারও প্রথম পরিচয় পাইতে লাগিলাম। স্যাটবিসনের প্রবন্ধাবলী, গাজান ডাফর Young Ireland এবং Torrensএর Empire in Asia, কালাইলের French Revolution, মার্কিনের রাধানভাল ইতিহাস,
এ সকল আমাদের এই নূতন রাষ্ট্রীয় সাধনার শাখার মূল প্রতিষ্ঠিত হল। এই শাখার অধ্যাপক, এই সাধনার প্রধান গুরু হইয়াছিলেন, স্বরূপচন্দ্রনাথ। আজ স্বরূপচন্দ্রনাথের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠিত কালবল্পে নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যাহারা আজ তাহার নিন্দা বাদ করিয়া নিজেদের দেশবাসিস্তান ও স্বাধীনতার অক্ষ্যাকে সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেছি, স্বরূপচন্দ্রনাথের সেই প্রথম শিক্ষাদীক্ষ। যদি বাংলা না পাইত, তাহা হইলে আমাদের নূতন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা কোথায় থাকিত, এ কথা ভাবিয়া দেখি না।
বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র

[ ১৯৩২ ইংরেজিতে বিশিষ্ট পাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা দিয়ে তাঁর জন্ম আহৃত হয়েছিলো। তাঁর আত্মীয়ের কর্তৃত্বে তিনি ইহা দিতে পারেন নাই; এবং ঐ বৎসরই নবযুগে তাঁর কথাগুলো পরলোক গমন করেন। এই অসমাপ্ত অবক্ষ তাহার একবার শেষ রচনা। 'নবযুগের বাঙ্গালা' ইহা সবশেষে মুদ্রিত হইল।—প্রকাশক ]

বাংলার নবযুগের নাট্যকলা এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র এই বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা দিয়ে তাঁর জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আমাকে দাকিয়াছেন। তাহাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। এবিষয়ে আমার বিশেষ কোন যোগ্যতা আছে, এ অভিমান আমার নাই। যে পোষ্প্যুক্তভাবে নূতন গবেষণা করিয়া সন্তান-সাধ্যা এই যোগ্যতা অর্জনের সময় ও শক্তিও আমার নাই। এজন্য ভয় হয় যে আমি যাহা বলিব পাইতেরা তাহাতে বিশেষ প্রশিক্ষণযোগ্য হয়ত কোনো পাইবেন না। কে কোনো আদর্শের তুলাদৃষ্টে আমার বক্তব্যের ওজন করিবেন, জানি না। তবে নাট্যকলা সম্বন্ধে এই দীর্ঘজীবীর সাধারণ অভিজ্ঞতাতে আমি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহার দ্বারা গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাতের বিচার করিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে দোষ-গুণ যাহাই ঘটিয়া না কেন, তাহা আমার নিজের, অদৃশ্যবিদ্ধজনিত নহে,—এই কথাটা সকলের আগে বলিয়া রাখিতে চাই।

আমার উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা হঠাৎ এভাবে কেন
নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র

অর্পণ করিলেন, জানি না। তবে গিরিশচন্দ্রের সর্গীরাহনের পরে তাহার মৃত্যুর্ব্য জন্ম কলিকাতা টাউন-হলে যে বড় সক্ত হয়, তাহাতে আমি চূড়া-চারিটি কথা বলি। আমার বোধ হয় সেই ক্ষুদ্র বক্ত্তা মনে করিয়াই আমার উপরে আজ এই গোপনভাব অপিত হইয়াছে। সেই সভায় আমি একটা কথা কহিয়াছিলাম, অনেকের নিকটে তাহ। নূতন ঠিকিয়াছিল। পুরুষতে ধর্মনীতিবাদীরা দৃষ্টিগৃহে বাইবেলের দশাঞ্জার কষ্ট-পায়রের রসাম্পার বিচার করিয়া তাহার ভাল মন্দ নির্দেশণ করিয়া থাকেন। আমি এই রীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। বাল্টার গুণাগুণ তাহার শ্রীকার্যমের দায়াই নির্দেশিত হইবে, তাহার সাহায্যে আচার-আচরণের দায়া নহে, এই কথাটা রসত্বের আলোচনায় একটা মূল কথা। সেইগুলির চোর ছিলেন না সাধু ছিলেন, তিনি সত্যই হরিমূর্তি করিয়াছিলেন কি না, তাহার পরিবারিক জীবন শ্রুতিঅনুসারে উচ্চ মুখ্য ছিল, এ সকলের দায়। তিনি যে সকল অলোকসামাজ্য রসচিত্ত শক্তিয়া গিয়াছেন তাহার বিচার হইবে না। এসকল শ্রীতির বিচার হইবে রসের গুণাগুণের দায়। কবির কাব্যের বিচার দেউলের বা গির্জার বা মসজিদের শুচিতা বা অশুচিতার দায়। এই বাহিরের শুচিতা বা অশুচিতার কষ্ট-পায়র দিয়া নাট্যাচার্য শক্তি নাট্যাচার্যের গুণাগুণ কষ্ট যায় না। যখন যখন এই চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই মনগড়। ধর্ম-নীতির গীতেই রসের সাহায্যক ক্ষুদ্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রমে মানবপ্রকৃতি এই অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে যাইয়। অবশ্যই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপে সকল নীতির বদ্ধনকে কাটিয়। দিয়া সমাজকে বেধেচারের পথে চলাইয়াছে।

ইংরাজের ইতিহাসে দ্বিতীয় চালনের সময়ে ইংরাজ-সমাজ ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। আমাদের দেশেও বৌদ্ধ-সমাজের অন্তর্ভাবে কঠিন ও
নিষ্ঠুর বৈরাগীর শাসনের প্রতিক্রিয়াতে যে ফল ফলিয়াছিল, বাংসায়নের কামসূত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রসস্থিতকে বা রসস্থিতকে সাধারণ পুষ্টিগত ধর্মনিতির বন্ধনে বাঁধা যায় না। কখনও কোথাও ইহা হয় নাই। রসস্থিতের জন্য যে মুক্ত জীবন প্রয়োজন, তাহাকে প্রাচীন লোকিক সদাচারের কঠোর বেকনার ভিতরে চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় না।

( ২ )

অবশ্য সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটা সনাতন আদর্শ আছে। গীত উদ্ধৃত হয়: অবাক্ষাখঃ এষঃঃ সনাতনঃ। বলিয়া মানব সমাজের এই নিত্যসিদ্ধ আদর্শেরই ঈষ্টিত করিয়াছেন। এই আদর্শ সমাজে মানুষ সহজ জীবন যাপন করে এবং তাহার নিত্যসিদ্ধ প্রকৃতির প্রক্রিয়া প্রাপ্ত হয়। এই আদর্শ সমাজ ‘বন্ধনমুক্ত।’ সেখানে প্রেমের শাসন মাত্র আছে, অথবা কোন শাসন নাই। এই আদর্শ সমাজে সখ্য, বাংস্তা, মধুরাচ্ছি রস প্রকৃতির প্রেরণায় আপনি ফুটিয়া উঠে। এ সমাজের নরনারীরা স্বধর্ম আচরণ করিয়া মুক্তভাবে বিহার করে। আমাদের বৈষম্য সাধারণত এই নিত্যসিদ্ধ আদর্শ সমাজের একটা বহু বা বুদ্ধানন রূপে প্রণয় করিয়াছেন। মন্ত্র সমাজ সর্বত্রই আদিকাল হইতে সজ্জানে বা অজ্ঞানে—কবী কখনও জ্ঞানে, অধিকাংশ সময় অজ্ঞান, প্রকৃতি বিশেষ এই আদর্শেরই অমূল্য করিয়া চালিয়াছে। এই আদর্শ যখন আমাদের হইবে তখন ধর্মনিতির মধ্যে রসস্থিতির মিলন ও সম্পর্ক হইয়া যাইবে। এখন এ দুইঃমূল মধ্যে অনেক সময় যে বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহার আর ধার থাকিবে না। কুতুর্বি এবং কর্ণে সদাচারের মধ্যে রসস্থিতির সম্ভাব্যতা এখনও হয় নাই। কিন্তু ক্রমশ আধুনিক সভা সমাজ এই
নাট্যচার্চা গিরিশচন্দ্র

সময়ের দিকে চলিয়াছে। যে পরিমাণে মানবসমাজ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের শাস্ত্র-পুরাণধর্মীর বক্তা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া। মানবের প্রকৃতি নিহিত যে সহজ ধর্ম তাহাকে জীবনের ক্ষুদ্রতায়। বলিয়া বরণ করিয়া। লইতেছে, সেই পরিমাণে রসস্থটি এবং রসামুকূলের সঙ্গে ধর্মনীতির এবং সমাজনীতির পূর্বকার বিরোধ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া রসামুকূলে এবং ধর্মচরণকে একটা উচ্চতর ভূমিতে তুলিয়া লইতেছে। ইহার ফলে নাট্যকলা এবং রক্ষণকরণ ক্রমে ক্রমে ভঙ্গসমাজে আপনার খাদ্যায়োগা সম্মান প্রাপ্ত হইতেছে।

(৩)

কিন্তু রসস্থটিরও যে কোন ধর্ম ধর্ম নাই এমন বলা যায় না। রসের রাজ্যের তার নিজের একটা ধর্ম বা নিয়ম আছে। আধুনিক সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে মানব জীবনের বিভিন্ন ভিভাগের সৃষ্টির স্বাভাবিক করিয়াছে। রাষ্ট্রনীতির নিয়ম ধর্মনীতিতে চলে না। সাম, দান ভেদাদির ঘাড়া ধর্মজ্ঞানের গড়ে যাওয়া ধর্ম নষ্ট করা মাত্র। আবার যে ঐকান্তিক অকৃত্রিম ও সত্বাবিদ্যা ধর্মনীতির প্রাণ, তাহাকে রাষ্ট্রনীতিতে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই বলিয়া রাষ্ট্রনীতি যে চল-চাতুরীর পথ ধরিয়া চলিবে, এমনও নহে। চল-চাতুরীর প্রয়োজন মন্ত্রণালয়ের জন্য। কেবল শুক্ল বুদ্ধির কৌশলে এই মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা অসাধ্য বা অসম্ভবও নহে। যুক্তক্ষেত্রের এক নীতি। সেখানে সন্তানকে আপনার চাল লুকাইয়া রাখিয়েই হয়। ইহা দোষীয় নহে। যুক্তক্ষেত্রের লক্ষ্য যখন পরস্পরের উত্থান কিশোর পররাষ্ট্রায়পর হয় তখনই যুক্তক্ষেত্র ঘোর। ধর্মের গ্রানি ও অধর্মের অভ্যাস ঘটে, মন্ত্রণালয়ের দ্বারা নহে। যুক্তক্ষেত্রে অহিংসানীতি প্রতিষ্ঠিত করায় না। যুক্তক্ষেত্রে অহিংসাধর্মের অমূলীল ধর্ম নহে অধর্ম।
২৯৬ নবষুগের বাংলা

তবে হিংসারও একটা নিয়ম আছে। পাতিত্ব বা আহত কিছু অশ্রমগুলো পরিত্যাগ করিয়া যে অর্থাৎ সংগ্রাম হইতে বিরত হয় কিন্তু যে অন্ধারী যোগ্য নহে, তাহার বিনাশসাধনে উদ্দেশ্য হওয়া নিতান্তই অধর্ম। আদালের পুরাতন ক্ষীণবিষ্মে একদিন একক নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সাধারণ ধর্মের মাপকাটিতে ক্ষীণবিষ্মে প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

(৪)

ফলতঃ নৌকার, বহুক্রমশীল, বহুধর্মপ্রায়ণ জটিল মানবজীবনের
বিভিন্ন বিভাগের ভালমণ্ডলের বিচার কোন একটা বিশিষ্ট বিধানের
দ্বারা হয় না, হইতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ধর্মাধর্মের
বিচার হইবে সেই সেই বিভাগের আপনার বিশিষ্ট বিধিনিষেধের দ্বারা।
খামখেয়ালের উপরে কোন বিধিনিষেধের প্রতিষ্ঠা হয় না। সকল
কর্মেই এক একটা বিশিষ্ট লক্ষ্য আছে। সেই ক্ষেত্রে যাহাতে সেই
লক্ষ্য লাভ হয়, তাহাই বিধেয়। সেই লক্ষ্য লাভের যাহাতে ব্যাঘাত
জন্মায় তাইই নিষ্ঠ। ইহাই সার্বভৌম নীতি। ধর্মের সাধনের
সার্বভৌম লক্ষ্য যোগ্যতার। এই লক্ষ্য দ্বারাই ধর্মনীতির প্রতিষ্ঠা
হয়। সেইরূপ সমাজ-জীবনের একটা লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য
মানুষের মানুষে, সমাজের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা
হয় সেই সকল সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধন এবং সেই সকল সম্পত্তির
অর্থান্তরের দ্বারা। সমাজের লোকের শ্রেষ্ঠতম মানুষের বিকাশ। এই
লক্ষ্য সাধনের জন্যই গৃহস্থ-নীতি ও সমাজস্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সমাজ
বহু বাচ্চের সমষ্টি। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের নিজের
নিজ নিজ স্বধার্মিক প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সমাজের সমষ্টিতে জীবনকে
রক্ষা করিতে হয়। ইহাই সমাজস্বরূপ। একত্রে সম্যাসীবিষ্ট ।
একান্ত ব্যক্তিগততাকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া সমাজ-নীতি-বিগতিতে।
এই মহান আমাদের প্রাচীন সমাজ-নীতির বিধানে গার্হস্থ্য সম্প্রদায়ের
নিয়ম চলে না, সমাজ-আদর্শেও গৃহস্থের ধর্ম ধাটে না।

জীবনের বিস্তার বিভাগের এক একটা লক্ষ্য আছে। এই সকল
বিশিষ্ট লক্ষ্য সাধারণ মানব জীবনের সার্বজনীন লক্ষ্যের অস্তিত্বকে।
জীবনের বিভিন্ন বিভাগের এই সকল বিশিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা তাহার ধর্ম
বা নীতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই লক্ষ্য লাভের সহায়তা যাহাতে হয় তাহাই
বিধৈর্য; সেই লক্ষ্যের ব্যাখ্যা যাহাতে হয় তাহাই নির্দেশ।
ইহাই সার্বজনীন নীতি বা ethics। আধুনিক ধর্ম-নীতিতাত্ত্বিকে বা
ethics-এ এই সাধারণ লক্ষ্যের নাম আত্মোপলব্ধি; ইঞ্জিলীতে
self-realisation। বাহির হইতে ধার করা কোন বিধিনিষেধের
দ্বারা। আধুনিক ধর্ম-নীতি পরিচালিত হয় না।

** (৫) **

নাট্যকলার লক্ষ্য রসময়। নাট্যকলার লক্ষ্য চিদাকার রসের
রূপকে ইস্তিয়াগী আকারে ফুটাইয়া তোলা। এই লক্ষ্যের দ্বারাই
নাট্যকলার এবং রঞ্জকের নীতির নির্যাত হইবে। এই লক্ষ্যের লাভের
যাহা সহায়, এ রাজ্যে তাহাই ধর্ম বা নীতি; যাহা অস্ত্রায় তাহা
অধর্ম বা দুরূনীতি। এই মূল সত্যের উপরেই নাট্যকলার বা রঞ্জকের
দারোজায় প্রতিষ্ঠা। এখানে মঘুর বা পরাশরের, চিত্রকথার ক্ষিত
বাইবেলের নিয়ম খাটাইলে চলিবে না। এই বধাতেই আমি গিরিশ-
চন্দ্রের মুখ্যসভায় কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কথাটা হয়ে সকলের
প্রতিকর হয় নাই, অংশ নিভাইত ‘নীতিবৃত্ত লোকেদের সরাসরিভাবে
এই কথাটা উড়াইয়া দিয়ে পারেন নাই। অথবা কে বাংলার
আধুনিক রঞ্জকের নটন্তিতার নিজেদের আত্ম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং
চরিত্র রক্ষার একটা পথের ইঙ্গিত, মনে হয়, এখানে পাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ নীতিবদ্ধ যাহার। তাহারাও যদি কথাটা তলাইয়া দেখেন তাহ। হইলে তাহাদের নিজেদের আদর্শের সঙ্গে রসময়িত্র একটা সময়ের পথ দেখিতে পাইবেন।

কারণ, সংযম যেমন ধর্মসাধনের সেইরূপ নাট্যকলা এবং রঙ্গ-মঞ্চেরও সাধারণ নিয়ম। রস এবং ইষ্টিরভোগ এক নহে। ইষ্টিরভোগ মাত্রই রসের পর্যায়ে উঠে না। বিষয়-সংক্ষেপে ইষ্টিরভোগের যে চরিত্রকর্তা লাভ হয় এবং এইজন্য যে আনন্দ উপচিত হয় তাহ। যতক্ষণ প্রাকৃত ইষ্টিরভোগের সীমায়কে অতিক্রম করিয়া না যায়, ততক্ষণ রসের জন্ম হয় না। রস বস্তু অতীতিক্রিয়। রসের ভূমি—ইংরাজিতে যাহাকে romantic plane হইলে—তাহা আধ্যাত্মিক বা spiritual। তাহা কখনও ইষ্টির বিকারের দ্বারা আহ্বান হয় না। এইজন্য অস্যম্ভ রসের অনুভূতি হয় না। আমাদের ৈশ্বর্য মহাজন পদাঙ্গলতে এই সত্তাটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কহিয়াছেন—

সখি কি পুণসি অনুভব মোয়
সৈ পীরভি অনুরাগ বাধানিতে
তিলে তিলে নৃতন হোয়।
জনম অবধি হাম ওরুপ নেহারিষ্ট্রু
নয়ন না তিরিপিত ভেল,
সোহই মধুর বোল অবগুহি শুনলু
শ্রীনগথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গেঁঁহারিষ্ট্রু
না বুঝি কৈহ কেল,
লাখ লাখ যুগ হঘিয়ে হঘিয়ে রঞ্জলু
বলি হঘিয়া সুড়ন না গেল।
নাট্যচার্যা গিরিশচন্দ্র

এই সত্যাংশই ইংরিজি পাইল্যাট ইলিয়েট কহিয়াছেন, "Our love at its highest flood goes beyond its object and loses itself in the Infinite."

বৈষ্ণব সাধনার রসত্বে প্রথম কথাই ইহা। "উজ্জ্বলনীলমণির" প্রথম সূত্র এই—

নির্বিকারেনকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিকারঃ।

ইন্দ্রের বিষয় ইন্দ্রের সম্বন্ধে উপস্থিত হইলেও যে চিত্ত তাহার ভোগের জন্য কিছুমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠে না, সেই চিত্তে নির্বিকার চিত্ত কহে। যে জিতেন্দ্রিয় নহে, সে কখনও এই নির্বিকার অবস্থা লাভ করে না। যাহার এই নির্বিকার অবস্থা লাভ না হইলে সে কখন রসের আন্তরিক করিতে পারে না। তাহার অন্তরে সত্য রসের অনুভূতি হয় না। যাহার অন্তরে সত্য রসের অনুভূতি হয় না, সে কখন রসের ছবি আকৃতি বা ফুটাইতে পারে না। অসংযম ইন্দ্রের তড়িৎ তাহার সতত চঞ্চল চিত্তে রসের রূপ বসিতে পায় না। নিয়ত কস্থিত দর্শনে যেমন কোন কিছুর রূপ ধরা যায় না, সেইরূপ ইন্দ্রের লালসা—বিক্ষিপ্ত চিত্র—

dর্পে কোন রসের মূর্তি প্রকাশিত হয় না। যে রসের রূপের স্থিতি করিবে বা করিবে পারে, সেই স্থিতিকালে প্রাকৃত ইন্দ্রের রাজ্যের বাহিরে অতীতকাল যাইয়া উপস্থিত হয়। ইহাই রসস্থতির সার্বজনীন অভিপ্রেত্ত। ইহা যোগেরও অভিপ্রেত। যোগুক্ত না হইলে রসস্থতা হওয়া যায় না। যোগুক্ত না হইয়া কেহ রসের সত্য রূপকে রক্ষা করিব যাই। তত্ত্বাত্ম তত্ত্বাত্ম হইয়া থাকেন। এই যোগ ভাষ্যে গেলে তাহার যে অবস্থায় হউক না কেন, তাহার দ্বারা তাহার রসস্থতির ব্যাপ্ত হয় না, বিচারও হইতে পারে না। নতুন তাই যোগুক্ত না।

* ৩৮*
ষেসকল নট বা নটী রসের ভূমিতে যাইয়া উঠিতে পারেন, তাহাদিগকে সর্বদাই সেই সত্যিকরে সেই সত্যিকরের লোভে সংযম সাধন করিতে হয়। যাঁহারা করেন না বা পারেন না, তাহাদিগের নাট্যকলা ফুটিয়া উঠে না, ফুটিয়া উঠিবার অবসারও পায় না। তাহাদের কুটিল নাট্য-রসের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। দেহের লমিত লাভ, কঙ্ক মধ্যনা কিন্তু রিংসার হাবভাবের দ্বারা দর্শকগণের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাহারা সামাজিক প্রশিক্ষণ লাভ করিতেও পারেন, কিন্তু সত্য প্রত্যেক পূর্ব আসনে তাহাদের স্থান হয় না।

(৬)

অমূর্ত রসকে মুঁক্তি দান করা নাট্যকলার মূখ্য উদ্দেশ্য। কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতিতেও ইহাই করিতে চাহে। তবে এককিছু সাধারণ কাব্য এবং উপন্যাস, আর অন্যান্যকে দৃশ্যকাব্য এবং নাটকের প্রায় এই যে, কাব্যে এবং উপন্যাসে কবি আপনার কল্পনাবলে শুদ্ধ ভাষার সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনাবলীর সংযোগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রসের স্থিতি করিয়া থাকেন। নাট্যকারকেও তাহার স্থিতির জন্য এই সকল উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা প্রভৃতিকে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনের দ্বারা আপনাপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং যথোপযোগী ক্রিয়া বা অঙ্গভঙ্গের দ্বারা সেই মনোভাবকে দৃষ্টি করিয়া দর্শকগণের মনে মুদ্রিত করিতে হয়। কিন্তু উপন্যাসে বা কাব্যে যাহাদের চরিত্র বর্ণিত হয় তাহাদের সাক্ষাৎকারে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হন না। নুত্রাং গোষ্ঠের উপরে সমগ্র কাব্যান্তি বা উপন্যাসের পাঠ করিয়া তবে পাঠককে কাব্যের মধ্যে কিন্তু উপন্যাস-বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের চিত্র আপনার.
নাট্যচর্চা গিরিশচন্দ্র

মনোমধ্যে কলনর তুলিতে অকিতে হয়। প্রতি মুছিতে কায় বা উপনায় পাড়িবার সময়ে সেকল চরিত্রের ছবি তিলে তিলে পাঠকের দৃষ্টিতে চিত্র হয় না। নাটক বা দৃশ্যকাব্যে মুছিতে নাটকীয় রসের ছবি দর্শনকৃতের চক্ষের উপরে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। আর সময়ের মধ্যে ঘটনাবলী বিচিত্র ভাবমালক আখ্যানিকার সমগ্র একটি ছবি নাট্যকর ও নতুনন্তরিতে রসময়ে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এইজন্য নাট্যরচনায় নাটকের মূল লক্ষ্য হিসি করিয়া। নাট্যকারের অনুমানে সেই লক্ষ্যের অমূল্যতার করিতে হয়। নাটকীয় উপাখ্যানে অনেক অবস্থার বিষয় চিত্রের সমক্ষে উপস্থিত হইলেও সেকলের অমূল্যতার লোভ তাগুয়ার মূল লক্ষ্যের মাহা অনুকূল, কেবল তাহাকেই বাহিয়া লইয়া নাটকীয় চিত্রে গায়িকায় তুলিতে হয়। যে নাট্যকার আগ্রহী বা অবস্থার বিষয়ের প্রতি আকর্ষ হইয়া তাহার অমূল্যতার করেন, তাহার নাটকের আদর্শ লাভে সমর্থ হয় না। কাব্যে কিছু উপনায় এসকল অবস্থার বিষয়ের অমূল্যতার মাত্রনীতি, কখন কখন তাহার দ্বারা কাব্যের বা উপনায়ের উৎকর্ষ সাধনের সাহায্য হইয়া থাকে। নাটকে ইহা অমার্জনীয়। ইহা দ্বারা নাটককার অন্তর্ভুক্ত ঘটনা থাকে। আমাদের ‘বর্ণনা’ উপনায়ে মূলের দোকানে নীলকমল এবং তাহার সঙ্গীকে আমিয়া। এজন্য তাহার প্রাক্তন সমাজের উপরে যে ইংরাই বর্ণনায় আসেন তাহার উপনায়ে দৃষ্টিতে মহত্ত্ব নহে, কিন্তু নাটককে অমার্জনীয় হইত। কারণ ‘বর্ণনাত্বক’ মূললক্ষ্য একাংশক্ত পরিবর্তের এক ভাগ। উপার্জনকম আর এক ভাগ। উপার্জনে অফম হইলে এই অবস্থার বৈষম্য হইতে যে হইসা। দত্ত প্রভুর স্বত্ব হয় তাহাই ফুটাইয়া তোলা। ইহার সঙ্গে মূলের দোকানে নীলকমলের ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি ইন্টিমির করার কোন সমত্ত্ব নাই। ঐ আধুনিকটি বাদ দিলে উপনায়ের অশ্রুহর্মুখ হইত না। তবুও উপনায়ে এরূপ
অবাস্ত্র বিষয়ের অবশ্যারণাম অমহীর্দায় নহে। আমাদের প্রাচীন যাত্রাগানে প্রাচীনগণের চতুর্দশ বিশ্বাস দিবার জন্য মাঝে মাঝে সত্রের অবস্থারণ হইত। সেইসময়ের সময়ানুয়ে এই অবাস্ত্র চিত্তটির সমাবেশে উপস্থারণ মাঝে মাঝে হইত। আমার মনে নাই সময়ার অভিনয় এই চিত্তটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল কি না। যদি না হইয়া থাকে তাহার ছাড়ি সরলা নাটকে নাটকের আদর্শ ক্ষুদ্র হইয়াছিল, এ কথা বলিতে হইবে।

ফলতঃ উপস্থাপনেই হউক কিবো নাটকেই হউক সত্য রসস্তুটি কখন আপনার উপাধ্যায়ে এক্ষণে অবাস্ত্র বিষয়ের সমাবেশ করেন না। তাহার যোগ্যতায় হইয়াই আমাদের শ্যংকার্য্যে মনো- নিবেশ করেন। বক্ষিচন্দ্রের উপস্থাপন এক্ষণে অবাস্ত্র বিষয়ের অবস্থারণ দেখা যায় না। তাহার উপস্থাপনে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরস্পরের সঙ্গে একবার আট গাঁথুনি দেখিতে পাই যাহাতে কোন অগ্রাসিক বিষয়ের প্রবেশের অনুপরিমাণে অবসর নাই। বক্ষিচন্দ্রের উপস্থাপনতে অতি সহজেই এইজন্য নাট্যাকারের পরিণত হইভে পারিয়াছে।

(৭)

নাট্যকালার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ঘটনাবৈচিত্র্য আছে, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনাটি একটি মূল বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তসহ সেক্ষণের মেক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম অংশে ভাইনিকের সঙ্গে দর্শকের এবং মেক্ষণের পরিচয় ঘটিয়া। পরে রাজপুত লোভে মেক্ষণের অন্তর্বে যে সংস্থানক ও একরূপ বৈশিষ্ট্র্য বিকার উপস্থিত হয়—কবি তাহারই বীজ ব্যবন করেন। ভাইনিক মেক্ষণের অন্তর্বে যে লোভের বিষ লুকিয়াছিল
ভাবা আশ্চর্য কৌশল সহকারে বাড়াইয়া তোলে। তারপর
নাটকের ঘটনাবলীতে এই বিষয়কই অন্তর্ভুক্ত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া 
মেকবেদের জীবনের নির্দিষ্ট “টেজিডি”র স্থায়িত্ব করিয়াছিল। এইরূপ 
সকল উৎকৃষ্ট নাটকই প্রত্যেকটি ঘটনা একটা মূল ঘটনা বা বিষয়কে 
লক্ষ্য করিয়া ঘটে। কালিদাসের শকুন্তলাতেও ইহা দেখিতে পাওয়া 
যায়। দুর্বলসার শাপ, নদীতে স্নান করিয়ে যাইয়া। শকুন্তলার অঙ্গুলী 
হইতে দুধম্বন্ত দত্ত অঙ্গুরীয়ের স্নান এই দুইটি সামায় ও আকর্ষিক 
ব্যাপার ঘটাইয়া। কবি শকুন্তলা যে দুধম্বন্ত কর্তৃক প্রতাপাঙ্ক্ষাত হইয়াছিলেন 
ইহার নিদান দেখাইয়াছেন। পরে ধীবর কর্তৃক রাজার অঙ্গুরীর উদ্ধার 
ও রাজার নিকটে তাহা উপস্থিত করা—ইহা দুধম্বন্ত শকুন্তলার 
পূর্ণমিলনের সূত্রপাতে প্রথিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রেষ্ঠ অঙ্গের নাটক 
মাত্রই প্রত্যেক ঘটনা। একটা মূল লক্ষ্যকে ধরিয়া চলে এবং তাহাকেই 
প্রতিষ্ঠিত করে। যেখানে ইহা হয় না সেখানে নাট্যকলার আদর্শ 
ভাবী হইয়া যায়।